বাঙ্গালা ভাষা

প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম. এ, বিদ্যানিধির রচিত।

কলিকাতা
অপার সারকুলার রোডের ২৪৩/১ নং বাড়ীতে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
ও
রায়বাগান ষ্ট্রীটের, ২৫ নং বাড়ীতে ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯

শুদ্ধিপত্র।

[প্রথম অধ্যায়ে অ আ অক্ষরে মাথায় যে পৃথক মাত্রা আছে, তাহা ভুলে বসিয়াছে। উহা কিছু নয়।]

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৬	সসংর্গ	সংসর্গ
৩	টীঃ	মাথম্ শাস্ত্রী	শ্যামশাস্ত্রী
৬	৫	হইবে না?	হইবে ?
৬	১৬	কোন্	কোন্ কোন্
৬	৩১	বিশেষণের ভেদে	পুংস্ত্রী ভেদে বিশেষণের
৭	১৬	দূরবর্তা	দূরবর্ত্তী
৭	টীঃ	...	করণনারীও নামের শেষে দেঈ (দেবী) লেখেন, এবং চৈতন্য-চরিতামৃতে মাধবী-দেবী নাম আছে।
৯	১৭	শিক্ষা পায়	শিক্ষা পায় না
১০	১৬	কর্তা	কর্ত্তা
১২	টীঃ	আকারের দীর্ঘ আ	অকারের দীর্ঘ আ
১৩	৪	ভাষার	ভাথার
১৩	১৪	মাই	পাই
১৫	৭	কোন্	কোন্ কোন্
১৫	১১	দেখিতেছি	দেখিতেছি,
১৬	৩০	কোন্ কোন্	কোন্
২১	১৬	দুই নাম, এবং	দুই নাম পাই, তখন বুঝি
২১	২৬	মাঝে বাস,	মাঝে বাস যার—
২৩	২০, ২১	বনধু বানধবের	বন্ধু-বান্ধবের
২৮	১১	মেয়ে	যেয়ে
২৮	২৭	ভাবার	ভাথার
২৯	২৯	দিকে	দিলে
৩০	৫	মনিবজানি	মানবজাতি
৩০	১৮	জীবন্মুক্তি-বাঁধা	জীবন্মুক্তি বাঁধা

৩০	২০	না পারিলেও	পারিলেও
৩১	২৯	না, তাহা	,তাহা
৩১	৩১	হইয়াছে ?	হইয়াছে ।
৪৭	১, ২	পদ	শব্দ
৪৭	২৭	বর্ণ সাহায্যে	অক্ষর সাহায্যে
৭০	৩	সমভিব্যাহারে	সং সমধ্ব—
		—সন্নিবেশ	গ্রাং সন্নিবেশ
৭৪	১৭	হরিশ—হারশে,	হরিশ—হরিশে,
১০৯	২৮	মূল	মূল
১১১	৪	তদ্বিধিত	তদ্ধিত
১১৩	৫	দুখঃ	দুঃখ
১১৫	৬	সে সকল	যে সকল
১১৫	১৩	করা ধাতু	কর ধাতু
১১৬	৯	যেই সং	সেই সং
১১৯	১৩	করেছে	করেছি
১৪১	১-৩	মনে-হয় না।	(মনে—হয় না।)
১৪৬	১২	বমম্ বমম্	ববম্ ববম্
১৫৪	৫	অস্ত ইয়া	ইয়া
১৭২	৮	আরি	আরী
১৭২	টীঃ	র	র্ [এই ভুল অন্য স্থানে ও হইয়াছে]
১৮৬	১	নাপিতীনি	নাপিতিনী
১৮৬	১৩	ঈনী	ইনী

নির্ঘণ্ট।

২য় পরিচ্ছেদ। কৃৎপ্রত্যয়।

৩য় পরিচ্ছেদ। তদ্ধিত প্রত্যয়।

পরিশিষ্ট।

১। রাঢ়ের দৃষ্টান্ত কেন ?

এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার সময় দুই-এক সমালোচক মনে করিয়াছেন ইহাতে বাঙ্গালাভাষা নহে, রাঢ়ের গ্রাম্য ভাষার আলোচনা আমার উদ্দেশ্য। তাঁহারা ভুলিয়াছেন, গ্রাম্য ভাষা, প্রাকৃত ভাষা, সাধুভাষা—এই তিন একই ভাষা। কেহ এই তিনের সীমালি বাঁধিয়া পার্থক্য দেখাইতে পারিবেন না। কথিত ভাষাই, বাঙ্গালাভাষার ন্যায়, যাবতীয় চলিত ভাষার প্রাণ। কথিত ভাষা লইয়া বঙ্গদেশকে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, এই চারি স্থূলভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। পাবনা ও রাজশাহী জেলা প্রায় মাঝে পড়ে। ভাগীরথীর পশ্চিম ভাগ পশ্চিম-বঙ্গ ; ভাগীরথী ও পদ্মার মাঝে দক্ষিণ-বঙ্গ ; গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মাঝে উত্তর-বঙ্গ ; এবং পদ্মার পূর্বভাগে পূর্ব-বঙ্গ। ভাষা-বিষয়ে নোআখালী ও চাটিগাঁ ঠিক পূর্ব-বঙ্গ নহে। তেমনই মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের-ভাষা ওড়িয়া-মিশ্রিত, এবং মালদহ ও পূর্ণিয়ার পশ্চিমাংশের ভাষা বিহারী-হিন্দী-মিশ্রিত। যদি বাঙ্গালাভাষা শিখিতে হয়, তাহা ছাপা দুই-দশ-খান বই পড়িয়া কেহ শিখিতে পারে না। এক স্থানের কথিত ভাষা তাহাকে শিখিতে হইবে, নতুবা শেখা হইবে না। এখানে দক্ষিণ রাঢ়ের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ভাগের কথিত ভাষা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা-ভাষার স্থূল বিবরণের প্রয়াস করা গিয়াছে। বাঙ্গালাভাষা হইতে যেখানে দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষা পৃথক হইয়াছে, সেখানে 'রাঢ়ে বলে,' 'রাঢ়ে' ইত্যাদি বিশেষ করিয়া বলা গিয়াছে। একটা আদর্শ (type) না ধরিলে কোন্ বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। ভাষা শেখা কি এত সোজা যে শূন্যে শূন্যে কল্পনা-পক্ষে বিচরণ করিলে তাহার মর্ম-গ্রহ হইবে ?

কটক-কলেজের ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপক এবং আমার জ্যেষ্ঠ-সহোদর-সদৃশ উপেন্দ্রনাথ-মৈত্র-মহাশয় 'বাঙ্গালাভাষা' নামক গ্রন্থের এই প্রথম ভাগ (১ম ২য় ৩য় অধ্যায়) হাতের লেখায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য-কীর্তন অনাবশ্যক। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য, উদার সহৃদয়তা, ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফল হইতে এই গ্রন্থ বঞ্চিত হয় নাই। তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন, দুই এক স্থানের রাঢ়ের দৃষ্টান্ত ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থে বাঙ্গালাভাষা আলোচিত হইয়াছে। হায়, এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত দেখিতে তিনি রহিলেন না।

আমার আর এক মিত্র পদার্থ-বিদ্যা-অধ্যাপক শ্রীরামেন্দ্রনাথ-ঘোষ-মহাশয়ও কিয়দংশ পড়িয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় তিনি এখন সমগ্র পড়িতে পারিবেন, এবং প্রখর সমালোচনা দ্বারা গ্রন্থের অশুদ্ধি-সংশোধনে সহায় হইবেন।

২। ফলার উচ্চারণ।

শব্দশিক্ষাধ্যায়ে ফলার উচ্চারণ-বিচার অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বাঙ্গালা বর্ণ ও অক্ষর পরিচয় করিতে শৈশবে আমরা পাঠশালায় পাঁচ শ্রেণী শিখিয়াছিলাম। প্রথমে অ আ-আদি স্বর,

দ্বিতীয়ে ক খ-আদি ব্যঞ্জন, তৃতীয়ে ক্য ক্র-আদি ফলা, চতুর্থে ঙ্ক ঙ্খ-আদি মস্তকে অনুনাসিক-যুক্ত ব্যঞ্জন, পঞ্চমে স্ক স্খ-আদি অন্য যুক্ত ব্যঞ্জন। ক-তে ফলা দিয়া ক ক্য ক্র ক্ল কৃ ক্ন ক্ম ক্ব ক্ব, অর্থাৎ য র ল ব ন ম ঋ ৯—এই আট বর্ণ ব্যঞ্জনের নীচে বসিয়া ফলা হয়। আঙ্ক এই,—ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙঙ। ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞঞ। ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ণ্ণ। ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ ন্ন। ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম। ঙ্য ঙ্র ঙ্ল ঙ্ব ঙ্শ ঙ্ষ ঙ্স ঙ্হ ক্ষ। আস্ক এই,—স্ক স্খ গ্দ দ্ব স্ত্র। শ্চ শ্ছ জ্ঞ ঝ্ঞ জ্ঝ। ষ্ট ষ্ঠ ড্ড ড্ঢ ষ্ণ। স্ত স্থ দ্ব দ্ধ হ্ন। স্প স্ফ দ্ব ভ্ভ স্ম। হ্ন হ্র হ্ল হ্ব।

প্রথমে আঙ্ক আস্ক শ্রেণী দেখা যাউক। ঙ্য ঙ্র ঙ্ল ঙ্ব ঙ্শ ঙ্ষ ঙ্স ঙ্হ ক্ষ—এই সকল সংযুক্তব্যঞ্জনের ঙ, বোধ হয়, অনুস্বার স্থানে বসিয়াছে (৮, ৬৮ সূঃ দেখ)। কারণ ক্ষ ব্যতীত ঙ-যুক্ত য-র-ল-ব্রাদি ব্যঞ্জন বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায় না। ঙঙ, ঞঞ-এই দুই সংযুক্ত ব্যঞ্জনও আবশ্যক হয় না। আস্ক-শ্রেণীতে অন্য আবশ্যক সংযুক্ত ব্যঞ্জন পাইতেছি। ক্রম সুন্দর। ফলা কিংবা সংযুক্ত-ব্যঞ্জন-শ্রেণীর মধ্যে রেফ নাই। একারণ এক এক পাঠশালায় ফলার শেষে র্ক (রেফ) শিক্ষা দেওয়া হইত। আর এক অভাব দেখা যায়। হ্ণ—নাই, আছে কেবল হ্ন (হ্ন); যেন হকারে ণ যুক্ত হইতে পারে না। আস্ক-শ্রেণীতে স্ত্র আনার কারণ পাই না। হয়ত পাঁচটা বর্ণ না দিলে বর্গভাগ অসম্পূর্ণ হয়, এই কারণে স্ত্র আসিয়াছে।

ফলার বিশেষত্ব এই যে, ব্যঞ্জনের নীচে বসিয়া ব্যঞ্জনের সহিত ফলা একত্র উচ্চারিত হয়। সং ফল ফলক শব্দ হইতে বাং ফলা। শরের অগ্র কিংবা নিম্নভাগে লৌহফল যুক্ত হইলে শর বা বাণ সম্পূর্ণ হয়। এইরূপ, ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনও এক-বর্ণ-তুল্য হয়। তর্ক—তর্‌ক, কিন্তু তক্র—তক্‌র নহে; বল্গা—বল্‌গা লিখিতে পারি, কিন্তু গ্লানি—গ্‌লানি লিখিলে ঠিক উচ্চারণ আসিবে না। এক ব্যঞ্জন স্বরহীন হইলে পরস্থিত স্বরান্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। নতুবা উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। কিন্তু যুক্ত হইলেও ব্যঞ্জনদ্বয়ের স্ব স্ব উচ্চারণ থাকে।

আর এক লক্ষণ দেখা যায়। য র ল ব—এই চারিবর্ণ ব্যঞ্জন বটে, স্বরও বটে। ম ন ণ ঞ ঙ—এই পঞ্চ অনুনাসিক বর্ণও এইরূপ। এই কারণে অনুনাসিক বর্ণ সহজে চন্দ্রবিন্দু নামক অর্ধানুস্বারে পরিবর্তিত হইতে পারে। ঋ ৯ স্বরবর্ণ বটে, কিন্তু শুদ্ধ স্বর নহে, র ল ব্যঞ্জন মিশ্রিত স্বর। আরও দেখা যায়, ই হইতে য, ঋ হইতে র, ৯ হইতে ল, উ হইতে ব আসিতে পারে। অর্থাৎ ফলা—অর্ধস্বরব্যঞ্জন।

আমরা পড়িতাম ক কিঅ, কর কল, কব কন, কম কিরি, কিলি। ওড়িয়া পাঠশালায় ওড়িয়া শিশুও 'ক কিঅ' রূপ ফলা শিখে। প্রভেদের মধ্যে, কিরি কিলি না, পড়িয়া কুরু কুলু পড়ে। অতএব ফলা বহুকালের প্রাচীন ভাগ। যখন বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ বিকৃত হয় নাই, তখনকার ভাগ।

বিদ্যাসাগর-মহাশয় তাঁহার বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয়ভাগে ণ-ফলা অধিক ধরিয়াছেন, ফলা মধ্যে ঋ ৯ গণ্য করেন নাই। ব্যঞ্জনের নীচে ঙ বসে না; এমন শব্দ নাই যেখানে ঙ-কে ফলা হইতে হয়। ঞ বসে, যেমন যাচ্ঞা, যজ্ঞ শব্দে। কিন্তু ঞ স্বীয় উচ্চারণ পৃথক রাখে।

ণ ফলা অল্প শব্দে আবশ্যক হয়। যেমন বিষণ্ণ, পরাহ্ণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু। অনুনাসিক বর্ণে অনুনাসিক বর্ণ যুক্ত হইলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মতন উভয়ই পৃথক উচ্চারিত হয়। একারণ এরূপ সংযুক্ত ব্যঞ্জন আঙ্কে মধ্যে ধরা হয়। বিষণ্ণ শব্দে ফলার বিশেষত্ব নাই। হ-তে ণ যুক্ত হইলেও ফলার বিশেষত্ব থাকে না, গ্রাম্য উচ্চারণে যাহাই হউক। থাকে ষ্ণ। ইহার উচ্চারণ বাঙ্গালায় ষ্টঁ তুল্য। ষ্ণ এই অক্ষরের আকারে ষ ঞ দেখিতে পাওয়া যায়। ঞ-এর উচ্চারণ ণ ছিল (৪২, ৪৩, ৪৯, ৮৭ পৃঃ দেখ)।

ঋ ৯ ফলার মধ্যে ধরা হইয়াছে। কারণ এই দুই বর্ণে ব্যঞ্জনের লক্ষণও কিছু আছে। ব্যঞ্জনের নীচে লেখা হয় বলিয়া ফলা নহে। তাহা হইলে উ ফলা নাম পাইত।

অতএব য র ল ব ন ম ঋ ৯ ফলা শ্রেণীভুক্ত হওয়া সঙ্গত। ৯ ফলা যুক্ত শব্দ সংস্কৃতে অল্প; সেখানে ল দিয়াও কাজ চলে। ঋ ফলা বটে, কিন্তু বাঙ্গালা উচ্চারণ-দোষে রি হইয়া পড়িয়াছে। এখন য র ল ব ম ন এই ছয় ফলা যোগে বাঙ্গালা উচ্চারণ লক্ষ্য করা যাউক।

য-ফলা। অ-আ-কারান্ত আদি ব্যঞ্জনে য-ফলা যুক্ত হইলে য স্থানে এ উচ্চারিত হয়। ব্যবহার, ব্যঙ্গ, খ্যাতি, ধ্যান শব্দের বিকারে বেভার, বেঙ্গ, খেআতি ধেয়ান। খেআতি ধেআন —খিয়াতি ধিয়ান আকার পুরাতন পুথীতে পাওয়া যায়। অনাদিভূত ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে গ্রাম্য উচ্চারণে ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয় (১৩ সূঃ)। অ আ ভিন্ন অন্য স্বরান্ত আদি ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে গ্রাম্য উচ্চারণে য ফলা থাকে না। যেমন, জ্যেষ্ঠ—জেষ্ঠ, জ্যোৎস্না—জোৎস্না। [উদ্‌যোগ উদ্‌যাপন প্রভৃতি কয়েক শব্দে য উচ্চারিত হয়। একারণ উদ্যোগ না লিখিয়া উদ্‌যোগ লেখা কর্ত্তব্য।]

র-ফলা। আদি ব্যঞ্জনে র-ফলার ঠিক উচ্চারণ থাকে। যেমন, ব্রণ ভ্রমণ শ্রম। অন্যত্র উপরের ব্যঞ্জনকে গ্রাম্য উচ্চারণে দ্বিত্ব করে। যেমন, মিত্র—মিৎত্র, রাত্রি—রাৎত্রি, নিদ্রা—নিদ্‌দ্রা।

ল-ফলা। র-ফলার তুল্য। যেমন, গ্লানি প্লীহা। কিন্তু, অম্ল—অম্‌ম্ল, অশ্লীল—অশ্‌শ্লীল।

ব-ফলা। পূর্ব্বে (১৫ সূঃ) দেখা গিয়াছে। বর্গ্য ব ফলা নহে। বর্গ্য ব পৃথক উচ্চারিত হয়। যেমন, অম্বিকা কম্বল সম্বল সম্বন্ধ বিলম্ব সম্বোধন। এই ব ফলা নহে বলিয়া ফলার ব এর আকার ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। এক শুভ এই যে, অনুনাসিকে অনুনাসিক যুক্ত হইলে যেমন সংযুক্ত ব্যঞ্জনের তুল্য উচ্চারিত হয়, ফলার সহিত ফলা যুক্ত হইলেও হয়। ম-ফলা ব-ফলা (যদিও ব, ফলা) যুক্ত হইয়া অম্বা মনে করা যাইতে পারে। এইরূপ, ল-ফলা ম-ফলা যুক্ত হইলেও ল ম এর উচ্চারণ পৃথক থাকে। যেমন গুল্ম, শাল্মলী।

ম-ফলা। ১২ সূঃ দেখ। অন্ত অনুনাসিকে যুক্ত হইলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনতুল্য। যেমন, বাঙ্ময় জন্ম সম্মুখ। অন্ত ফলার সহিত যুক্ত হইলেও হয়। উপরে উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

ন-ফলা। এই সম্বন্ধে উপরের ফলার লক্ষণের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। আমরা ভগ্ন অগ্নি যত্ন রত্ন প্রভৃতি শব্দে ন-ফলা, সংযুক্ত-ব্যঞ্জন-তুল্য উচ্চারণ করি। ওড়িয়া ফলা-তুল্য উচ্চারণ করে। আমরা বলি অগ্‌নি, ওড়িয়া বলে অ-গ্নি। ইহাই যে ঠিক, তাহা আদি ব্যঞ্জনে ন-ফলার উচ্চারণে বুঝিতে পারি। স্নান স্নেহ—এখানে ন-ফলা স্পষ্ট।

৩। বাঙ্গালা অক্ষর। *

কএকমাস দুই এক মাসিক পত্রে আমার প্রবন্ধের যুক্তাক্ষর দেখিয়া কেহ তুষ্ট কেহ রুষ্ট হইয়াছেন। প্রচলিত অক্ষরের রূপ-পরিবর্তনের হেতু-প্রদর্শন এখন আবশ্যক হইয়াছে।

পাঠকের প্রতি অবজ্ঞা, কিংবা নিজের ধৃষ্টতা-প্রদর্শন কিংবা নূতন কিছু করিবার অভিপ্রায়ে রূপ-পরিবর্তনের চেষ্টা করি নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বিস্মৃত হই নাই। যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আদরবশতঃ হইয়াছে। বাঙ্গালা-অক্ষর-পরিচয় সহজ করিবার চেষ্টায় এই নূতনত্বে আসিতে হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালা অক্ষর শিখিতে যত পরিশ্রম ও সময় লাগে, তত না লাগাইলেও চলে। কি উপায়ে এই পরিশ্রম ও সময় কম করিতে পারা যায়, তাহার চিন্তা দোষের হইতে পারে না।

গোড়ার কথায় একটু যাই। আজিকালি আমরা চোখ দিয়া নূতন ভাষা শিখিতেছি। ভাষা বলিতে কতকগুলি ধ্বনির সমবায় বুঝিলে উপস্থিত প্রস্তাবে দোষ হইবে না। ধ্বনি কানের গ্রাহ্য। যাহা কানের বিষয়, তাহা প্রকারান্তরে চোখের বিষয় হইয়াছে। কতকগুলি সোজা বাঁকা জোড়া খোলা রেখা করিয়া আমরা ধ্বনির চাক্ষুষ চিহ্ন উদ্ভাবন করিয়াছি। সেই চিহ্নের নাম অক্ষর। প্রত্যেক ভাষায় কতকগুলি মূল ধ্বনি আছে। যেমন বাঙ্গালা ভাষায় অ আ ক্ খ্ ইত্যাদি। এই মূল-ধ্বনির নাম বর্ণ। † দুই তিন মূল ধ্বনি একত্র হইয়া মিশ্র ধ্বনি হয়। যেমন বাঙ্গালায় ঐ—অই, শ্রী—শ্‌র্‌ঈ, ইত্যাদি। ভাষার কোন শব্দে মূল ধ্বনি, কোন শব্দে মিশ্র ধ্বনি, কোন শব্দে মূল ও মিশ্র ধ্বনির যোগ আছে। 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে'—এই বাক্যে ছয়টি শব্দ। 'আবার' শব্দে আ ও র মূল ধ্বনি, বা মিশ্র ধ্বনি আছে। এইরূপ অন্যান্য শব্দে। কবির এই বাক্য আমরা তাঁহার মুখ হইতে শুনিতেছি না; বাক্যের প্রত্যেক শব্দের ধ্বনিজ্ঞাপক অক্ষর দ্বারা—পূর্বে শেখা সঙ্কেত দ্বারা—আবৃত্তি করিতেছি। এক এক শব্দে কি কি বর্ণ লাগিয়াছে, তাহা মনে রাখিয়াছি। নাগরী ও ওড়িয়া সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারাও বাক্যটি লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়। ইংরেজী অক্ষর দ্বারাও পারা যায়। অত কথা কি, যে সংক্ষিপ্ত-লিপি দ্বারা ইংরেজী শব্দ লিখিতে পারা যায়, তাহা দ্বারাও প্রায় পারা যায়।

তবে, শব্দের মূল ধ্বনি বর্ণ, এবং বর্ণের লিখিত আকৃতি বা চিহ্ন অক্ষর। যাবতীয় ভাষার এক প্রকার অক্ষর হইলে ভাষা শিখিবার পথ সহজ হইত। এই ভারতবর্ষে বাঙ্গালা নাগরী গুজরাতী ওড়িয়া তেলুগু তামিল ফার্সী প্রভৃতি কত রকম অক্ষর আছে। যদি এত রকম না থাকিয়া একরকম থাকিত, তাহা হইলে ভাষা শিখিবার প্রথম বিঘ্ন—নূতন অক্ষর পরিচয়—থাকিত না। এই বিঘ্ন দূর করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার এক-লিপিবিস্তার-পরিষৎ

---

* প্রবাসী—১৩১৬ সাল, কার্তিক।

† এখানে বর্ণ অর্থে মূল ধ্বনি, এবং অক্ষর অর্থে বর্ণের লিখিত চিহ্ন বা আকৃতি বুঝিতে হইবে।

দেশে নাগরী অক্ষর-প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। যদি ভারতের যাবতীয় ভাষা নাগরীতে লেখা হয়, তাহা হইলে নাগরী-অক্ষর শিখিলেই সকল ভাষার শব্দ পড়িতে পারা যাইবে।

সেদিন দূরের কথা। এখন বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যাউক। অন্য কেহ বাঙ্গালা শিখুন না শিখুন, বাঙ্গালীর ছেলেকে শিখিতে হয়। তাহার হাতে-খড়ী হয়, সে বাঙ্গালা অক্ষর চিনিতে ও লিখিতে শেখে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার বর্ণ অর্থাৎ মূলধ্বনিও শেখে।* তাহাকে কতগুলি বর্ণ বা মূল ধ্বনি শিখিতে হয়? লিখিয়া গণিয়া দেখা যাউক। অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও ৺ ং ঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য় র ল শ ষ স হ—অর্থাৎ চোআল্লিশটি। ইহাদের মধ্যে ঈ ঊ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কারণ বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ই ঈকারের প্রভেদ প্রায় লোপ পাইয়াছে। ঙ ঞ উচ্চারণও বিকৃত হইয়া অন্য বর্ণের উচ্চারণের মতন হইয়া গিয়াছে। অতএব মোট থাকে চল্লিশটি।

অক্ষর যদি বর্ণজ্ঞাপক চিহ্নমাত্র, তবে শিশুকে চল্লিশটি অক্ষর শিখিতে হইবেই। ভাষা শিখিবার পক্ষে অনাবশ্যক চিহ্ন নিতান্ত অনাবশ্যক, এবং আবশ্যক ধ্বনি-প্রকাশের যাবতীয় চিহ্ন না থাকিলেও অক্ষর-মালা অসম্পূর্ণ।

কিন্তু, শিশু বাস্তবিক শেখে কি? অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ ঁ ং ঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল ব শ ষ স হ—অর্থাৎ বাআন্নটা। বলা বাহুল্য, যতগুলা অক্ষর ততগুলা বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় নাই। ঋকার স্বরবর্ণ; কিন্তু, বাঙ্গালায় ইকার যুক্ত র। ৠ আরও অনাবশ্যক। ঐ বাঙ্গালায় অই, ঔ—অউ। ঌ ঙ ঞকারের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে ঌ—ল্, ঙ—ং, ঞ—ন উচ্চারিত হয়। ণকার বাঙ্গালায় নকার, যকার জকার, অন্তঃস্থ ব (ব়)—বর্গীয় বকার হইয়াছে। তাহা হইলে উপরে লিখিত অক্ষরমালায় কতকগুলা অনাবশ্যক অতিরিক্ত অক্ষর জুটিয়াছে।

কিন্তু, আমরা সংস্কৃত শব্দের বানান সংস্কৃতের মতন রাখিয়া থাকি। সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতের মতন উচ্চারণ করি বা বলি, তা নয়; বাঙ্গালার মতন উচ্চারণ করি, কিন্তু লিখিয়া দেখাইবার সময় সংস্কৃতের মতন দেখাই। এই রীতিতে ক্ষতি-বৃদ্ধি, দুই-ই আছে। সম্প্রতি সে লাভালাভ বিচারে আমাদের আবশ্যকতা নাই। মনে করি যেন সংস্কৃতের অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ এ ঐ ও ঔ—এই বার স্বর, এবং ক হইতে হ পর্যন্ত তেত্রিশ ব্যঞ্জন, ঁ ং ঃ—এই তিন স্বর-ব্যঞ্জন, এবং বাঙ্গালার নিমিত্ত ড় ঢ় য় একত্রে উন-চল্লিশ ব্যঞ্জন, না শিখিলে নয়। কিন্তু, বাস্তবিক কি এই একান্ন বর্ণের একান্ন অক্ষর শিখিলে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা লেখা পড়িতে পারা যায়?

বিদ্যার্থী শিশু অ আ শেখে, ক খ শেখে। তার পর ক কা কি কী ইত্যাদি, তার

* শেখে বটে, কিন্তু ভাল করিয়া শেখে না, কেহ শেখায় না। তাবার মূল ধ্বনিও শিক্ষার্থীকে শিখাইতে হয়, তাহা আমাদের গুরু-মশায় সম্যক্ চিন্তা করেন না।

পর ক ক্য ক্ক ক্ম ইত্যাদি, তার পর ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ইত্যাদি, তার পর স্ক স্খ দগ দঘ ইত্যাদি। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দুই ভাগ না শিখিলে শিশুর হাতে-খড়ী শেষ হয় না। মূল বর্ণের পর মিশ্র বর্ণ বা যুক্ত বর্ণ শিখিতে অধিক সময় লাগে না। সময় লাগে মূল অক্ষর শিখিতে, অধিক সময় লাগে যুক্তাক্ষর শিখিতে। ইংরেজীতে ছাব্বিশটা অক্ষর শিখিলে ইংরেজী-শব্দ শিশু পড়িতে পারুক না পারুক, তাহার অক্ষর-পরিচয় শেষ হয়। বাঙ্গালাতে চল্লিশটি বর্ণ লিখিয়া দেখাইতে প্রায় এক শত অক্ষর শিখিতে হয়। ইংরেজীর দোষ আবশ্যক অক্ষরের অভাব ; বাঙ্গালার দোষ অনাবশ্যক অক্ষরের সদ্ভাব।

ঋ কদাচিৎ আবশ্যক হয়। ইহাকে না হয় বাদ দিলাম। থাকে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ—এগার স্বর। ব্যঞ্জনের সহিত এই এগার স্বরাক্ষর যুক্ত হইবার সময় অন্য এগার আকার ধরে। ক খ—অ-যুক্ত ক্ খ্। সুতরাং অ-স্বর-অভাব-বোধক চিহ্ন লইয়া ্ া ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ—এই এগার স্বর চিহ্ন। অর্থাৎ কেবল স্বরবর্ণেরই নিমিত্ত ছাব্বিশ অক্ষর চাই।

শব্দে স্বর-হীন ব্যঞ্জন আবশ্যক হয় না। অতএব অকারান্ত ব্যতীত অন্য স্বরান্ত ব্যঞ্জন লিখিতে গেলেই একটা-না-একটা স্বর-চিহ্ন লিখিতে হয়। দীর্ঘ রূপ লেখা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত রূপ লেখায় সময়-লাঘব হয়। সুতরাং স্বরের সংক্ষিপ্ত রূপ থাকায় লাভ বই ক্ষতি নাই। যিনি ক খ ইত্যাদি অকারান্ত ব্যঞ্জন অক্ষর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। এই খানে যদি শেষ হইত, তাহা হইলে কথা থাকিত না। ত অকারান্ত, কিন্তু হসন্ত ত এর আকার ত্ নহে, ৎ। সুতরাং একটি নূতন অক্ষর। ক অক্ষরে উ ঊ যোগ করিলে কু কূ হয়, কিন্তু গ্‌উ—গু, শ্‌উ—শু, হ্‌উ—হু, র্‌উ—রু, র্‌ঊ—রূ। এই রকম ত্রু দ্রু ধ্রু প্রু ভ্রু ব্রু শ্রু, যেন র-ফলা যোগের পর উ ঊ দিতে হইলে ু ূ দিতে হয়। কিন্তু তাও নয়। কারণ হ্ + ঋ—হৃ ; এখানে ঋ-যোগেও সেই চিহ্ন!

যদি কেবল স্বরাক্ষর-যোগের সময় এই রকম গোটাকতক সঙ্কেত শিখিতে হইত, তাহা হইলেও বড় একটা কথা থাকিত না। স্ত স্থ দেখুন ; স ত থ স্পষ্ট বুঝিতে পারি। কিন্তু কৃত—ক্ত ; ইহাতে না ক না ত দেখিতে পাই। যদি ত পাই, ক পাই না। গ্‌র—গ্র, কিন্তু ক্‌র—ক্র। এই রকম নূতন নূতন অক্ষর যে কত জুটিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে। যে যুক্তাক্ষরে স্বর কিংবা ব্যঞ্জনের আকার স্পষ্ট আছে, তৎসম্বন্ধে কথা নাই। যুক্তাক্ষর থাকাতে লেখায় সময় কাগজ পরিশ্রম বাঁচে, হসন্ত-চিহ্ন দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় না।

ক—অ=ক্ ; ত—অ=ৎ।	কৃত=ক্ত ; কৃর=ক্র ; কৃষ=ক্ষ।
ক্+ু=কু ; গু ত (যেমন স্তু) শু ; ত্রু দ্রু ধ্রু ভ্রু রু ; হু।	ঙ্‌ক=ঙ্ক ; ঙ্‌গ=ঙ্গ।
ক্+ূ=কূ ; ভ্রূ শ্রূ ব্রূ রূ।	জ্‌ঞ=জ্ঞ।
ক্+ৃ=কৃ ; হৃ।	ঞ্‌চ=ঞ্চ।

ট্ট=ট্ট।

ণ্ড=ণ্ড।

ত্ত=ত্ত ; ত্থ=ত্থ ; ত্র=ত্র, ত্ত্র=ত্ত্র।

গ্ধ=গ্ধ ; দ্ধ, ন্ধ, ব্ধ।

ন্থ=ন্থ ; ন্থ।

ক্ম=ক্ম ; হ্ম=হ্ম।

ক্য=ক্য।

র্ক=র্ক ; র্ত্ত, র্দ্ধ, র্ম্ম, র্য, র্ব্ব ;

গ্র=গ্র।

ষ্ণ=ষ্ণ।

স্ব=স্ব ; স্ব।

হ্ন=হ্ন।

দেখা যাইতেছে, এক উকারেয় পাঁচ রকম আকার আছে। ঊকারের, ঋকারের দুই, রকারের তিন ; গকারের দুই, ঙকারের তিন রকম আকৃতি আছে। এই প্রকারে বাঙ্গালা অক্ষর সংখ্যা একান্ন হইতে একাশী বিরাশী হইয়া শিক্ষার পথে অকারণ বিঘ্ন বাড়াইয়াছে। উকারের পাঁচ রকম রূপ, বলা ঠিক হইল না। কারণ যে-কোন রকম যে-সে ব্যঞ্জনে যোগ করা চলে না। কু লিখিবার সময় এক রকম, গু লিখিবার সময় আর এক রকম, রু লিখিবার সময় আর এক রকম, হু লিখিবার সময় আর এক রকম, লিখিতে হইতেছে। পূর্বকালে কু-এর অন্য রকম আকার ছিল। এইরূপ ভু মু লু প্রভৃতি অপর কএকটি অক্ষরও ভিন্নাকার ছিল।

এই সকল নানা রূপের মধ্যে ক্ষ জ্ঞ ঞ্চ, তিনটি অক্ষর মূল বর্ণের উচ্চারণ প্রকাশ না করিয়া অন্য বর্ণের করে। সুতরাং এই তিনটিকে পৃথক্ অক্ষর গণনা করা চলে। য-ফলা (্য), র-ফলা (্র), এবং রেফ (র্) এই তিনটিও চাই। অবশিষ্ট আকার একেবারে অনাবশ্যক। ইহাদের পরিবর্তে সহজ রূপ যোগ করিয়া যুক্তাক্ষর অনায়াসে নির্মাণ করা যাইতে পারে। লিখন-শ্রম-লাঘব অক্ষরের রূপ-সংক্ষেপের কারণ। কোন কোন যুক্তাক্ষরে সংক্ষেপের সীমা অতিক্রান্ত হয় নাই কি ?

এখন মূল অক্ষর দেখি। কোন্ অক্ষর ভাল বলা যায় ? (১) যে অক্ষর কলমের এক টানে লিখিতে পারা যায়, অর্থাৎ যাহা লিখিতে কাগজ হইতে কলম তুলিতে ফেলিতে হয় না ; (২) যে অক্ষর দ্বারা অন্য অক্ষরের ভ্রম হয় না ; (৩) যে অক্ষর দেখিয়া পড়িতে চক্ষু পীড়ন করিতে হয় না ; সেই অক্ষর ভাল।

বাঙ্গালা ই ঈ দেখুন। ই অক্ষর ই এর মতন, যেন ই তে মাথায় শৃঙ্গ দিয়া ঈ হইয়াছে। অ+া=আ, উ+ ূ=ঊ, ঋ+ ৄ=ৠ। এই নিয়ম ব্যাকরণের সন্ধিতে আছে, দীর্ঘ স্বরের আকারেও আছে। কিন্তু ই+ই=ঈ অক্ষরের দুই ই এমন মিশিয়া গিয়াছে যে বুঝিতে পারা যায় না। ঈ অক্ষরের সহিত ঔ অক্ষরের কেন সাদৃশ্য থাকিবে, তাহাও বোঝা যায় না। ঋ আর ঝ দেখুন। এ ত্র, ও ত্ত, ব র, য ষ, য য়, ক্ষ ক্ষ্ম, ইত্যাদি কএকটা অক্ষর কিছুতে ভাল বলিতে পারা যায় না।

ব ও র এর ধ্বনিতে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, অথচ আকারে এক। নাগরী ব ও র এ ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। আসামী র অক্ষরও অপেক্ষাকৃত ভাল। যদিও আসামীতে মূল আকারে ব র এক, তথাপি ব এর নীচে বিন্দু দিয়া র হয় না। ড ড় ঢ ঢ় আকারের কারণ

বুঝি ; ড ঢ-এর গুরু উচ্চারণে ড় ঢ়। কিন্তু ব এর গুরু উচ্চারণে ব্র নহে, য এর য় নহে। বাঙ্গালাতে য ও য় উচ্চারণে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বকালে ন-এ বিন্দু দিলে ল হইত। এই যে বিন্দু-যোগ, ইহা ঘাড় নাড়িয়া হাঁ-না বুঝাইবার সমান। প্রত্যেক বিন্দু দিবার সময় কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। ক্রিয়াপদ ব্যতীত বাক্য-রচনা হয় না, এবং বাঙ্গালাতে হওয়া করা অল্প লিখিতে হয় না।

ক+া=কা, ক+ু=কু, ক+ৃ=কৃ ; অর্থাৎ কএর পরে স্বর। কিন্তু ক+ি=কি ; কএর পূর্বে ই বসিতেছে। ক+ী=কী ঠিক আছে। বর্তমান নাগরীতেও ইকারের বামাগতি। প্রাচীন নাগরীতে এ রকম ছিল না। ি ী বাম ও দক্ষিণ পাশের দাঁড়ী ছিল না ; ব্যঞ্জনের মাথায় বামে কিংবা দক্ষিণে ধনুক দিয়া লেখা হইত। ওড়িয়া অক্ষরে কএর মাথায় ধনুক দিলেই কি লেখা হয়। ি এর বিশেষ দোষ এই যে কলমের একটানে লিখিতে পারা যায় না। ি লিখিতে কলম দুই বার তুলিতে হয়। বাঙ্গালা ে ৈ লিখিতে কলম তুলিতে হয় না, কিন্তু ব্যঞ্জনের বামে বসিয়া স্বাভাবিক ক্রমের ব্যত্যয় ঘটায়। নাগরী অক্ষরে উ বাঁ-দিকে, ঊ ডাইন-দিকে বাঁকে। বাঙ্গালায় একই দিকে বাঁকিয়া ু ূ সহজে বুঝিতে দেয় না।

বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি কি, তাহা জানিয়া সম্প্রতি লাভ নাই। নাগরী অক্ষর বহু লোকের অক্ষর। তাহাকে আদর্শ রাখিয়া বাঙ্গালা অক্ষরের সংস্কার করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই। সংস্কার চাই, আমূল পরিবর্তন চাই না। বাঙ্গালা অক্ষরের সূক্ষ্মকোণ-বাহুল্য নাগরী অক্ষরে নাই। আমাদের হাতের লেখায় অক্ষরের কোণ গোল হইয়া যায়। ইহাই স্বাভাবিক। সূক্ষ্ম কোণ চক্ষুর পীড়ক, সুতরাং কদাচিৎ সৌন্দর্য-বৃদ্ধি করে। যে যুক্তাক্ষরে মূল অক্ষর এত ছোট, অস্পষ্ট কিংবা বিকৃত যে বুঝিতে কষ্ট হয়, তৎপরিবর্তে অন্য অক্ষর আবশ্যক। নীচে নীচে দুই তিনটি ব্যঞ্জন বসাইতে গেলে দুই একটা অক্ষর অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে নীচে নীচে না বসাইয়া পাশে পাশে জুড়িয়া দেওয়া ভাল।

বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ ব অক্ষর নাই। ফলে, সংস্কৃত পুস্তক শ্লোক প্রভৃতির ছাপা অশুদ্ধ হইতেছে। আসামী বা প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে এই অক্ষর (ৱ) লওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালাতেও এই অক্ষর কাজে আসিবে। 'হওয়া' 'খাওয়া' 'দেওয়া' 'শোওয়া' প্রভৃতি নানা শব্দে ওয়া লিখিতে হয়। এই ওয়া বাস্তবিক আ (যেমন, করা জানা চেনা, ইত্যাদির)। কিন্তু যখন ওয়া হইয়া গিয়াছে তখন ৱা লিখিলে অধিক দোষ হইবে না। 'গাড়ীওয়ালা', 'কাপড়ওয়ালা' ইত্যাদির ওয়ালা মূলে আলা হইলেও হিন্দী ৱালা আসিয়া জুটিয়াছে। বোধ হয়, এই ৱ প্রচলিত হইলে 'বিদ্বান্' 'সত্ত্ব' প্রভৃতির উচ্চারণও ঠিক হইয়া আসিবে।

বাঙ্গালা রএর নাগরী রূপ অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। ব্রএর নিম্নরেখা দক্ষিণদিকে লম্বা করিলে নাগরী र হইবে। তখন আর বিন্দু আবশ্যক হইবে না। যএর বাঁদিকের দুই কোণ ভাঙ্গিয়া গোল করিয়া দিলে য, ষএর মতন দেখাইবে না। ঠিক কোন আকার

আনিলে অন্ত অক্ষর ভ্রম হইবে না, অথচ কলমের এক টানে লেখা যাইতে পারিবে, তাহার নিরূপণ কঠিন হইবে না। উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া এ ত্র, ও স্ত প্রভৃতি যে সকল অক্ষর বাস্তবিক ধাঁদা জন্মায় সে সকলের সংস্কারে হাত দিতে হইবে। প্রথম প্রথম নূতন অক্ষরেও একটু ধাঁদা জন্মাইবে; অভ্যাস হইয়া গেলে পুরাতন অক্ষর আর ভাল লাগিবে না।

রেফ-যুক্ত কোন্ কোন্ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। পরিবর্ত্ত, অর্দ্ধ, কার্য্য, কর্ম্ম, সর্ব্ব ইত্যাদি শব্দে ত ধ য ম ব এর দ্বিত্ব হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা দ্বিত্ব উচ্চারণ করি না। করিলে রেফ-যুক্ত যাবতীয় ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতেও দ্বিত্ব না করিলে চলে। যদি তাই হয়, তবে অকারণে দ্বিত্ব করিয়া লিখনশ্রম বাড়াই কেন, অক্ষর ক্ষুদ্র হইতে দি-ই কেন? বস্তুতঃ বোম্বাই ও কাশীতে ছাপা সংস্কৃত পুস্তকে রেফ-যুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব পাই না।

ঐ ঐ স্থানে ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ এই পাঁচ অনুনাসিক বর্ণের সংযোগের সময় লেখায় পূর্ব অক্ষরের মাথায় একটি বিন্দু দেওয়া হইয়া থাকে। কই, পড়িতে বুঝিতে কষ্ট হয় না। বাঙ্গালা উচ্চারণে ঙ্-বর্ণ ং, ঞ-বর্ণ ন, এবং ণ-বর্ণ ন হইয়া গিয়াছে।

হাজার বাংগলা সঙখ্যা লিখি, সেই অনুস্বার উচ্চারণ করি। গঞ্জনা ঝঞ্ঝাট লিখি, কিন্তু পড়ি গন্জনা ঝন্ঝাট। কণ্ঠ দণ্ড লিখি, কিন্তু পড়ি কন্ঠ, দন্ড। যখন অবস্থা এই, তখন ঙ্ ঞ্ ণ্ লিখিয়া লাভ করি না। ইহাদের স্থানে অনুস্বার দিতে আপত্তি হয়, লুপ্তচিহ্ন (॰) বসাইলেও চলে। কবর্গ পরে থাকিলে উহা দ্বারা ঙ্, চবর্গ পরে থাকিলে ঞ্, টবর্গ পরে থাকিলে ণ্ বুঝিতে আয়াস লাগে না। ন্ ম্ স্থানে (॰) বসাইলেও চলিত। কিন্তু এই দুই বর্ণের উচ্চারণ বিকৃত হয় নাই বলিয়া ন্ ম্ রাখায় লাভ আছে। বারংবার, কিংবা, বশংবদ ইত্যাদি অপেক্ষা বারম্বার, কিম্বা, বশম্বদ উচ্চারণ বাঙ্গালা। অনুস্বারের চিহ্ন, বিন্দু বা শূন্য। তাহাতে হসন্ত-চিহ্ন-যোগ অনাবশ্যক বোধ হয়।

আর একটা অক্ষর না থাকাতে অনেক বাঙ্গালা শব্দ বিকৃত হইতেছে। তিন চারি পাঁচ— এই চারি সংক্ষেপে চাইর (ই ঈষৎ), কদাপি চার নহে। অন্ততঃ এখনও চার হয় নাই। চাউল দাইল সাইর (সারি) আইজ কাইল প্রভৃতি শব্দ কথিত ভাষায় চাল ডাল সার আজ কাল নহে। খইল,—খল বা খোল নহে। মরিল পড়িল প্রভৃতি শব্দ কথাবার্তায় অনেকে মইল পইল বলেন। এরূপ শব্দ মোল পোল লেখা চলে না। কারণ ঈষৎ ই এখনও লুপ্ত হয় নাই। হইল অনেকে লেখেন হ'ল, অর্থাৎ ইংরেজী কমা-চিহ্ন দ্বারা লুপ্ত ই প্রকাশ করেন। শব্দের শেষের উ লুপ্ত হইলেও পূর্ব স্বর কুটিল হয়। ধাতু—ধাইত, সাধু—সাইধ। এই দুই শব্দ ধাত, সাধ নহে। পূর্ব স্বর অ আ হইলেই উচ্চারণে ঈষৎ ই আসে। এই অ আকারের উচ্চারণ তখন কুটিল বলা যাইতেছে। এই উচ্চারণ জানাইতে ই অক্ষরের মাথার শূঙ্গাটুকু জুড়িয়া দিলে চলে। যেমন খৈল, আজ, ধাত।

এক দেখ কেমন প্রভৃতি শব্দের এ বাঙ্গালা উচ্চারণে প্রায় এআ (এ ঈষৎ) হইয়া

গিয়াছে। এই উচ্চারণকে বাঁকা এ বলা যাউক। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দ লিখনে এই বাঁকা এ আবশ্যক হয় না। সোজা এ দিয়া লেখাই রীতি। অনেকে ইংরেজী শব্দের বাঁকা এ উচ্চারণ বাঙ্গালায় রাখিতে চান। এই প্রয়াস বৃথা। ব্যাপারীকে আমরা বেপারী করিয়া ছাড়িয়াছি। সংস্কৃত ব্যঙ্গ শব্দকে বেঙ্গ, কেহবা বেঙ্ লিখিয়া থাকেন। যখন খাঁটি সংস্কৃত শব্দের ্য ্যা বর্ণের দশা এই, তখন অন্য ভাষার শব্দেও যে বাঁকা এ বাঙ্গালায় সোজা এ হইয়া পড়িতে পারে, তাহা স্মরণ করা উচিত। এসিড, গেস, হেট-কোট, ইত্যাদি এ দিয়া লিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। ইহার পরিবর্তে ্যা য়্যা এ্যা ইত্যাদি কিম্ভূত-কিমাকার বানান অনেকে মোহিত করিয়া থাকে। যদি উচ্চারণ ঠিক জানাইতে হয়, নূতন অক্ষর চাই। থোড়-বড়ী-খাড়া যোগে নানাস্বাদ ব্যঞ্জন রাঁধিতে অন্ততঃ নানা রকম মশলা চাই।

বাঙ্গালা ছাপাখানায় নাকি চারি শত রকমের অক্ষর রাখিতে হয়! ঠিক কত, জানি না। া ি ী ইত্যাদি যুক্ত করিয়া যে যাবতীয় ব্যঞ্জন ও যুক্ত ব্যঞ্জন রাখা আবশ্যক তাহা স্বীকার করি না। অবশ্য যুক্ত করিয়া রাখিলে অক্ষর-যোজনা কম করিতে হয়। তেমন দেখিলে, হইয়া, করিয়া, ছিল ইত্যাদি শব্দও গাঁথিয়া রাখিলে হয়। কিন্তু সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর দ্বারা সংখ্যা বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। ফলে ছাপাখানায় নানাবিধ পরিমাণের অক্ষর রাখা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জন পাশে পাশে লিখিবার রীতি হইলে অক্ষর সংখ্যা কম হইতে পারিবে। কিন্তু লিখিতে কাগজ ও সময় বেশী লাগিবে। এই দুইএর সামঞ্জস্য করিয়া ছাপাখানার অক্ষর-সংখ্যা কম করা আবশ্যক হইয়াছে। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ঁ ং ঃ া ৈ ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ্ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব্র শ ষ স হ ক্ষ জ্ঞ ঞ্চ ্য ´ ্ • এই সাতষট্টি অক্ষর দ্বারা ছাপার কাজ চালাইতে পারা যায় কি না, তাহা ছাপাখানার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ইহা ব্যতীত ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০ / ৵ ৶ । ॥ ৸ + − × ÷ , ; । ॥ প্রভৃতি কএকটি অক্ষর লাগিবে। মোট প্রায় একশত অক্ষরে আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

দুই উপায়ে অক্ষর-সংখ্যা কমাইতে পারা যায়। এক উপায়, শব্দের বানান সহজ করা, অন্য উপায় অনাবশ্যক অক্ষর বাদ দেওয়া। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় (১৫শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা) 'সিলেটী নাগরী' নামে এক প্রবন্ধে দেখা গেল যে, সে নাগরীতে ৩২টি অসংযুক্ত এবং ১৬টি সংযুক্ত অক্ষর আছে, এবং তদ্দ্বারা মোসলমানদিগের লেখা-পড়া ও কেতাব-ছাপা হইতেছে। লেখক বলিয়াছেন, 'পদ্মার পূর্ব্বদিকে বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র এই অক্ষর মোসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।' যে কারণে এই অক্ষর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা সকলের অনুধাবন-যোগ্য। সবাই লেখা-পড়া শিখিতে চায়; কিন্তু বাঙ্গালা লেখা পড়িতে শেখা অল্প কালে অল্প পরিশ্রমে হয় না। 'সিলেটী নাগরী' লেখায় শব্দের বানান সোজা হইয়াছে, অক্ষর-সংখ্যা কম হইয়াছে। মনে করুন, অ আ ই প্রভৃতি স্বরবর্ণের এক প্রকার আকার

ব। ি ী ু ূ ইত্যাদি রাখা গেল। তাহা হইলে এগারটা অপর অক্ষর শিখিবার প্রয়োজন থাকে না। লেখা গেল, ‘বত বড় হচ্চ গৌরী হাত কেনে তোর থালি। ামার সংগে কে। না কথা মনের কথা খুলি॥’ বানান সহজ করিয়া লিখিলে, ‘োহে প্রিভু, তুমি মোরে কি দেখাো ভয়। ো ভে কম্পিত নয় ামার রিদয়। জাহাদের নীচাসক্ত ববিবেকী মন। বনিত্ত সংসার মদে মুগ্ধে অনুখ্থন্॥’

জাহা হউক এখানে শব্দেহ বানান বিবেচনা ত্যাগ কহা গিয়াছে। কথাটা এই, আমাদেহ জে বাঙ্গালা অক্ষহ আছে, তাহাহ সব আবশ্যক কি? সব অক্ষহেহ আকাহ ভাল কি? অক্ষহ জে চিহ্নমাত্র এবং তাহাহ যে পহিবর্তন হইয়াছে, হইয়া থাকে, তাহা স্মহণ কহিলে পহিবর্তন নাম শুনিয়াই ভয় পাইবাহ কাহণ থাকে না। কেহ কেহ মনে কহেন জাহা একবাহ চলিয়াছে, তাহাহ পহিবর্তনে শুভ হয় না। কিন্তু, কোন্ ব্যাপাহে,—সমাজ-সম্বন্ধী, ধর্ম-সম্বন্ধী, হাজ-নীতি-সম্বন্ধী,— কোন্ ব্যাপাহে পহিবর্তন না হইয়াছে, না হইতেছে? আমাদেহ আচাহ-ব্যবহাহ, আহাহ-বিহাহ, হীতি-নীতি প্রভৃতি যাবতীয় কাজে পহিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে। এত পহিবর্তনেও যদি আমহা বাঙ্গালী আছি; সংস্কাহেহ পহেও বাঙ্গালা অক্ষহ বাঙ্গালাই থাকিবে।

৪। বাঙ্গালা অক্ষর। *

এক শ্রদ্ধেয় লেখক অক্ষর-সংস্কারের বিরুদ্ধে যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। তাহাঁর বানান অবিকল রাখা গেল। তিনি লিখিয়াছেন, “অক্ষরের রূপ কয়েক স্থলে সহজে সংস্কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু, যুক্তবর্ণের সংস্কার সর্ব্বত্র সম্ভবে না। আপনি যুক্তবর্ণ ভাঙিয়া সংখ্যা কমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কয়েকটি স্থলে মাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাতে শিশু-শিক্ষার্থীর বর্ণশিক্ষাবিষয়ে কিছু সাহায্য হইবে, অল্প সময় ও পরিশ্রম লাগিবে। কিন্তু বয়স্কের পক্ষে কতটা উপকার হইবে, তাহা বিচার্য্য।”

“শিশুশিক্ষার্থীর উপকার ভিন্ন এই পরিবর্ত্তনে আর বিশেষ উপকার দেখি না। কেন না অধিকাংশ স্থলে আপনিও প্রচলিত রূপ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। য-ফলা র-ফলা রেফ ইত্যাদি চিহ্ন আপনি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। ‘ক্ষ’ প্রভৃতি যুক্তবর্ণের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন নাই। কাজেই কতিপয় পরিবর্ত্তনে ছেলেদের পরিশ্রম লাঘব হইবে কি?”

“বর্ণের রূপ একটা convention মাত্র। সকলে মিলিয়া মিশিয়া সহজ করিয়া লইলে কোনই গোল থাকে না।”

“প্রত্যেক বর্ণের রূপের একটা ইতিহাস আছে। বহু সহস্র বৎসরের পরিণতিতে প্রত্যেক বর্ণের রূপ দাঁড়াইয়াছে। পরামর্শ করিয়া ঐ রূপ-পরিবর্ত্তন অসাধ্য না হইতে পারে। কিন্তু

---

* প্রবাসী—১৩১৭ সাল বৈশাখ।

যতদিন ঐ পরামর্শে সুফল না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন এ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংযত করা উচিত নহে কি ?"

আমি মূল প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম, "কোন্ অক্ষর ভাল বলা যায় ? (১) যে অক্ষর কলমের এক টানে লিখিতে পারা যায়, অর্থাৎ যাহা লিখিতে কাগজ হইতে কলম তুলিতে ফেলিতে হয় না; (২) যে অক্ষর দ্বারা অন্য অক্ষরের ভ্রম হয় না; (৩) যে অক্ষর দেখিয়া পড়িতে চক্ষু পীড়ন করিতে হয় না; সে অক্ষর ভাল। * * * সংস্কার চাই, আমূল পরিবর্ত্তন চাই না। যে যুক্তাক্ষরে মূল অক্ষর এত ছোট, অস্পষ্ট কিংবা বিকৃত যে বুঝিতে কষ্ট হয়, তৎপরিবর্তে অন্য অক্ষর আবশ্যক। নীচে নীচে দুই তিনটি ব্যঞ্জন বসাইতে গেলে দুই একটা অক্ষর অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে নীচে নীচে না বসাইয়া পাশে পাশে জুড়িয়া দেওয়া ভাল।" (১৩১৬ সালের কার্ত্তিকের প্রবাসী।)

মূল প্রশ্ন আবার স্মরণ করা যাউক। প্রচলিত সব বাঙ্গালা অক্ষর উপরে লেখা পরীক্ষায় টেকে কি ? যে গুলা না টেকে, সে গুলার অল্প সংস্কারে ক্ষতি আছে কি ? এক এক অক্ষরের এক এক আদর্শ আছে। যুক্ত ও অযুক্ত আকারে একই আদর্শ রক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে কি ? বয়স্কের উপকার গণনা করিয়া সংস্কারের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। গানের সুর যে জানে, তাহাকে স্বরলিপি না দিলেও চলে। ছাপার ভুল বয়স্কে নিজে সংশোধন করিয়া থাকেন, লেখকের অপেক্ষা করেন না। আরও মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষিত বয়স্ক প্রথমে অক্ষর-পরিচয় করিয়া শিক্ষিত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বর্ণ-পরিচয় দুই ভাগ না শিখিলে বাঙ্গালা শব্দ পড়া সাধ্য হয় না। এই দুই ভাগ অভ্যাস করিতে শিশুর কত সময় লাগে ? এত সময় লাগিবার কারণ কি ? অক্ষর-পরিচয় উপেয় নহে; তাহা জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশের পথ মাত্র। সে পথ সুগম করিলে যে উপকার হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ক লিখি, কি ক লিখি, আদর্শ একই থাকে, হ্রস্ব দীর্ঘ আকারে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু যখন ক এর আদর্শ পরিবর্তন করি তখনই ধোঁকায় পড়িতে হয়।

উপরি-উদ্ধৃত পত্রে দেখা যাইবে, লেখক-মহাশয় ভাঙ্গিয়া না লিখিয়া ভাঙিয়া, কিন্তু না লিখিয়া কিন্তু্ লিখিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ যে ঙ্গ লেখা কিছু কষ্টসাধ্য, স্তু লেখা অপেক্ষা স্ত্‌ু লেখা স্বাভাবিক। কেহ কেহ ঙ্গ ছাড়িয়া যে ঙ লিখিতেছেন, তাহা কি উচ্চারণ ভাবিয়া, না কদাকার দেখিয়া, না লিখনশ্রম-কাতর হইয়া লিখিতেছেন ? যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে ইহাতে শব্দের বানান পরিবর্তন হইতেছে।

আধুনিক ছাপার অক্ষর এবং প্রাচীন পুঁথীর অক্ষর কি অবিকল এক ? ক অক্ষর কি জন্মাবধি এইরূপ আছে ? ২য় বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'নাগরাক্ষরের উৎপত্তি-নিরূপক তালিকা,' দেখিলে জানা যাইবে প্রচলিত অক্ষর একবারে বর্তমান আকার লইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই, বহুবিধ ব্যাপারের মতন অক্ষরেরও বহু রূপান্তর হইয়াছে। হয়ত ক অক্ষর প্রথমে বজ্রাকার (+) ছিল, পরে উহার বামদিকে রেখা আসিয়া ত্রিকোণ হইয়াছে, দক্ষিণ দিকের ঋজু

রেখা বাঙ্গালায় অঙ্কুশ (ক), নাগরীতে নিম্ন বাহু (क) হইয়াছে। লিখনশ্রমলাঘব, অক্ষরের সাদৃশ্যজাত ভ্রম-নিবারণ, এবং সৌন্দর্য-জ্ঞানতৃপ্তি প্রাচীন বজ্রকে ত্রিভুজে পরিণত করিয়াছে। ৯১০ শকের বঙ্গাক্ষর ছ ঠ ণ ফ ল শ হ এখনকার মতন ছিল না। অ আ ই ঈ উ ঊ ও ঔ এখনকার মতন ছিল না।

অত কথায় কাজ কি, প্রাচীন পুঁথীতে এবং এখন গ্রাম্য লেখকের লেখায় ল স্থানে নীচে বিন্দুযুক্ত ন পাওয়া যায়। পূর্বকালে রএর আকার ছিল পেটকাটা ব (ৰ)। আসামী অক্ষরে সেই প্রাচীন রূপ এখনও চলিতেছে। আশ্চর্যের বিষয়, নাগরী ৰ (বর্গ্য ব) অক্ষরের স্থানে কেহ কেহ এই প্রাচীন র (ৰ) দিয়া সংস্কৃত-গ্রন্থ মুদ্রিত করাইয়াছেন। লোকের রুচি বিভিন্ন, কিংবা গরজের তুল্য বালাই নাই। পূর্বে লেখা হইত, 'হরি ২ কি মোর করমগতি মন্দ।' এখন লেখা হইতেছে, 'হরি হরি'। পূর্বে 'শ্রী ১০৮' পাইলে বুঝিতে হইত এক-শ আটবার শ্রী উচ্চারণ করিতে হইবে। কিন্তু সে রীতি আর চলে না। আলস্যে অর্থাৎ লিখন-শ্রমলাঘবের চেষ্টায় স্থ, স্থ অক্ষরের থ ছিন্নাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু থ-এর দক্ষিণ রেখা কাটিয়াও দুইবার কলম তোলার শ্রম যায় নাই।

ঘট কচু-ডামণির সংবাদ অনেকে অবগত আছেন। প্রাচীন কালের হাতে-লেখা সংস্কৃত-পুঁথী পড়িতে হইলে আগে অর্থবোধ, সন্ধি-সমাস-বোধ করা চাই। লেখার সে রীতি এখন পরিবর্তিত হইয়াছে, সংস্কৃত শ্লোকের শব্দবিচ্ছেদ করা হইতেছে, কেহ কেহ ইংরেজী বিরাম-চিহ্নাদি সচ্ছন্দে বসাইতেছেন।

প্রাচীন উপদেশ, শতংবদ মা লিখ। এখন শতংবদ সহস্রং লিখ। প্রমাণ, ডাকঘরের সংখ্যা-বৃদ্ধি, ছাপাখানার সংখ্যা-বৃদ্ধি। লেখা আরও বাড়িবে, পড়াও বাড়িবে। সেকালে পুঁথীর অক্ষর গোটা-গোটা হইত। তখন লিপিকর-কলা ছিল। একখানা পুঁথী লিখিতে দুই চারি মাস লাগিত। এখন সে মন্দবেগ নাই। এখন টানা লেখার কাল পড়িয়াছে। যাহাকে যত লিখিতে হয়, যত তাড়াতাড়ি লিখিতে হয়, তাহার লেখা তত টানা, তত জড়ানিয়া হইয়া পড়ে। দোকানী-পশারী আমলা-মুহরীর লেখা গোটা-গোটা থাকিতে পারে না। দোকানী-পশারী নিজের স্মরণ নিমিত্ত খাতা লেখে, সাপ-বেঙ্গা যা-তা লিখিলেও তার কাজ চলে। আমলা-মুহরী পরের নিমিত্ত লেখে বটে, কিন্তু শব্দ গণিয়া যখন পয়সা উপার্জ্জন, তখন তাহার লেখা জড়ানিয়া টানা না হইয়া পারে না। বাঙ্গালা অক্ষরের কোণ-বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয় সেকালে লেখাপড়ার তেমন চর্চা ছিল না। তাড়াতাড়ি লেখাতে কোণ গোল হইয়া যায়, কাহারও বা সোজা হইয়া যায়। অনুমান হয় কাষ্ঠ-প্রস্তর-তাম্রাদি ধাতুতে রেখাঙ্কন করিতে গিয়া বাঙ্গালা সূক্ষ্ম-কোণ-বহুল অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, পূর্বের লেখনী (রেখনী) এমন কোমল হইয়াছে, হাতের লেখায় কোণ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

এই কোণ ভাঙ্গাতে, টানা লেখার অভ্যাসে এক নাগরী হইতে কায়থী, গুজরাতী, এবং মহারাষ্ট্রদেশের মোড়ী অক্ষরের উৎপত্তি। ইংরেজী ছাপার অক্ষর যেমন, হাতের অক্ষর তেমন

নয়। আমরা ভাবি, বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর উৎকৃষ্ট এবং আদর্শযোগ্য, এবং সেই আদর্শ হইতে দূরভ্রষ্ট হইলে হাতের লেখার নিন্দা করি। বাঙ্গালা হাতের অক্ষর ছাপাখানায় চলিত হয় নাই সত্য, কিন্তু হাতের লেখার আদর্শ ছাপা হইতেছে, হাতের লেখা পড়িবার পরীক্ষা হইতেছে, এবং কালে লেখাপড়ার বৃদ্ধিতে হাতের লেখাও ছাপার অক্ষরের তুল্য পদ পাইবে। আমি অক্ষর-সংস্কার প্রস্তাবে অল্প দূর গিয়াছি। কিন্তু যিনি দূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সংস্কার প্রস্তাব করিবেন, তিনি হয়ত ছাপার ও হাতের অক্ষরের ঐক্য-সাধনে মনোযোগী হইবেন। মরাঠী প্রদেশে মোডী-অক্ষর (হাতের অক্ষর) ও বালবোধ-অক্ষর (ছাপার নাগরী) লইয়া বিবাদ চলিতেছে।

বাঙ্গালা অক্ষরের নানা দশা গিয়াছে, নানা দশা আসিবে, পরিণতির শেষ নাই, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে পরিণতির প্রভেদ হয়, তখন কালে আদর্শও পরিবর্তিত হয়। ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে।

কিন্তু কোন্ পরিবর্তন ভাল ? যে পরিবর্তন অল্পে অল্পে হয়, প্রথমে সংস্কার-স্বরূপ হয়, সে পরিবর্তনে বিপ্লব ঘটায় না, প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া স্থায়িত্ব-প্রাপ্ত হয়। অতএব যে বাঙ্গালা অক্ষর অত্যন্ত জটিল, যাহাতে বাঙ্গালা ও নাগরী আদর্শ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সেই সেই অক্ষরের সংস্কার প্রথমে বাঞ্ছনীয়। এইহেতু জ্ঞ ষ্ণ ক্ষ যৌগিক অক্ষর বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, য-ফলা র-ফলা রেফ পরিবর্তনের প্রয়োজন পাই নাই, এমন কি ৎ অক্ষরের বিরুদ্ধে যাই নাই।

আদর্শ না পাইলে তুলনা করার সুবিধা হয় না। বাঙ্গালা দেশের নাগরী অক্ষর উপস্থিত ক্ষেত্রে আদর্শ ধরা যাউক। দেখা যাইবে, (১) নাগরী যুক্তাক্ষরে মূল অক্ষর ঠিক আছে, বিকৃত হয় নাই, (২) যে বাঙ্গালা যুক্তাক্ষরে মূল অক্ষর অস্পষ্ট ও নিয়মবাহ্য হইয়াছে, সেখানে আদর্শের গোলযোগ ঘটিয়াছে, বাঙ্গালা ও নাগরীর বর্ণ-সঙ্করত্ব ঘটিয়াছে। নাগরীকে নাগরী, বাঙ্গালাকে বাঙ্গালা রাখিলে আমার প্রস্তাব প্রায় আবশ্যক হইত না।

নাগরী অক্ষরের সহিত তুলনা করি।

বাঙ্গালা	নাগরী	বাঙ্গালা	নাগরী
ৎক, ৎপ, ৎস (তক=)त्क, (তপ=) त्प, (তস=)त्स		ঞ্চ ঞ্ছ	ञ्च ञ्छ
কু হু	कु हु	ট্র	ट्र
গু তু স্তু শু	गु तु स्तु शु	ণ্ট ঙ্গ	ण्ट ङ्ग
ক্রু দ্রু ধ্রু ভ্রু শ্রু	क्रु द्रु ध्रु भ्रु श्रु	ষ্ণ	ष्ण
রু	रु	ত্থ ত্ত ত্র ত্ম	त्थ त्त त्र त्म
কৃ হৃ দৃ ধৃ ভৃ	कृ हृ दृ धृ भृ	গ্ধ দ্ধ ন্ধ ব্ধ	ग्ध द्ध न्ध ब्ध
হ্ন হ্ম	ह्न ह्म	ন্থ স্থ	न्थ स्थ
ক্ত ক্র ক্ষ	क्त क्र क्ष	ক্ম ক্ষ্ম	क्म क्ष्म
ঙ্ক ঙ্গ	ङ्क ङ्ग	ক্য	क्य
ঞ্জ	ञ्ज	হ্ল হৃ	ह्ल ह्र

দেখা যাইবে কেবল জ্ঞ (জ্ঞ) এবং ক্ষ (ক্ষ) অক্ষরে নাগরীতে বৈষম্য ঘটিয়াছে, অন্যান্য ব্যঞ্জনাক্ষরযোগে ঘটে নাই। স্বরাক্ষরসংযোগ করিয়া দেখি

ক+ই=কি	क+इ=कि
ক+ঈ=কী	क+ई=की
ক+এ=কে	क+ए=के
ক+ও=কো	क+ओ=को
র+উ=রু	र+उ=रु
র+ঊ=রূ	र+ऊ=रू

ই (ি) ঈ (ী) অক্ষরের অতিশয় রূপান্তর হয়। বাঙ্গালা ও নাগরী, দুই অক্ষরেই রূপান্তরে মূল ই ঈ পাওয়া কঠিন। নাগরীতে বরং কিছু পাওয়া যায়, বাঙ্গালাতে ঈ হইতে ী আনা কঠিন। বাঙ্গালাতে ক+এ=কে ক+ও=কো অক্ষরে এ ও বিষম পরিবর্তিত হইয়াছে।

কেহ কেহ নাকি বলেন বাঙ্গালা অক্ষর হইতে নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি। ললিত-বিস্তরে বঙ্গ-লিপি নাম পাওয়া যায়। কিন্তু অক্ষরের আকার বিবেচনা করিলে বিপরীত অনুমান হয়। সে যাহা হউক লেখার সুবিধার নিমিত্ত অক্ষরের রূপান্তর হয়; তথাপি নাগরী দেখিলে মনে হয়, রূপান্তর না করিয়াও সুলেখ্য যুক্তাক্ষর করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা (ও নাগরীর) অধিকাংশ ব্যঞ্জনাক্ষর পরস্পর যুক্ত করিয়া লিখিবার উপযোগী। অধিকাংশের দক্ষিণ রেখা ঊর্দ্ধাধোভাবে আছে। নিম্নলিখিত অক্ষর গুলি সেরূপ নহে—ক ঙ চ ছ জ ঞ ট ঠ ড ঢ ত ফ ভ হ। ফলে, এই সকল অক্ষর অন্য ব্যঞ্জনের মাথায় বসাইবার সময় লিপি-বাহুল্য ঘটে। কএক স্থলে বাঙ্গালা অক্ষরে রূপান্তর ঘটিয়াছে। যথা, চিক্কণ, ককুখটী, সন্ধ্যা, সঙ্ঘটন, কচ্চিৎ, কচ্ছ, লজ্জা, ব্যঞ্জন, ঝঞ্ঝা, কট্টার, সট্‌ঠকার, উড্ডীন, উৎপত্তি, উত্থান, আহ্বান, ব্রাহ্মণ।

দেখা যাইবে, া ি ী ে ৈ ো ৌ, স্বরাক্ষর ব্যঞ্জনের পাশে, এবং ু ূ ৃ নীচে লিখিতে হয়। এইরূপ, ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জন যুক্তকরিতে হইলে কোন স্থলে পাশে কোন স্থলে নীচে কিংবা উপরে লেখা আবশ্যক হয়। কিন্তু যেমন করিয়াই লিখি মূল অক্ষরের মূর্তি যত রাখিতে পারি, ততই ভাল। এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে হইতেছে।

ৎ আর কিছু নহে, ত্‌ মাত্র।

শু ত্তু স্তু—অক্ষরে নাগরী উ (ु) আসিয়াছে। হু—অক্ষরে হ ক্ষীণ এবং ু প্রবল হইয়াছে। রু—অক্ষরে র অক্ষরের নীচের বিন্দু বোধ হয় বিপর্যস্ত শৃঙ্গাকার উ এর উৎপত্তির কারণ। কিন্তু তা বলিয়া, র-ফলা আছে বলিয়া ক্রু দ্রু গ্রু ভ্রু শ্রু লিখিবার হেতু বলবান নহে। র-ফলা-যুক্ত যাবতীয় অক্ষরে এই নিয়ম নাই। গ্রু ব্রু ইত্যাদি দেখুন।

রূ—নাগরীর বিপরীত। নাগরীতে रू=রূ। এই রূ এর সাদৃশ্যে ক্রূ গ্রূ দ্রূ হইয়াছে। কিন্তু অন্য র-ফলাযুক্ত অক্ষরে হয় নাই।

হৃ—হ এর নীচে ৃ-ফলা দিয়া লেখা (হৃ) কঠিন কি ?

ক্ত—নাগরী ক (ক) নীচে বাঙ্গালা ত ?

ক্র—ক এর নিম্ন রেখা জুড়িয়া দিলে ক্ষতি কি ?

ঙ্ক ঙ্গ—অন্ত্য অক্ষরে স্পষ্ট ঙ্‌ লেখা চলিত আছে। সখ্যা সঙ্ঘটন দেখুন। ঙ্ক ঙ্গ অক্ষরে ক গ এর মাথার উপরে ঙ শুইয়া পড়িয়াছে।

ঞ্চ—এই অক্ষরে শিল্পীর একটু নৈপুণ্য আছে। এখানে চ এবং ঞ দুইই আছে, কিন্তু জড়াইয়া গিয়াছে।

ণ্ড—এককালে ণ এর আকার প্রায় ল এর তুল্য ছিল। সে কালের ণ রহিয়াছে।

গ্ধ দ্ধ ন্ধ ব্ধ—এই সকল অক্ষরে স্পষ্ট ধ রাখিতে হইলে ধ এর কাঁধের বাড়ীটি মাথার অক্ষরে লাগিয়া যায়। তথাপি নাগরী অক্ষর দেখুন।

ন্থ স্থ—স্পষ্ট থ রাখিতে গেলে থ এর সঙ্গে ভুল হইবার আশঙ্কা ছিল। স্খলিত দেখুন। কিন্তু লেখার দোষে এই আশঙ্কা আসে।

হ্ম—হ ম জুড়িয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পাশের অঙ্কুশ উপরদিকে উঠিলে ঠিক হইত।

হ্ন, হ্ন—ণ হইতে ন পৃথক দেখাইতে গিয়া ন বাঁকিয়া অঙ্কুশ হইয়াছে।

জ্ঞ—জ ঞ দুই-ই আছে।

ষ্ণ—ষ অক্ষরের পৃষ্ঠে প্রাচীন ণ চড়িয়াছে। দন্ত উচ্চারণে ঞ ণ সাদৃশ্যও আছে।

ক্ষ—ক ষ স্পষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয়। হাতের লেখার টানে ক ষ অস্পষ্ট হইয়াছে।

র্ত্ত র্দ্ধ র্ম্ম র্য্য র্ব্ব ত্ত্ব ইত্যাদির বানানে দ্বিত্ব না করিলে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয় না। উচ্চারণও হয় না।

বাঙ্গালা অক্ষর আলোচনা করিলে আদি-শিল্পীর প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার আদর্শ অল্প ছিল,—বৃত্ত, দণ্ড, ত্রিভুজ। আদর্শের কোথাও বিপর্যাস, তাহাতে কোথাও অলঙ্কার যোগ করিয়া তিনি যাবতীয় অক্ষর নির্মাণ করিয়াছিলেন। শৃঙ্গ, অঙ্কুশ, কুণ্ডল, প্রধান অলঙ্কার হইয়াছিল। যেমন জ এর নীচে বিন্দু (জ়) দিয়া কেহ কেহ কোমল জ (যেমন পূর্ববঙ্গের কোন কোন শব্দে, ইংরেজী z, ফার্সী জে, যেমন জেয়াদা, জবর) অক্ষর জ্ঞাপন করেন, ড় ঢ় য় অক্ষরের উৎপত্তিতে সেইরূপ বিন্দু আসিয়াছে। র-অক্ষরের বিন্দু প্রাচীন বোধ হয় না। পেটকাটা ব তাহার প্রমাণ। (য় ড় সম্বন্ধে পরে দেখ)।

নাগরী অক্ষরের মাথায় মাত্রা—তির্যক রেখা—থাকে। সমান্তরে পঙ্‌ক্তি বসাইবার প্রয়োজনে মাত্রার উদ্ভব হইয়াছিল। বাঙ্গালা অক্ষরেও মাত্রা থাকে, কিন্তু খ ১ এ ঐ ও ঔ ঙ ঞ ণ অক্ষর মাত্রাহীন হইয়াছে। থ খ, ত্র এ, ড ঙ, ঞ ঞ, ন ণ অক্ষরের আকার-সাদৃশ্য এই অনিয়মের কারণ হইয়া থাকিবে।

ব্যঞ্জনাক্ষরের সহিত স্বরাক্ষর যুক্ত করিতে ব্যঞ্জনাক্ষরের রূপান্তর কল্পনা অনায়াসে নিবারিত হয়। ক্র ক্রু ইত্যাদি না লিখিয়া প্রচলিত অক্ষর সাহায্যে ত্রু, ব্রু লেখা চলে। এই প্রকার

২০

স্বরাক্ষর ব্যতীত দশ বারটা যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর আছে। ইহাদের আকারে আদর্শ রক্ষা করা কঠিন নহে।

মানুষ বহুদিন অনিয়মে থাকিতে পারে না। এক দিকে আকার-সৌষ্ঠব অন্যদিকে উৎপত্তির ইতিহাস বলবান হইয়া কাহাকেও এদিকে কাহাকেও অন্যদিকে আকর্ষণ করে। ধীর ব্যক্তি সামঞ্জস্য অন্বেষণ করেন। আদিম অবস্থায় বিশ্লেষণ আসে না। কর্মসাধনই এক চিন্তা হয়। পরে নূতন বিকল্প আসে, তখন কেহ পুরাতন নাড়া-চাড়া করিয়া সুখী হয়, কেহ বা পুরাতনের সময়োপযোগী সংস্কার আকাঙ্ক্ষা করে। এইরূপেই সংসারের গতি! কেবল দেখিতে হইবে সংস্কারের নামে বিকার আসিয়া না পড়ে।

৫। বাঙ্গালা সঙ্খ্যাবাচক শব্দ।*

আজিকালি ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানের তুল্য গণ্য হইতেছে। বাঙ্গালাভাষারও বিজ্ঞান আছে, এবং সে বিজ্ঞান অন্য বিজ্ঞানের তুল্য চিত্তাকর্ষক। জীব-বিজ্ঞানে যেমন জীবের আকার-প্রকার, স্বভাব-চরিত্র, জ্ঞাতি-গোত্র, পরিবর্তন প্রভৃতি আলোচিত হয়, ভাষা-বিজ্ঞানেও শব্দের তেমনই হয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের পূর্ব্বে আলোচ্য বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ আবশ্যক। যে বিবর্তন-বাদ আধুনিক কালের চিন্তার স্রোত নূতন পথে চালিত করিয়াছে, যাহা সমাজ-তত্ত্ব হইতে আকাশের জ্যোতিষ্ক-তত্ত্বে স্বীয় প্রণালী কাটিয়া দিয়াছে, সে বিবর্তনবাদ-প্রবর্তনের পূর্বে বহু ধৈর্যশীল পরিশ্রমী নিষ্কপট সত্যশীল ব্যক্তি তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আগে তথ্য, পরে শাস্ত্র।

বাঙ্গালাভাষার তথ্য সংগৃহীত হয় নাই, তথ্য দু-এক জনের দ্বারা সংগৃহীত হইবারও নহে। অল্পে অল্পে বহুজনের পরিশ্রম-ফল একত্র না হইলে বাঙ্গালাভাষা-বিজ্ঞানের বীজ বপন হইতে পারিবে না।

ভাষা-বিজ্ঞানের এক অঙ্গ, শব্দের বিকার বা পরিবর্তন আলোচনা। সংস্কৃতভাষার বহু বহু শব্দ বাঙ্গালায় বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়াছে। কালে যাবতীয় ব্যাপারের পরিবর্তন হয়। ভাষারও হয়। সংস্কৃত-ভাষারও হইয়াছিল। বেদ ও ব্রাহ্মণের ভাষা এবং পুরাণের ভাষা এক নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অসংখ্য সূত্র, তাহা সংস্কৃতভাষার ক্রমিক পরিবর্তনের সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া আছে। সংস্কৃতভাষা নাকি লোক-ভাষা ছিল না! কিন্তু সংস্কৃত-ব্যাকরণ একা সে সন্দেহ চূর্ণ করিয়া দিতেছে।

সংস্কৃতের পর পালি, এবং পালির পর সংস্কৃত-প্রাকৃত এ দেশের লোকভাষা ছিল। সংস্কৃত প্রাকৃতের পর বর্তমান প্রচলিত দেশভাষার জন্ম হইয়াছিল। যেমন বীজ পুতিলে গাছের জন্ম হয়, পিতামাতার সন্ততি হয়, যেমন পুরাকালের আর্য দেশের বর্তমান লোকে বিদ্যমান, পুরাকালের সংস্কৃত এখন প্রচলিত দেশভাষায় বিদ্যমান। প্রাচীন আর্যে এবং তাঁহার

* প্রবাসী—১৩১৬ সাল, আশ্বিন।

বর্তমান সন্তানে যেমন আকাশপাতাল অন্তর হইয়াছে, সংস্কৃত এবং বর্তমান দেশভাষাতেও হইয়াছে।

'কালে' পরিবর্তন হয়। আমরা এক 'কালের' নামে কত অজ্ঞান লুকাইয়া রাখি! বহু কারণপরম্পরার সংক্ষিপ্ত নাম কাল। সে কারণপরম্পরা পূর্ণরূপে জানাও অসাধ্য। ভাষাপরিবর্তনের কারণপরম্পরা জানাও অসাধ্য। শিক্ষার অভাব, জাতীয় প্রকৃতির পরিবর্তন, জল বায়ুর গুণ, অন্য জাতির সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে ভাষার পরিবর্তন হইয়া থাকে। শিক্ষার গুণে যে শব্দ সুখোচ্চার্য হয়, শিক্ষার অভাবে জিহ্বার জড়তায় কর্ণের আংশিক বধিরতায় তাহা দুরুচ্চার্য হইয়া অপভ্রষ্ট হয়। মানুষ সুখে থাকিতে চায়; সুখে থাকিতে ভূতের কীল খাইতে চাইবে কেন? শব্দটা 'একাদশ' হউক, এগারহ হউক, এগার হউক; সে বুঝিলে হইল, তাহার প্রতিবেশী বুঝিলে হইল যে ইহা ১০+১ সংখ্যার নাম। যখন 'এগার' বলিলে চলে, তখন শেষের অনর্থক 'হ' টার স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হিন্দীভাষী হ ('এগ্যারহ') রাখিয়াছে, বাঙ্গালা ওড়িয়া মরাঠীভাষী ছাড়িয়াছে। ছাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ও ওড়িয়াভাষী শব্দের অকারান্ত উচ্চারণে লুপ্ত হকারের চিহ্ন রাখিয়াছে। মরাঠী করিয়াছে এগারা (বস্তুতঃ 'অকারা'), বাঙ্গালী ও ওড়িয়া করিয়াছে এগার়; এগার্ করিতে পারে নাই।

লোকে বলে বিড়ালের কঠিন প্রাণ। শব্দেরও প্রাণ কঠিন বলিতে পারা যায়। শব্দ সহজে বিকৃত বা অপভ্রষ্ট হইতে চায় না। বর্ণ লুপ্ত হইলে লোপচিহ্ন উচ্চারণে থাকিয়া যায়। এগারহ শব্দের হ লুপ্ত হইয়াছে। অকারান্ত 'র' তে সেই হ লুকাইয়া গিয়াছে। মরাঠী করিয়াছে আ (যেমন বারা, তেরা), কান দিয়া শুনিলে গ্রাম্য বাঙ্গালী ও ওড়িয়ার মুখে কখন কখন শুনি অঃ (যেমন বারঃ, তেরঃ)। বাঙ্গালা অক্ষরের দোষে ও অভাবে বার (পালা), বার (১২), লিখিয়া প্রভেদ দেখাইতে পারা যায় না। এই আকস্মিক কারণে অনেক শব্দ ক্রমশঃ বিকৃত হইতেছে। সং চতুর্ শব্দের বহুবচনে চত্বারি, দ্ব বা দ্বি শব্দের দ্বিবচনে দ্বৌ। এই দ্বৌ, ও চত্বারি শব্দে অন্তঃস্থ ব (ৱ) বাঙ্গালায় লিখিয়া জানাইবার উপায় নাই। বাঙ্গালা অক্ষরে কত সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপা হইতেছে; কিন্তু এক ব লিখিয়া দুই ব-কারের কাজ চলিতেছে। যে শব্দের ধ্বনি যেমন, তেমন না পাইলে চলেনা। সং দ্বৌ হইতে হিং দো, বাং দুই, ওং দুই, মং দোন। চত্বারি হইতে হিং চার, বাং চারি, ওং চারি, মং চার। বাং চারি হইতে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে 'চাইর'; কদাপি 'চার' নহে। কেহ কেহ 'চার' লিখিতেছেন; কিন্তু চা এবং র এর মাঝে যে ঈষৎ ই আছে, তাহা ধরিতেছেন না। ফলে 'চারি' শব্দের বিকারের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। কিংবা ঈষৎ ই জানাইবার অক্ষর না পাইয়া 'চার' লিখিতেছেন। এইরূপ, তাঁহারা লিখিতেছেন, 'আজ কাল' (আজি কালি বা আইজ কাইল)। কেহ কেহ 'চাল ডাল' লিখিয়া এবং বলিয়া শব্দ-বিকারের কারণ হইতেছেন। ভাষাতত্ত্বে যথেচ্ছাচারিতা চলে না। এইহেতু এখানে দুই-একটা চিহ্ন আবশ্যক হইতেছে। উচ্চারণ অকারান্ত বুঝাইতে অক্ষরের নীচে মাত্রা বা কষি দেওয়া যাইবে; যথা, এগার়। ই উ গ্রস্ত হইলে অর্থাৎ ঈষৎ

উচ্চারিত হইলে ই উ কারের মাথার শিং (ˋ) দেওয়া যাইবে। যথা, চা'র। আমরা গ্রাম্য শব্দের স্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে চাই। কিন্তু, ভাষা-তত্ত্বে গ্রাম্য শব্দ অবহেলার যোগ্য নয়। স্থান-ভেদে গ্রাম্য শব্দের অত্যন্ত পরিবর্তন হয়। রাঢ়ের (দক্ষিণ রাঢ়ের) গ্রাম্য শব্দ জানা আছে বলিয়া এখানে গ্রা° নামে সেই শব্দ বলা যাইবে। বিদ্যাসাগর-মহাশয় 'বোধোদয়' পুস্তকে যে সংখ্যাবাচক শব্দ দিয়াছেন, তাহা রাঢ়ের (প্রায়) গ্রাম্য শব্দ। (উ°—উচ্চারণ)।

আমরা লিখি 'শাক', 'বক'; কিন্তু, প্রাকৃত জন 'শাগ' 'বগ' বলে। পূর্বকালের সংস্কৃত-প্রাকৃতভাষীরাও সংস্কৃত শব্দের ক স্থানে গ করিত। তাহারা স° একঃ পদকে 'এগো' করিত, এবং আমরা বা° 'গোটা' (এগোটা) শব্দে সেই গো রাখিয়াছি। স° একাদশ বা°-তে এগার। শব্দটি বাস্তবিক এগা-রহ। স° দশ স্থানে রহ হইয়াছে। সংস্কৃত-প্রাকৃতভাষী শ ষ বলিতে পারিত না; জানিত কেবল স, এবং তাহাও ছ কিংবা হ করিয়া ফেলিত। স° ষষ্ (৬)—বা° ছয়, ও° ছ, হি° ছঃ, ম° সহা। দশ শব্দ মরাঠীতে দহা। স° একাদশ শব্দ তবে এগাদহ হইত। সংস্কৃত শব্দের চ ত দ প ব্ প্রভৃতি বর্ণ প্রাকৃত-ভাষীরা লোপ করিত। ফলে, এগাদহ স্থানে এগা-অহ হইত। শব্দের মাঝের অসংযুক্ত স্বরবর্ণ উচ্চারণে ধৈর্য চাই। এই ধৈর্যলাভের চেষ্টায় র আগম হইয়া অহ শব্দ রহ করিয়া ছাড়িয়াছে। এই কারণে 'উপকথা' স্থান-বিশেষে হইয়াছে রূপকথা, উই হইয়াছে রুই। ছিল একাদশ্, হইয়াছে এগাদস্—এগাদহ্—এগারহ্—এগার্।

এইরূপ, স° দ্বাদশ—বা-রহ। সংস্কৃত শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতভাষী উচ্চারণ করিতে পারিত না। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মাথার বর্ণ লোপ করিয়া নীচেরটি রাখিত, যেন নীচের বর্ণ-টাই শব্দের চরম, এবং সেই চরম স্থানে পহুঁছিতে পারিলে হাঁপ ছাড়িতে পারা যায়। দ্বা করিয়াছিল বা (বর্গ্য ব)। এইরূপ, সপ্ত—সাত, অষ্ট—আট, পঞ্চ—পাঁচ। ব্যঞ্জন-লোপের চিহ্ন-স্বরূপ পূর্ববর্ণের স্বর দীর্ঘ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতজন যখন 'ভাত'কে 'বাত' এবং 'ঘর' কে 'গর' বলে, তখন 'বা' ও 'গ' এর উচ্চারণে জোর দিয়া ভ এবং ঘ বর্ণের লুকানা হ বর্ণ জানাইয়া দেয়। প্রাকৃত জন রেফ লোপ করিয়া নীচের ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব করে। স°-প্রাকৃতভাষী করিত, অদ্যাপি বা°-প্রাকৃতভাষীও করে। সর্পকে করে 'সপ্প', কর্মকে করে 'কম্ম'। কিন্তু, এখানে আবার সংযুক্ত ব্যঞ্জন। মাথার বর্ণ কাটিয়া এবং পূর্ববর্ণের স্বর দীর্ঘ করিয়া আমরা করিয়াছি সাপ, কাম (পূর্ববঙ্গে, ও°, হি°)। সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনের দুইটি বর্ণ পৃথক পৃথক উচ্চারণ জিহ্বার অল্প অভ্যাসে আসে না। একই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হইলে উচ্চারণ-ক্লেশ লঘু হয়। সর্প বলা অপেক্ষা সপ্প বলা সহজ। এই কারণে স° সপ্ত হইয়াছে সত্ত, ষষ্টি—ষট্টি, অষ্ট—অট্ট—আট্ট (যেমন তিন আট্টে—আট্টে—চোব্বিশ)। স° সপ্তদশ—হি° সত্তরহ, ম° সতরা, বা° ও° সতর্। স° সপ্ততি—সত্তই (ত লুপ্ত),—সত্তরি (র আগত)। ও° সত্তরি; ঢাকায় সত্তইর যশোরে সত্ত'র রাঢ়ে স'ত্তর, হি° সত্তর, ম° সত্তর। সংস্কৃত শব্দে র ফলা থাকিলে বা°-প্রাকৃতে তাহা পৃথক হইয়া পরে গিয়া বসে, কিংবা লুপ্ত হয়। রাত্রি শব্দ আমরা উচ্চারণ

করি রাত্ত্রি, অপভ্রংশে রাত্তির। রাঢ়ের প্রাকৃত জন করে রাত্তি, আরও অপভ্রংশে রাত্তি—রাইত—রাত। অর্থাৎ ত্+ই স্থানে ই+ত্ হইয়াছে। এই হেতু সত্তরি—সত্তইর—সত্তর, চারি—চাইর—চার।

হি° তেরহ বা° ও° তের্ ম° তেরা শব্দ সং ত্রি-দশ হইতে না আসার কথা। কারণ সং ত্রয়োদশ শব্দ তের্ অর্থে চলিত ছিল, এবং সংস্কৃত চলিত শব্দ হইতে বর্তমান দেশভাষার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সং ত্রয়োদশ শব্দের য়ো সাধারণ লোকের (বাঙ্গালীর) মুখে 'ও' হইয়া শব্দটি ত্রওদশ হয়। বায়ু তাহাদের মুখে 'বাউ', কৃপাময়ী—'কৃপামঈ'। গ্রাম্যজন ত্রওদশ শব্দকে তিরোদশ করে। ত্রয়োদশ—তিরো-রহ হইতে তেরহ আসিয়াছে কি না সন্দেহ। এরূপ হইলে অন্য তিন ভাষায় 'তিরোরহ' শব্দের আভাস পাওয়া যাইত। বোধ হয়, ত্রওদশ হইতে ত্রও-রহ। 'ও' টা লোপ না করিলে শব্দ সহজ হয় না। ত্ররহ থাকে। ত্র একটা র-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে। ত র পৃথক করিলে তর-হ হয়। ইহাও সুবিধা নয়। একটা র কাটিলে তরহ হয়। কিন্তু চারি ভাষাতেই তে আছে, ত নাই। এখানে একটু কৌতুকের কথা আছে। অনেকে 'ক্রমে ক্রমে' না বলিয়া বলে 'ক্রেমে ক্রেমে' (বা° ও° গ্রা° কেরমে-কেরমে), 'প্রসন্ন না বলিয়া বলে 'প্রেসন্ন' (গ্রা° পেসন্ন), 'প্রয়োগ' বলে 'প্রেয়োগ' (উ° প্রেওগ), 'প্রয়োজন' বলে 'প্রেয়োজন' (উ° প্রেওজন), কখনও বা ''প্রিয়জন'। যেন র-ফলা-যুক্ত অকারান্ত ব্যঞ্জন একারান্ত পড়িতে হইবে।* এই যে বিকার, ইহা কি হঠাৎ আসিয়া জুটিয়াছে? ইহা আধুনিক নহে। আধুনিক নব্য শিক্ষিত অ স্থানে এ করেন না, সে কালের পণ্ডিত ও ভদ্রলোকে করেন। বোধ হয়, পূর্বকালেও এইরূপ হইত। ত্রয়োদশ হইত ত্রে-ওদশ; র লোপে তে-দশ—তে-রহ—তের্। এইরূপ, সং গ্রহ হইতে বা° গের্ (বিপত্তি) (চন্দ্র-) গ্রহণ হইতে বা° গেরণ, ম° গিরাণ।

সং চতুর্দশ—(ত লোপে) চউদ্দহ। অউ আমরা ঔ মনে করিয়া 'বউ' লিখিতেছি 'বৌ'। এই হেতু চৌদ্দহ। ও° চউদ্, হি° চৌদহ, ম° চৌদা, বা° চৌদ্দ। দ্দ করাতে শেষের হ অনাবশ্যক হইয়াছে। বস্তুতঃ এখন শুনি চোদ্দ।

সং পঞ্চ-দশ হইতে পঞ্চ-রহ পাইতে গোল নাই। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মাথার ঞ অনেককাল হইতে ন হইয়াছে। আমরা লিখি পঞ্চ, কিন্তু পড়ি পন্‌চ। চ লোপে থাকে পন্, দাঁড়ায় পন-রহ—পন-র্। এখানে নূতন নিয়ম পাইতেছি। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মাথার বর্ণ লুপ্ত হয়; এখানে নীচের বর্ণ (চ) লুপ্ত হইয়াছে। বোধ হয় পঞ্চ স্থানে পঞ্চঁ হইয়া পঞ্চঁরহ—পনর্ হইয়াছে। চ স্থানে ত হয়। চালিশ (৪০) হইয়াছে তালিশ (যেমন তে-তালিশ, পঁয়-তালিশ)। পন্‌চ—পন্‌ত—পন্‌দ হইয়া ও° পন্দর্, হি° পন্দ্রহ, ম° পন্‌ধরা, চট্টগ্রামে পঁদর। পরে দশ শব্দ আছে বলিয়া পন্‌চ শব্দের চ—ত সহজে দ হইয়াছে। দেখা যাইতেছে সং পঞ্চদশ শব্দ চারি ভাষাকেই ফাঁপরে ফেলিয়াছিল।

---

* ইহার বিপরীত 'প্রেম' শব্দকে কেহ কেহ বলে 'প্রম'।

সং ষোড়শ শব্দে সংস্কৃতভাষীর নিয়মলঙ্ঘনের লক্ষণ পাই। ষষ্-দশ—ষট্‌দশ—ষড়্‌দশ না হইয়া ষোড়শ! যেন ষষ্ স্থানে ষস্ হইয়া শেষে ষো। দ স্থানে ড আসা বিচিত্র নয়। ড র ল এই তিন বর্ণের একটা অন্য দুইটার স্থানে বসিতে পারে। ড হইতে ল তে আসিতে মাঝে আর একটা ল ছিল। সে ল-কারের উচ্চারণ ড এবং ল-কারের মাঝামাঝি। বাঙ্গালা-ও হিন্দীভাষী সেই প্রাচীন ল হারাইয়াছে। ওড়িয়া মরাঠী তেলুগু মালয়লম প্রভৃতি ভাষী দুই ল রাখিয়াছে। সং ষোড়শ—হিং ষোলহ, মং সোঌা, সং ষোঌ, বাং ষোল্।

সং সপ্তদশ হইতে সত্তরহ—সতর্ (বাং, ওং)। সপ্তদশ হইতে সাতরহ—সাতর্ হয় নাই (যশোরে সাতারো)। ইহাতে বোধ হইতেছে, সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ হইলে পূর্ববর্ণের স্বর দীর্ঘ হইবার নিয়ম পূর্বকালে বাঙ্গালাতে ছিল না। আমরা আদ্য বর্ণের অকারকে আকার করিয়া ফেলি। আমরা ইংরেজী অফিশকে করি 'আপিস', কলেজকে করি 'কালেজ'। সং অষ্টাদশ—ওং অঠর্, হিং অঠারহ, মং অঠরা, বাং আঠার্। সং শব্দের ষ্ট স্থানে সং-প্রাকৃতে ঠ হইত (যেন ষ্ট—টষ্—টহ্—ঠ; টহ্=ঠ)। অষ্টা—অঠা; সুতরাং অঠারহ হইবার ছিল, এবং হিন্দীতে তাহাই আছে। সং কাষ্ঠ বাং কাঠ অনেকে বলে 'কাট' এবং শুদ্ধ করিয়া বলে 'কাষ্ট'। অষ্ট শব্দ আঠ হইবার ছিল, ওং হিং মং তে আঠ আছে, 'আট' নাই।

উনিশ শব্দ সং একোনবিংশতি। সং-তে নবদশ, নববিংশতি, নবত্রিংশৎ ইত্যাদিও হয়। হয়ত, সংস্কৃতভাষায় নবদশ অর্থে ১০+৯, এবং ৯×১০, অর্থাৎ দুইটি সংখ্যার যোগ কিংবা গুণ—দুই-ই বুঝাইবার আশঙ্কা ছিল। ত্রিদশ অর্থে ১০+৩, প্রায়ই ৩×১০; নবনবতি অর্থে ৯০+৯ এবং ৯×৯০ দুই-ই বুঝাইত। হয়ত এই কারণে ত্রি শব্দের বহুবচনের রূপ ত্রয়স লইয়া ত্রয়োদশ, ত্রয়োবিংশতি ইত্যাদি করিতে হইয়াছিল। সং একোন লইয়া বর্তমান দেশভাষা সন্দেহার্থ পরিত্যাগ করিয়াছে। একোন শব্দের 'এক' লোপ করিয়া বাং হিং উন্ ওং অণ্ রাখিয়াছে। মরাঠী লোপ করে নাই, একোণ, একুণ করিয়াছে। কিন্তু বাং হিং মং সং একোনশত শব্দ না লইয়া সং নবনবতি শব্দ হইতে বাং নিরানব্বই, হিং নিনানবে মং নিব্যাণ্ণব করিয়াছে। ওং অণেশত (অর্থাৎ উনশত) করিয়াছে, পর্যায়ভঙ্গ করে নাই।

সংস্কৃতভাষী আর্য এক হইতে দশ সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যার সহিত যুক্ত দশ, দুই দশ, তিন দশ ‥দশ-দশ ইত্যাদি দশমিক গণনার উদ্‌ভাবক হইয়া অন্য জাতিকে গণিতে শিখাইয়াছিলেন। সে অপূর্ব বুদ্ধি-শক্তির পরিচয় সকলেই পাইয়াছে। বিংশতি—কিনা দ্বি-দশ, ত্রিংশৎ—কিনা ত্রিদশ; যেন 'দশ' শব্দ স্থানে অশ—ংশ হইয়াছে। তি, ৎ মূলশব্দের অঙ্গ নয়। তেমনই সং ব্যাকরণের পঞ্চন্ সপ্তন্ ‥দশন্ শব্দের শেষের ন্ শব্দের অঙ্গ ছিল না। পঞ্চাশৎ পর্যন্ত এক প্রকার। ইহার পর তি দ্বারা দশ বুঝায়। ষষ্-দশ—ষষ্-তি, সপ্ত-দশ—সপ্ত-তি, অষ্ট-দশ—অশী-তি (ষ্ট স্থানে শী?), নব-দশ—নব-তি। দশ শব্দের পরিবর্তন কেন আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার আভাস উপরে পাওয়া গিয়াছে।

সং বিংশতি—বাং বিশ (উং বীশ)। ব লোপে ইশ থাকে। তাই দ্বাবিংশতি—বা-ইশ, ওং-তে প্রায়ই বাইশি। তি লোপ আশ্চর্যের নয়। বিংশতি হইতে বিশ হইবার ছিল। বোধ হইতেছে, গ্রাম্য বিহারীর মুখে ব্রীঁস শুনিতে পাওয়া যায়। সং ত্রিংশৎ—ত্রিশ, গ্রাং তিরিশ। মং, হিং-তে তীস, ওং-তে তিরিস। তিঁ পাই না। কিন্তু হিং তেঁতীস, চৌতীস, সৈঁতীশ শব্দে অনুনাসিক আছে। রাঢ়েও চৌত্রিশ, সাঁয়ত্রিশ। বোধ হয়, কালে অনুনাসিকত্ব হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। সং চত্বারিংশৎ—চআরিশ—চারিশ—চালিশ; ওং হিং মং চালীস। আমরা প্রায়ই চল্লিশ বলি। হয় চাল্লিশ কিংবা চল্লিশ—দুই-ই চলে। চাল্লিশ ঠিক হয় না। চ স্থানে ত, ত এবং চ ত লুপ্ত হইতে পারে। তে-চালিশ—তে-তালিশ—তে-আলিশ। পঞ্চাশৎ—পন্‌চাশ (পঞ্চাশ)। কিন্তু একান্ন, ছাপান্ন,—অর্থাৎ পঞ্চাশৎ স্থানে পান্ন, এবং প লোপে আন্ন। সং পঞ্চাশৎ—পন্‌চাহ—পন্‌চা কিংবা পনাহ হইবার কথা। হয়ত পনাহ শব্দের হ লোপে পান্ন হইয়াছে। ওং পন বন, হিং পন ৱন, কিন্তু মং পন্ন বন্ন করিয়াছে। সং ষষ্টি—ষাটি বা ষাইট—ষাঁট। ষষ্টি—ষটিও হইতে পারিত। সং সপ্ততি—সত্তরি। বাং প্রাকৃতে শব্দের শেষের ই উ লুপ্ত হয়। 'রীতি' হয় 'রীত', 'ধাতু' হয় 'ধাত'। বাং হিং মং সত্তর। স স্থানে হ হইয়া হত্তর। হিং এক-হত্তর ব-হত্তর ইত্যাদি, ওং একস্তরি (সত্তরি-স্তরি) বা-স্তরি, মং একাহত্তর বা-হত্তর। বাং-তে বা-হত্তর হইবার ছিল। আদ্য অকারকে আ করিবার ঝোঁকে রাঢ়ে বাহাত্তর। হ লোপে আ; বা-আত্তর, তে-আত্তর, ইত্যাদি। সং অশীতি—তি লোপে ওং অসী, হিং অস্‌সী, মং ঐশী, বাং আশী। বাং বি-আশী—বি-রাশী (র আগম); তেমনই তি-রাশী, চৌ-রাশী। সং নবতি—নবই হয়। ব লোপে রাঢ়ে গ্রাং নই, ওং-তে নউ। নবতি—নবই; অ+ই=এ করিয়া ওং নবে, হিং নব্বে; ত স্থানে দ করিয়া মং নব্বদ। বোধ হয়, ত লোপ চিহ্ন রাখিতে গিয়া নবই না হইয়া বাং নব্বই। আ আগম হইয়া আনব্বই, যেমন একানব্বই, বি-আনব্বই—বিরানব্বই।

আরও কথা আছে। এক শব্দ কেবল এগার শব্দে পরিবর্তিত হইয়াছে। (চট্টগ্রামে এগাশী এগানব্বই)। দ্বৌ হইতে দোই—দুই সহজে আসে। অন্য শব্দে সং-তে দ্বা বা দ্বি। দ্বা হইতে বা, যেমন বাইশ; দ্বি হইতে বি, যেমন বি-আলিশ। দ্বা হইতে ব আসিয়া ব-ত্রিশ। সং ত্রি হইতে তিন নহে; ত্রি শব্দের বহুবচনে ত্রীণি হইতে র লোপে ওং তিনি, শেষের ই লোপে বাং তিন। উচ্চারণে তীন। হিং মং-তে তীন লেখা হয়। আমরা অনেক শব্দ বলি এক রকম, লিখি আর এক রকম। সং ত্রয়স্ কিংবা ত্রি হইতে তে, যেমন তে-ইশ। সং চতুর্ হইতে চারি নহে; চতুর্ শব্দের বহুবচনে চত্বারি। ইহা হইতে চআরি—চারি। অন্য শব্দে চতুর্—চউ—চৌ। চৌ প্রায়ই চো, এমন কি, চু হইয়া পড়ে। চৌদ্দ, চৌত্রিশ, চৌষট্টি ইত্যাদি। চোব্বিশ বাস্তবিক চৌবিশ। আমরা চোব্বিশ লিখি না, লিখি চব্বিশ। এরূপ বানানের কারণ এই। ই উ পরে থাকিলে অ-স্বর ঈষৎ ও উচ্চারিত হয়। যেমন 'হরি' আমরা বলি 'হোরি', 'মধু' আমরা বলি 'মোধু'। ইহার উলটা করিয়া যেখানে শব্দে

ও আছে, সেখানে অ দিয়া বসি। 'দোড়ী' শব্দ শুদ্ধ ; আমরা প্রায়ই লিখি 'দড়ী', 'গোরু' শুদ্ধ, আমরা লিখি 'গরু'। বোধ হয়, এই কারণে চোব্বিশ (বা চোবিশ) স্থানে চব্বিশ লেখা হইয়া থাকে। গৌর—গোরা, ঔষধ—ওষুধ, ঐ স্থানে ও হইয়াছে। কিন্তু চো স্থানে চু বলা গ্রাম্যতা মনে হয়। চো-আল্লিশ, চো-আন্ন, চো-আত্তর, চো-রাশী চো-রানব্বই বরং ভাল। সং পঞ্চ—পাঁচ। কিন্তু অন্য শব্দে পন্ (যেমন পনর), পঁচ (যেমন পঁচিশ), পঁঅ—পঁয় (যেমন পঁয়ত্রিশ) হইয়াছে। বঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে পাঁচ-চল্লিশ, পাঁচ-পান্ন ইত্যাদিও আছে। সং ষষ্—সহ্—ছঃ (হিং উং), ওং ছ, বাং ছয়। সহ—ছঅ—ছয়। বাঙ্গালা-ভাষী শব্দের শেষের অ উচ্চারণে লুপ্ত করিতে চায়। ছঅ বলিতে যেন ধৈর্য থাকে না, অ ঈষৎ করিতে গিয়া ছয় হইয়াছে। কিন্তু, ছঅ=ছা হইয়া ছাব্বিশ। য় অন্তেই ই—এ হয়।* ছয় হইতে ছি হইয়া ছি-আশী, ছি-আত্তর। সং সপ্ত—সাত। কিন্তু অন্য শব্দে সত-র, সাতা-ইশ, সাতচল্লিশ। সাত হইতে সাঅ—সায় ; সায়ত্রিশ। সং অষ্ট—আট। আঠা-র, আঠাইশ, কিন্তু অন্যত্র আট, যেমন আট-ত্রিশ, আটাত্তর। কিন্তু (প্রায়ই) অষ্টাশী। আটাশী করিলেও চলে ; আশঙ্কা আঠাইশ—আঠাশ। সং নব—নঅ—নয়। নয়—হইতে নি (য় স্থানে ই) হইয়া নি-রানব্বই।

ভাষার শব্দের আশ্চর্য গতি। তথাপি বিকারের সময় এক পর্যায়ের শব্দ সাদৃশ্য ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করে। বি-রাশী, অতএব বি-রানব্বই ; একান্ন, অতএব বাআন্ন। বঙ্গের যেখানে পন্চাশ স্থানে পান্ন হয় নাই, সেখানে একপন্চাশ, চৌপন্চাশ, ছপ্পন্চাশ, সাত-পন্চাশ, আট-পন্চাশ, আছে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে কোথাও পন্চাশ, কোথাও পান্ন আন্ন হয় না। বা-পন্চাশ, তে-পন্চাশ শুনি নাই। উনইশ না হইয়া উনিশ, যেন উন্ নহে, উন্। উন্ না আছে এমন নয়, উন্ত্রিশ, উন্চল্লিশ, রাঢ়ে আছে, ঢাকাতেও আছে।

এই সকল শব্দ আলোচনা করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে আমরা কএক জন বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ রাখিতে সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রাকৃত জন অশুদ্ধ করিয়া ফেলিবে। সংস্কৃত ভাষা অপভ্রষ্ট করিতে সে কালের প্রাকৃত জন ছাড়ে নাই। আমরা সেই অপভ্রষ্ট শব্দ বারম্বার অপভ্রষ্ট করিয়া জীবনযাত্রার কাজ নির্বাহ করিতেছি। যে দশমিক গণনা বর্তমান দশাংশিক (Decimal) গণনার মূল, এবং যাহা দেখাইয়া আমরা অপর জাতির নিকট প্রশংসালাভের প্রয়াসী হই, তাহার এক-শ-টা শব্দ আমরা ঠিক রাখিতে পারি নাই। দুই চারি শব্দের অল্প পরিবর্তন করিলে অন্ততঃ পর্যায় বা পাটী রক্ষিত হয়। এখানে এইরূপ পরিবর্তন করিয়া সংখ্যাগুলি লেখা যাইতেছে। এগারা বারা তেরা পনরা ষোলা সতরা আঠারা করিলে শেষ স্বর সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

এক এগার, একইশ, একত্রিশ, একচালিশ, একান্ন, একষট্টি, একাত্তর, একাশী, একানবই। দশ।

---

* ইহার বিপরীত বট্টি—ষট্টি ; চট্টগ্রামে বট্টা, যেমন একবট্টা।

দুই বার, বাইশ, বত্রিশ, বিআলিশ, বাআন্ন, বাষট্টি, বাআত্তর, বিরাশী, বিরানবই। বিশ।

তিন তের, তেইশ, তেত্রিশ, তেআলিশ, তেআন্ন, তেষট্টি, তেআত্তর, তিরাশী, তিরানবই। ত্রিশ।

চারি চৌদ্দ, চৌবিশ, চৌত্রিশ, চৌআলিশ, চৌআন্ন, চৌষট্টি, চৌআত্তর, চৌরাশী, চৌরানবই। (কিংবা সর্বত্র চো)। চালিশ।

পাঁচ পনর, পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ, পঁয়চালিশ, পঁচান্ন, পঁয়ষট্টি, পঁচাত্তর, পঁচাশী, পঁচানবই। পন্‌চাশ।

ছয় ষোল, ছাবিশ, ছত্রিশ, ছিআলিশ, ছিআন্ন, ছষট্টি, ছিআত্তর, ছিআশী, ছিআনবই। ষাট।

সাত সতর, সাতাইশ, সায়ত্রিশ, সাতচালিশ, সাতান্ন, সাতষট্টি, সাতাত্তর, সাতাশী, সাতানবই। সত্তরি।

আট আঠার, আঠাইশ, আটত্রিশ, আটচালিশ, আটান্ন, আটষট্টি, আটাত্তর, আটাশী, আটানবই। আশী।

নয় উনইশ, উনত্রিশ, উনচালিশ, উনপন্‌চাশ, উনষাটি, উনসত্তরি, উনআশী, উননবই, উনশত বা নিরানবই।

৫। বাঙ্গালা শব্দের বানান।*

সংস্কৃত ভাষায় বর্ণন শব্দের অর্থ শুক্লাদিবর্ণযোজন। বর্ণতুলী অর্থে লেখনী, বর্ণকূপী অর্থে মস্যাধার, বার্ণিক বা বর্ণিক অর্থে লেখক। কখ-আদি লিখিতে বর্ণ বা রঙ্গ আবশ্যক হয় বলিয়া কখ-আদি ধ্বনিও বর্ণনাম পাইয়াছিল। যাহার ক্ষর—নাশ—নাই, তাহা অক্ষর। বোধ হয় অক্ষর শব্দের আদিম অর্থ ধাতু প্রস্তরাদিতে উৎকীর্ণ রেখা। বর্ণ-লেপন দ্বারা লিপি। লেখনী বা রেখনী দ্বারা হউক, তুলী দ্বারা হউক, ফল এক,—চিত্র। চিত্রকর প্রতিমার চাল লেখে। তুলী দিয়া সে আঁকে না, সে লেখে। এই বাঙ্গালা প্রয়োগ হইতেও বুঝিতেছি কালে লেখা ও লিপি অভিন্ন হইয়াছে।

এক জনের নাম রাম। রাম একটা শব্দ বা ধ্বনি। সে ধ্বনি এবং হস্তপদাদি-বিশিষ্ট মূর্তি অবশ্য এক নহে। যখন, রাম—এই ধ্বনি করি, তখন সেই মূর্তি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে; দূরে থাকিলে আজ্ঞে কিংবা আর কিছু শব্দ করিয়া জানায় আমার আহ্বান বুঝিয়াছে। কালে শব্দ এবং শব্দ-বাচ্য বস্তু অভিন্ন বোধ হয়।

এইরূপ অভেদ-জ্ঞান বর্ণ-শব্দ এবং বর্ণ-মূর্তিতে ঘটিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়া-

* প্রবাসী—১৩১৭ সাল, আশ্বিন।

ছিলেন, বাঙ্গালা বর্ণ-পরিচয় ; অধুনা কেহ লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা অক্ষর-পরিচয়। যখন রামের সহিত পরিচয় করি, তখন রাম-নামধারী মূর্তির সহিত করি ; রাম,—এই ধ্বনির সহিত করি না। রাম-ধ্বনির সহিত পরিচয় করিতে হইলে রাম-নাম-বাচ্য মানুষের সহিতও করিতে হয়। শাব্দিক সে পরিচয় করিয়া থাকেন।

ভাষা-শিক্ষার নিমিত্ত ভাষার শব্দ শিক্ষা করিতে হয়। এক কিংবা অধিক বর্ণের—ধ্বনির—সংযোগে এক এক শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাম—শব্দের বানান—র্ আ ম। আরও বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়, র্ আ ম্ অ। অতএব শব্দের মূল-ধ্বনির বিশ্লেষণ কিংবা সংযোজনকে আমরা বানান বলি। গুরু জিজ্ঞাসেন, 'রাম' বানান কর।* শিষ্য বলে, র+আ+ম। গুরু বলেন, লেখ। বাঙ্গালী শিষ্য চিত্র করে,—রাম। হিন্দুস্থানী চিত্র করে,—**राम**, ইংরেজ করে,—Ram। যে এই চিত্র চেনে, সে দেখিবামাত্র শব্দ করে, রাম। অর্থাৎ রাম, **राम**, Ram,—একই শব্দের ত্রিবিধ চিত্র।

অতএব লেখা একপ্রকার সঙ্কেত ; এবং বানান করিয়া লেখা, ভাষার মূলধ্বনি-প্রকাশক অক্ষরের সংযোজনা।

যদি বানান অর্থে ভাষার শব্দের মূলধ্বনি-প্রদর্শন হয়, তাহা হইলে রাম—এই শব্দের বানান র-আ-ম, না, র-আ-ম্? আমরা—বাঙ্গালীরা সঙ্কেতটা জানি এবং অ-কারান্ত ম লিখিয়াও পড়ি হলন্ত ম। ওড়িয়া তেলুগু সঙ্কেত না পাইয়া পড়ে রাম (ম অকারান্ত)। তখন তাহাদের দোষ দিলেও দিতে পারি। বলিতে পারি, তাহারা নিজের নিজের ভাষার সঙ্কেত এবং বাঙ্গালা ভাষার সঙ্কেত অভিন্ন মনে করিল কেন? নাগরীতে **राम** লিখিলে, এবং তাহারা রাম্ পড়িলে পড়ার দোষ দিতে পারি না। কারণ নাগরীতে সংস্কৃত গ্রন্থ লেখা ও ছাপা হইয়া থাকে। সেখানে **राम** অক্ষর থাকিলে পড়িতে হয়, রাম্। কিন্তু, ইহার উত্তরে হিন্দুস্থানী ও মারাঠীও বলিতে পারে, সে কি? তাহারা লেখে **राम**, কিন্তু পড়ে রাম্।'

আর একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। মায়ের খেয়াল,—যদি লিখি, বাঙ্গালী সচ্ছন্দে পড়িবে,—মাএর্ খেআল্। কিন্তু, যে বাঙ্গালা সঙ্কেত না জানে, সে পড়িবে,—মাইএর খেইআল। (বাস্তবিক, পড়িয়া থাকে,—মাইএর খেইআল।) যদি শিখাইয়া দি-ই যে, য় টা কিছু নয়, এটা অ-আ আদি স্বরের বাহন, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা শেখার সুবিধা হইল না। সে গ্রাম্য লেখকের মতন—য়্যামি—লিখিয়া মনে করিবে—আমি—লিখিয়াছি।* অর্থাৎ এখানে তাহাকে আর এক সঙ্কেত শিখাইতে হইবে, এবং বলিতে হইবে, যে সব বাঙ্গালা শব্দের মূল সংস্কৃত, সে শব্দের বানান সংস্কৃতের যথাসাধ্য অনুরূপ করিতে হয়। কিন্তু, যখন সে ইহারও ব্যতিক্রম দেখাইয়া বলে, 'তবে বানান লেখেন না কেন?' তখন বাঙ্গালা-

---

* ইংরেজীতে thou লিখিয়া পড়িতে হয়,—দাও ; though লিখিয়া পড়িতে হয়,—দো। ইহাতেও লেখা শেষ হয় না। through লিখিয়া পড়িতে হয়—থ্রু।

শব্দের বানান তরীর হাইল * ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হয়, 'বাঙ্গালা ভাষা এত সোজা পেও (না, পেয়ো ?) না। আমরা যে শব্দ যেমন বানান করি, তোমাকেও তেমন বানান শিখিতে হইবে।'

কিন্তু, ইহাও সম্পূর্ণ উত্তর হইল না। কাকে কাকে লইয়া আমরা ? বাঙ্গালাভাষার যাবতীয় শব্দের বানান আমরা কি লিখিয়া দেখাইয়াছি ? আমরা কি ইচ্ছামত যা-তা বানান করি, না সূত্র মানিয়া করি ? সে সূত্র কি ?

এই সূত্র এক নয়, অনেক চলিতেছে। যথা,

(১) অনেক শব্দের বানান অবিকল সংস্কৃতের মতন।

(২) অনেক শব্দের বানান সংস্কৃতের নিকটবর্তী।

(৩) অনেক শব্দের বানান লেখকের ইচ্ছানুবর্তী।

দুই একটা দৃষ্টান্ত লই।

প্রমোদ উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতিবিরহে কাতরা যুবতী
অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে।

এখানে দেখা যাইতেছে, প্রমোদ উদ্যান প্রভৃতি অধিকাংশ শব্দ লিখনে অবিকল সংস্কৃত। কিন্তু, উচ্চারণে সংস্কৃত নয়। প্র-মো-দ লিখি বটে, কিন্তু, পড়ি প্রায় প্রো-মো-দ্; উদ্যান, পড়ি উদ্দান্; নন্দিনী, পড়ি নন্দিনি; অশ্রু, পড়ি অস্রু; ইত্যাদি। দা-ন-ব, বি-র-হ, যু-ব-তী প্রভৃতি কএকটি শব্দ লিখনেও সংস্কৃতের মতন নয়, সংস্কৃতের নিকটবর্তী। কারণ, সংস্কৃতে দা-ন-ব শব্দ নাই, দা-ন-ব্র শব্দ আছে। এইরূপ, যু-ব-তী শব্দ নাই, আছে য়ু-ব্র-তী। আঁখি শব্দ আমরা প্রায়ই এইরূপ লিখি; কিন্তু, কেহ আ-খি লিখিলে যে তাহাকে অজ্ঞ মনে করি, তা নয়।

এই তো তুলিনু
ফুলরাশি; চিকণিয়া গাঁথিনু স্বজনি
ফুলমালা।

'এই তো,' কেহ লেখেন 'তো, কেহ লেখেন ত। উপরে, নন্দিনী ঈকারান্ত পাইয়াছি, এখানে স্বজনি পাইতেছি ইকারান্ত। স্ব-জ-নি শব্দে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের বিধিও ঘটিয়াছে, নতুবা স্ব-জ-নী হইত। আমরা কিন্তু, সম্বোধনে স্বর হ্রস্ব না করিয়া দীর্ঘ করি। রা-শি শব্দ লিখনে ও উচ্চারণে অবিকল সংস্কৃত। কিন্তু, চি-ক-ণি-য়া, না, চি-ক-নি-য়া লিখিব ?

প্রথমে মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের উৎপত্তি অনুসারে বানান করা হয়। বাঙ্গালা ভাষার অনেক শব্দের মূল সংস্কৃত, পাই-টাক শব্দের মূল আর্বী ও ফার্সী, দুই দশটার মূল

* বলা বাহুল্য, শব্দটা 'হাল' বানান করিলে হাল আইনে চলিতে পারিত, কিন্তু এই মাত্র যে সূত্র পাইলাম, তাহা বিস্মৃত হইতে পারি না।

ইংরেজী ও অন্য ইয়ুরোপীয় ভাষা। অনেকে বলেন, সংস্কৃত-মূলক শব্দের বানান সংস্কৃতের তুল্য হইয়া থাকে; অতএব যখন বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দের মূল সংস্কৃতভাষা, তখন সংস্কৃত-কোষ দেখিয়া অনায়াসে সে সকল শব্দের বানান ঠিক লেখা যাইতে পারে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়।

যাঁহারা এই এক সূত্র ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা কাজ না লিখিয়া লেখেন কায, কারণ সংস্কৃত শব্দ কার্য বা কার্য্য; তাঁহারা সোনার কান না লিখিয়া লেখেন সোণার কাণ, কারণ সংস্কৃত শব্দে ণ আছে। যাহা হউক, যদি ইহাঁদের সূত্র ধরিতে হয়, তাহা হইলে শব্দ বানান করিবার পূর্বে শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে হইবে। চিকনিয়া, না চিকণিয়া?*

হয় ত কবি মনে করিয়াছিলেন, সং চিক্কণ হইতে চিকণ আসিয়াছে। ভারতচন্দ্রেও দেখিতেছি চিকণ; যথা, 'চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।' 'বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।' কিন্তু এই ণ ভারতচন্দ্রের, কি তাঁহার প্রকাশকের, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নাই থাক, হেমচন্দ্র-কোষে স্নিগ্ধে মসৃণ-চিক্কণে—অর্থাৎ চিক্কণ অর্থে স্নিগ্ধ—তৈলাদি স্নেহ-পদার্থ (যেন) লিপ্ত, কাজেই চকচকা (বা চকচকিয়া)। কিন্তু চিকণিয়া পদে সে অর্থ নাই, আছে যাবনিক চিকন শব্দের অর্থ-সাদৃশ্য। কাপড়ে সূচ দিয়া ফুল তোলাকে চিকন কাজ বলে। ইহা হইতে বাঙ্গালায় সরু বা সূক্ষ্ম অর্থে চিকণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

যদি বাঙ্গালা ভাষার যাবতীয় শব্দের মূল বিবেচনা করিয়া বানান করিতে হয়, তাহা হইলে পদে পদে শাব্দিকের কিংবা বাঙ্গালা ভাষার কোষের সাহায্য লইতে হইবে। ইংরেজী ভাষার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, ইংরেজী শব্দকোষ না থাকিলে লেখা চলে না। ইহাতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দুরূহ হইয়াছে।

যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে অবিকল লইয়াছি, সে সকল শব্দের বানান সংস্কৃত শব্দ-কোষে পাওয়া যায়। এইরূপ শব্দের বেলা বানানের সন্দেহ ঘটে না।† যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে পরিবর্তিত হইয়াছে, সে সকল শব্দের বানানে লেখক-সম্প্রদায় একমত নহেন। কেহ বলেন, উচ্চারণ যাহাই করি লিখনে মূল দেখাও; কেহ বলেন, ভাষার ধ্বনির নাম শব্দ, যদি ধ্বনি পরিবর্তন করি, তাহা হইলে ভাষাও পরিবর্তিত হইয়া যায়। পূর্ব-পক্ষ বলেন, ভাষার ধ্বনি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভিন্ন হয়, সুতরাং একটা স্থায়ী রূপ—সংস্কৃত রূপ—ধরিয়া ধ্বনিকে স্থায়ী কর। উত্তর-পক্ষ বলেন, স্থায়িত্ব আকাংক্ষা দুরাকাংক্ষা, ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া বর্তমান সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা কর। পূর্বপক্ষ বলেন, কায কাণ লেখ; উত্তরপক্ষ বলেন সর্ব-

---

* এখানে বাঙ্গালা ব্যাকরণের সূত্র আনিলাম না। ব্যাকরণ অনুসারে চিকণিয়া কিংবা চিকনিয়া পদ না হইয়া চিকণাইয়া কিংবা চিকনাইয়া, সংক্ষেপে চিকনিয়ে, হইত। কারণ চিকণ বা চিকন নাম ধাতু।

† একেবারে ঘটে না, এমন নয়। সংস্কৃত শব্দের বানানেও স্থলবিশেষে বিকল্প দেখা যায়। যথা, প্রতিকার প্রতীকার, ধরণি ধরণী, বল্লি বল্লী, কোশ কোষ, কৌশল্যা কৌসল্যা, বশিষ্ঠ বশিষ্ঠ বসিষ্ঠ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সেকালে এই এই রূপ ধ্বনি শোনা যাইত বলিয়া বানান এই এই রূপ হইত।

সাধারণে কাজ লেখে, কর্ণ-(কর্ণ) থাকিলে কাণ লিখিতাম, যখন রেফ গিয়াছে তখন ণ লেখা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ মাত্র, কাজ ও কান রূপ স্থায়ী কর। সংস্কৃত-ভাষী ণ ন বর্ণের উচ্চারণ এক করিতেন না। এইহেতু ণ স্থানে ন লিখিলে ভুল হইত। এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ অনেক দিন হইতে চলিতেছে। ফলে দেখিতেছি, দুই মত চলিতেছে, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার অসুবিধা হইতেছে।

ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঝ, অই ঐ, অউ ঔ, ং ঙ, য জ, ণ ন, শ স, ক খ, গ ঘ, চ ছ, জ ঝ, ট ঠ, ড ঢ, ত থ, দ ধ, ব ভ, বর্ণের একের স্থানে অন্যের প্রয়োগ হইতেছে। ইহাদের উপর স্বরবর্ণ স্থলে য় য়া য়ি য়ী য়ু য়ূ য়ে য়ৈ য়ো য়ৌ, এবং ঙ্গ স্থলে ঙ্, ঞ স্থলে ই আছে। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে র ড়, র ঢ় প্রভেদ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। চন্দ্রবিন্দু-প্রয়োগেও সকলে একমত নহেন। ঘটী ঘটি, দেশী দেশি, দিদী দিদি, রাঁধনী রাঁধনি, সঙ্গী সঙ্গি, আঙ্গী আই, ধুঁআঁ ধুঁয়া, তুলা তূলা, মুলা মূলা, বউ বউ, দুরবিন দূরবীণ খ্রিষ্টাব্দ খৃষ্টাব্দ, অই ঐ, খই খৈ, বউ বৌ, চউকী চৌকি (আসন, সং চতুষ্কী), সঙ্খ্যা সংখ্যা, পঙ্ক্তি পংক্তি, বাঙ্গালা বাঙ্গলা বাঙ্‌লা বাংলা, ভাঙ্গা ভাঙা, জো যো, জোগাড় যোগাড়, জায়গা যায়গা, নমুন নমুণ (সং নখ-রঞ্জনী), কার্বন কার্বণ, কান কাণ, শুধু সুধু, শারি সারি (সং শ্রেণী বা শ্রেণি), আখ আক, শুখান শুকান, মাছ মাচ, করেছে করেচে, মাঝ মাজ, কাঁঠাল কাঁটাল, হাথ হাত, ইত্যাদি বহুশব্দের বানানে কেহ সংস্কৃত মূলের সহিত কেহ ভাষার ধ্বনির সহিত মিলাইতে চেষ্টা করেন। কতকগুলির বানানে লেখকের ভ্রমের লক্ষণ পাওয়া যায়। খ্রিষ্ট ও খৃষ্ট যে এক ধ্বনি নহে, তাহা কেহ কেহ বুঝিতে পারেন না। ইংরেজী কার্বন শব্দের ন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে পড়িয়া কখন কখন ণ হইয়া যায়। কিন্তু, শব্দের মূল সংস্কৃত না হইলেও কি সংস্কৃতের বিধি মানিতে হইবে ?

সংস্কৃতভাষা হইতে প্রাপ্ত শব্দের বানান-নির্ণয়ে সংস্কৃত আদর্শ কতক রাখা যাইতে পারে। যদি সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট সংস্কৃত-প্রাকৃত না থাকিত, এবং সেই প্রাকৃতের প্রভাব বাঙ্গালা শব্দে না পড়িত, তাহা হইলে সংস্কৃতের আদর্শ অধিক রাখিতে পারা যাইত। বস্তুতঃ এই কারণে মস্তক হইতে মা-তা না হইয়া মা-থা, প্রস্তর হইতে পাতর না হইয়া পাথর, মধ্য হইতে মাঝ, অষ্টাদশ হইতে আঠার প্রভৃতি অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু, সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার সব নিয়ম বাঙ্গালা ভাষায় চলে নাই। হয় ত বাঙ্গালাভাষার পূর্বের অবস্থার বহু পরিবর্তন হইয়া বর্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। কোথায় সং স্বর্ণকার, কোথায় সেকরা ; কোথায় সং উচ্ছিষ্ট, কোথায় এঁঠা ; কোথায় সং পুঞ্জ, কোথায় ঝাঁক! এইরূপ বহু বহু শব্দে সংস্কৃতের চিহ্ন আবিষ্কার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক শব্দের শেষের স্বরবর্ণ কথাবার্তায় লুপ্ত হইয়াছে, কোথাও বা বিপ্রকৃষ্ট হইয়া পূর্বে গিয়াছে। রীতি-নীতি হইয়াছে রীত-নীত, অব্যূঢ় হইয়াছে অয়বূঢ়—আইবুড়া, হাতীশালা হইয়াছে হাইড়-শাল—হাইশাল—হেঁশেল (রাঢ়ে)। স্থল-বিশেষে লুপ্ত ইকারের চিহ্ন উচ্চারণে

নাই। কিন্তু, চারি হইয়াছে চাইর, গালি—গাইল, হারি—হাইর, আজিকালি—আইজ-কাইল, সাধু—সাইধ, দদ্রু—দাইদ। কিন্তু, মাঝের ই সম্পূর্ণই নাই, ঈষৎ ই হইয়াছে। লেখার পরিশ্রম বাঁচাইবার চেষ্টায় অনেকে ই টুকু দেন না, কিন্তু, না দিয়া বানান অশুদ্ধ করেন।

ইয়া উয়া তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু, বানানে বহু লেখক শব্দগুলিকে বিকৃত করিতেছেন। একে ইআ উআ না লিখিয়া ইয়া উয়া লিখিতেছি; তার উপর পাহাড়+ইয়া—পাহাড়িয়া, সংক্ষেপে করিতেছি পাহাড়ে; শান্তি-পুর+ইয়া—শান্তিপুরিয়া, সংক্ষেপে শান্তিপুরে; মোট+ইয়া—মোটিয়া, সংক্ষেপে মুটে লিখিতেছি। কিন্তু, পাহাড়ে শান্তিপুরে মুটে বানান না-ধ্বনির সহিত, না-ব্যুৎপত্তির সহিত মেলে। ধ্বনিতে শেষে য় স্পষ্ট বিদ্যমান। কিন্তু, লিখনে প্রায় সকলে লুপ্ত করিতেছেন। বর-কন্যা শব্দ বর-কনে লিখিতে দেখা গিয়াছে। বর-কন্যে লিখিলে বর-কোন্নে, মুট্যে লিখিলে মুট্টে পড়িবার আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কা আধুনিক। কারণ দেড় শত বৎসর পূর্বপর্যন্ত কর‍্যা রান্ধ্যা হাস্যা প্রভৃতি পদ লোকে সচ্ছন্দে কর‍্য়া, রান্ধ্‌য়া হাস্‌য়া পড়িত। অদ্যাপি পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে এইরূপ পদ আছে, এবং নব্য শিক্ষিত ব্যতীত সাধারণে সচ্ছন্দে ঠিক পড়িয়া যায়। কাশীরাম দাস তাহাঁর মহাভারতে পাইল স্থলে পাল্য, আইস্ স্থলে স্থলে আস্য লিখিয়া সেকালের পাঠকদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহে ফেলেন নাই। হইল, সংক্ষেপে কদাপি হল নহে; একারণে অনেকে লেখেন হ'ল। কিন্তু, এই যে মাঝে 'কমা' চিহ্ন, ইহা লুপ্ত ই জ্ঞাপন করিতে বসিয়াছে। হ'ল লেখায় ই লিখিলাম না বটে, কিন্তু, উচ্চারণ করিতে বলিলাম। অর্থাৎ যেমন হইল ছিল তেমন রাখিলাম, কেবল লিখনশ্রম কমাইয়া ই স্থানে 'কমা' বসাইলাম। দেড়শত বৎসরের পুরাতন পুথীতে হল্য পাই। দেখা যাইতেছে, য়-ফলার প্রকৃত উচ্চারণ করিলে আমরা কথাবার্তায় যেমন বলি, হল্য বানানে তেমন জানাইতেছি। সুতরাং হ'ল বানান অপেক্ষা হল্য বানান ঠিক বলিতে হইতেছে।

এই য়-ফলা এবং য়-বর্ণ লইয়া বাঙ্গালা ভাষা যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। পূর্বকালে য় অক্ষরের উচ্চারণ ছিল কখন ই, কখন এ, কখন অ, কখন অ্, (যেন হলন্ত অ)। অধুনা অ্-বৎ উচ্চারণ হওয়াতে অ্+আ=য়া, অ্+ই=য়ি, ইত্যাদি বানান বিনা বিসম্বাদে চলিতেছে। ভাই+এর ভায়ের, দুই+এর=দুয়ের, কত+এক=কঅ+এক=কয়+এক=কয়েক প্রভৃতি বানান শুদ্ধ হইতেছে কিনা, তাহার সন্দেহ মাত্রও উঠিতেছে না। সং করোতি হইতে প্রথমে হইল করোই; পরে ই থাকাতে পূর্ব-ব্যঞ্জন র অক্ষরে ো যোগ অনাবশ্যক হইল। দাঁড়াইল করই; এখন ই স্থানে য় আসিয়া শব্দটিকে করিল করয়। লিখনে করয়; কিন্তু, পঠনে রহিল করএ। পরে র হলন্ত হইয়া কর্‌এ বা করে করিয়া ছাড়িল। জল+উয়া=জলুয়া, মদ+উয়া=মদুয়া। সংক্ষেপে জলো, মদো লিখিলে শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ পাই না। যদি জল্বো মদ্বো লিখি, অমনি বিদ্বান-কে বিদ্দান বলার ন্যায় জল্লো, মদ্দো পড়িবার আশঙ্কা ঘটে। যাহা জলবৎ—তাহা জলুয়া। উয়া-র মূলে যে ব ছিল, তাহা উচ্চারণে এখনও লুপ্ত হয় নাই।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা ব অক্ষর বিসর্জন করিয়া সবদিক সামলাইতে পারে নাই। আসামী এই ব রাখিয়াছে। য় বিসর্জনে যে বিপত্তি, ব বিসর্জনেও সেইরূপ বিপত্তি ঘটিয়াছে। জলুয়া—জোলো, মদুয়া—মোদো লিখিলে উচ্চারণ প্রায় আসে, এবং সেই কারণে বনুয়া—বোনো—বুনো হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল শব্দ জল মদ বন আর স্বাভাবিক রূপে থাকে না। 'কেমন করে এমন ছেলে মা হয়ে বনে পাঠালে'—করে কিংবা ক'রে লিখিলে বানান অশুদ্ধ হয়। কেননা, ক'রে=কইরে। ঢাকায় গ্রাম্যজন বলে কইর্‌যা, অর্থাৎ কর্‌যা পদের য় স্থানে ই হইয়া বিপ্রকৃষ্ট হইয়াছে। কর্‌যা পদ আর কিছু নয়, করি+আ। করি খাই প্রভৃতি প্রাচীন রূপ। আধুনিক পদ্যে এইরূপ এখনও চলিত আছে। আসামী ও ওড়িয়াতে গদ্যে পদ্যে কথায় এইরূপ চলিতেছে। হিন্দীতে শেষের ই লুপ্ত হইয়া কর্‌ খা দাঁড়াইয়াছে। আমরা করি সঙ্গে আ জুড়িয়া পড়ি করি-আ, লিখি করি-য়া, বলি কর্যো! কর্যো—পদ 'কোরে' লিখিলে পাহাড়ে শান্তিপুরে মুটে প্রভৃতির তুল্য অশুদ্ধ হয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভাষার যাবতীয় শব্দ শুদ্ধ ভাবে লিখিয়া জানাইবার আশা দুরাশা। এই দেখুন অ অক্ষরের অ অ্‌ ও্‌ ০ (শূন্য) উচ্চারণ আছে। ধন, জন, যৌবন অকারান্ত ন লিখিলেও পড়িতে হয় হলন্ত; কিন্তু ধ জ ব যেমন অকারান্ত লিখি, তেমন অকারান্ত পড়ি। কেহ কেহ বলে, ধোন জোন যৌবোন। এই প্রকার উচ্চারণ গ্রাম্য বটে, কিন্তু হরি শব্দের হ ঈষৎ ওকারান্ত না করিলে বাঙ্গালা ধ্বনি থাকে না। ধন-জন-যৌবন-গর্বিত এখানে ন ও ত অকারান্ত পড়িতে হয়, নচেৎ বাঙ্গালা ভাষার প্রাণ বিনষ্ট হয়। ঘর-করনা, শব্দ যদিও ঘর-কর্ণা—ঘরকন্না বলা যায়, তথাপি ঘর্কর্ণা নহে; র-তে ঈষৎ অ উচ্চারিত হয়। ভাষার এই প্রকার কত যে স্বরের পরিবর্তন ঘটে, সে সব লিখিয়া জানাইতে পারা যায় না। 'আজ কাল' লিখিয়া পড়িতে হইবে, আইজ্‌ কাইল্‌ 'কেমন ক'রে ব'লবে' লিখিয়া পড়িতে হইবে, যেমন আমরা পড়ি! এই অনিয়মে ভাষা স্থির হইতে পারিতেছে না।

একথা সত্য, ভাষার যাবতীয় স্বর জানাইবার অক্ষর করা দুঃসাধ্য না হইলেও কার্যতঃ নিষ্ফল। কারণ স্বরাক্ষরের পরিচয় করিতে হইবে, এবং তখন পরিচয়-শ্রম দেখিয়া স্বরাক্ষরহ্রাসের কল্পনাও আসিবে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ১৩।১৪টা স্বরবর্ণ গণা যায় বটে, কিন্তু উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত অনুনাসিক স্বরভেদ ১৩০ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার ১৩০ স্বর থাকিলেও যেমন অল্প কএকটা দ্বারা লিখন সম্পন্ন হয়, বাঙ্গালাতেও সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কথা এই, পাথরে, মুটে, কনে, করে, জলো, মদো, কিংবা চাল ডাল চার পাল প্রভৃতি লেখা চলে কি?

বিরামাদির ইংরেজী চিহ্নও পাঠককে সময়ে সময়ে ফাঁপরে ফেলে। ইংরেজীতে (!) চিহ্ন আশ্চর্যবোধক। কিন্তু বাঙ্গালাতে অনেকে মহাশয়! লিখিয়া কি জানাইতে চাহেন, জানি না। এক চিহ্নের দুই অর্থ রাখিলে বিড়ম্বনা হয়। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালার বিসর্গ চিহ্ন ঃ,

ইংরেজী 'কোলোন' চিহ্নের মতন। লেখক কি মুদ্রাকর কে লেখেন জানিনা, কিন্তু দেখিতে পাই, কথাটা এই ঃ—। এখানে 'কোলোন' চিহ্নের প্রয়োজন দেখি না, বিশেষতঃ বিসর্গ বসাইবার হেতু আদৌ নাই।

বহুস্থলে মুদ্রাকর লেখকের লেখায় নিজের সৌন্দর্যজ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে সমাস আছে, তাহা না ভাবিয়া শব্দ যোজনায় শব্দ গুলাকে এমন পৃথক বসাইয়া যা'ন যে অর্থ বোধে বিঘ্ন ঘটে। "রাম রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অ প্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন ও অপত্য নির্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।" যেহেতু ইংরেজীতে শব্দ পৃথক পৃথক লেখা ও ছাপা হয়, বাঙ্গালাতেও সমাসবদ্ধ শব্দ পৃথক ছাপা কর্তব্য কি? যখন ইংরেজীর হাইফেন-চিহ্ন বাঙ্গালাভাষায় সচ্ছন্দে চলিতেছে, তখন তাহার প্রয়োগ করিয়া সমাস দেখাইয়া দেওয়া কর্তব্য।

৬। বাঙ্গালা শব্দের য়।*

বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে। অনেক সংস্কৃত শব্দ লিখনে সংস্কৃত, পঠনে ও কথনে বাঙ্গালা হইয়াছে। অনেক সংস্কৃত শব্দ কথনে বিকৃত হইয়া লিখনেও বিকৃত হইয়াছে। এখানে বাঙ্গালার য় বর্ণের উচ্চারণ এবং আগমন আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমে সংস্কৃত শব্দের য়-এর বাঙ্গালা উচ্চারণ স্মরণ করিলে দেখা যায়, য় অক্ষরের উচ্চারণ কোথাও য (জ), কোথাও য় (প্রায় অ্) হয়। শব্দের আদিস্থিত য় উচ্চারণে জ হয়। য়থা—জথা, য়দি—জদি, য়োগ—জোগ। অন্যত্র প্রায়ই স্বরবর্ণতুল্য উচ্চারিত হয়। যথা, নিয়ত—নিঅত, প্রায়—প্রাঅ্, নিয়োগ—নিওগ। য় সংস্কৃতে ই+অ বা ইঅ। অর্থাৎ দুই স্বরসংযোগে য়কার। নিয়ত শব্দে য় বর্ণের পূর্বে ই স্বর থাকাতে অল্প চেষ্টায় শব্দটির সংস্কৃত উচ্চারণ আসে। এইরূপ প্রিয়, আত্মীয়, বিয়োগ ইত্যাদি শব্দের। বায়ু শব্দের উচ্চারণও ঠিক আছে, যদিও গ্রাম্যজন করে বাউ। বায়ু শব্দের উ লোপে পদ্যে বায়, এবং অপভ্রষ্ট হইয়া বাই (যেমন বাই-রোগ)। আয়ু শব্দও এইরূপে আই, এবং পরমায়ু শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ পরমাই, প্রমাই হইয়াছে। সং আর্য্যিকা হইতে আয়ী, অনেকে লেখেন আই। প্রাচীন বাঙ্গালায় মাতা অর্থে আই শব্দ পাই, এবং আসামীতে অদ্যাপি এই অর্থে আই শব্দ চলিত আছে। অন্যদিকে, সং আর্য্যক শব্দ হইতে আজা বঙ্গের স্থানে স্থানে এবং ওড়িশায় চলিত আছে। এখানে একই সং শব্দের বাঙ্গালা রূপান্তরে য় এবং জ পাইতেছি। এইরূপ, প্রয়োগ শব্দে য়, কিন্তু, সংযোগ শব্দে জ হইয়াছে।

সংযুক্ত য় অধিকাংশ শব্দে ইঅ, কয়েকটা শব্দে জ উচ্চারিত হয়। বাক্য—বাক্ইঅ এরূপ উচ্চারিত না হইয়া বা'ক্ক হয়। অর্থাৎ ইঅ পৃথক হইয়া ই পূর্বে যায়, শেষের অকার

* প্রবাসী—১৩১৭ সাল, ফাল্গুন।

জানাইতে গিয়া ক দ্বিত্ব হইয়া পড়ে। এইরূপ, সত্য—সত্ত, পদ্য—পদ্দ। ব্যঞ্জনে ই যুক্ত হইয়া থাকি, সত্তি। এইরূপ দিব্য—দিব্বি, পথ্য—পথ্থি, সাক্ষ্য—সাক্‌খি। যজ্ঞ হইতে জগগি, কারণ জ্ঞ বাঙ্গালায় গ্যঁ হইয়াছে। এ সকল উদাহরণে ইঅ-এর অকার ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব করিয়াছে। পরে ই থাকিলে পূর্ব্ববর্তী অ প্রায়ই ঈষৎ ওকার হয়। এই হেতু অনেকে 'সত্য' উচ্চারণ করে সোত্ত, পদ্য—পোদ্দ। সত্ত, পদ্দ উচ্চারণ অবশ্য মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

কয়েকটা শব্দে য-ফলার য, উচ্চারণে জ হয়। বিদ্যুৎ—বিদ্দ্যুৎ, উদ্যম—উদ্দম; কিন্তু উদ্যোগ—উদ্‌জোগ, উদ্যাপন—উদ্‌জাপন, সূর্য—সূর্জ। যোগ শব্দ প্রায়ই জোগ থাকিয়া যায়। উদ্‌-জোগ, অভিজোগ, অনুজোগ, সংজোগ, বিজোগ (কেহ কেহ বিয়োগ); কিন্তু নিয়োগ, প্রয়োগ। নিয়োগ—কিন্তু নিজুক্ত, প্রয়োগ কিন্তু প্রজুক্ত। এইরূপ, কোথায় য কোথায় জ, তাহা বলা দুষ্কর। (য স্থানে জ উচ্চারণের কারণ এবং য বর্ণাদির উচ্চারণ-সূত্র শব্দশিক্ষাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত রীতিতে বানান করা হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ইহার বহু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। সংস্কৃতে জ য য় তিন বর্ণ কিংবা তিন বর্ণের তিন অক্ষর নাই। আছে জ য়। সংস্কৃতে ব ব দুই বর্ণ এবং দুই অক্ষর আছে। বাঙ্গালায় আছে কেবল ব। সংস্কৃতে ড় ঢ় বর্ণ নাই, বাঙ্গালায় আছে। সংস্কৃতে অকারের দীর্ঘ আকার, বাঙ্গালায় অকার আকার দুই পৃথক স্বর। এইরূপ আর দুই এক বিষয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পৃথক হইয়াছে। তথাপি কেহ কেহ সংস্কৃত হইতে অপভ্রষ্ট শব্দেও সংস্কৃত বর্ণবিন্যাস রাখিতে চান!

সংস্কৃত শব্দের ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে বাঙ্গালায় লুপ্ত বর্ণের স্থানে য় আসে। সং গোপালক—গোআলা—গোয়ালা, সং খদির—খইর—খয়র, সং শৃগাল—শিআল—শিয়াল, সং কৃত্বা—করিআ—করিয়া। ই স্থানে য়, এবং য় স্থানে ই এ আসিয়াছে। সং করোতি পদের প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ করোই। পরে, করয়—করএ বা করয়ে—কর্‌এ—করে। সং সাগর—সায়র, অনেকে বলে সাএর। এইরূপ, সং কায়স্থ—কায়থ—কাএত। উপরের দৃষ্টান্তের সাদৃশ্যে, কত+এক=কঅ+এক=কয়+এক=কয়েক। প্রাচীন বাঙ্গালা করিহ—করিঅ—করিও। কেহ কেহ লেখেন করিয়ো, আসামীতে লেখা হয় করিয়ো। সং মাতৃ হইতে মাই; মাই+এর=মায়ের। এইরূপ, ভাইএর=ভায়ের, দুইএর—দুয়ের।

এ সকল স্থলে বানানের নিয়ম পাওয়া যায়, এবং সে নিয়ম উচ্চারণে বাধা দেয় না। ইয়া উয়া তদ্ধিত-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দে ইয়া উয়া লিখিলে বানান ও উচ্চারণ ঠিক থাকে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত রূপ লিখিবার সময় ফাঁপরে পড়িতে হয়। মাই+ইয়া (বা মা+ইয়া)=মাইয়া (মাতৃজাতি-সম্বন্ধীয় বা মাতৃতুল্য)। সংক্ষেপে প্রাচীন বানান মায়া, বঙ্গের স্থানে স্থানে অদ্যাপি এই উচ্চারণ আছে। কিন্তু রাঢ়ে হইয়াছে মেয়ে। এইরূপ, ভাই-তুল্য—ভাইয়া—

ভায়া। ইহার রূপান্তরে ভাইয়ে—ভেয়ে। এইরূপ, বালিয়া—বেলে, কাঠিয়া—কেঠে, চীনিয়া (চীন দেশীয়)—চীনে, ধর্মিয়া—ধর্মে, পাহাড়িয়া—পাহাড়ে, শান্তিপুরিয়া—শান্তিপুরে ইত্যাদি বানান বিচার্য। এইরূপ, করিয়া—করে, হাসিয়া—হেসে, যাইয়া—যেয়ে, লিখিয়া—লিখে, শুনিয়া—শুনে ইত্যাদি বানানও বিচার্য। মেয়ে যেয়ে প্রভৃতি শব্দের বিকারের নিয়ম এই। শব্দটি এক কিংবা দুই অক্ষরের হইলে এবং প্রথম অক্ষরে আ থাকিলে ইয়া যোগের পর আ স্থানে এ, এবং ইয়া স্থানে এ হয়। ইয়া স্থানে বস্তুতঃ য়ে কিংবা ্যে হয়। হেসে, বস্তুতঃ হেস্যে। এইরূপ, বেল্যে, পাহাড়্যে, ধর্ম্যে, শান্তিপুর্যে, চীন্যে। এই প্রকার বানান উচ্চারণের কাছে কাছে যায়। য়-ফলা লোপ করিলে অর্থ-গ্রহণে বিঘ্ন হয়। শান্তি-পুরে শান্তিপুর্যে কাপড় হয়, ধর্মে ধর্ম্যের স্থিতি, বেল্যে পাথরে রুটি বেলে না, পাহাড়ে পাহাড়্যে সাপ বেড়ায়, চীনে চীন্যে বেণী কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইত্যাদি বানান ভাল বোধ হয়। শুনে হেসে চলে গেল—না, শুন্যে হেস্যে চল্যে গেল? কেহ কেহ করিতেছেন, শু'নে হে'সে চ'লে গেল। কিন্তু উহাকে পড়িতে হয় শুইনে হেইসে চইলে গেল। অর্থাৎ শেষের য়-ফলা ই করিয়া পূর্বে আনিতে হয়। তিন অক্ষরের শব্দে এ নিয়ম চলে না। পাহাড়িয়া শব্দ পাহাড়ে লিখিলে চলে না, পাহা'ড়ে লিখিলেও চলে না; কারণ উচ্চারণের ধার দিয়াও গেল না। মুখ সামলে কথা কহে, কাদা হাতড়ে মাছ ধরে, ইত্যাদি উদাহরণে সামলে হাতড়ে বানান ঠিক হইল কি? এখানে সাম'লে, হাত'ড়ে চলে না। কেহ কেহ এই অসুবিধা দেখিয়া কিংবা না ভাবিয়া পাথরিয়া কাঠরিয়া সাপড়িয়া প্রভৃতি শব্দ পাথুরে, কাঠুরে, সাপুড়ে লেখেন। এইরূপ, শান্তিপুরিয়া স্থলে শান্তিপুরী, চীনিয়া স্থলে চীনা লেখেন। এইরূপ, হলুদিয়া—হলুদা, বেগুনিয়া—বেগুনা ইত্যাদি লেখা চলে, কিন্তু তদ্দ্বারা ভাষার অসম্পূর্ণতা দূর হয় না।

প্রাচীন পুথীর বানান দেখিলে য়-ফলা দেওয়া ভাষার নিয়ম পাওয়া যায়। বার-মাসিয়া শব্দ বারমাস্যা আকারে অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। এইরূপ অন্য বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন হইতে বিচ্ছেদ-ঘটনা যুক্তি-যুক্ত নহে। বাস্তবিক সকলদিক বিবেচনা করিলে বাঙ্গালা ভাষায় য়-ফলার প্রকৃত উচ্চারণ আনা আবশ্যক বোধ হইবে।

কয়েকটি শব্দে য় আগম হইয়াছে। মলা হইতে ময়লা, কলা (কালা) হইতে কয়লা, শির হইতে শিয়র। ময়লা উচ্চারণে মঅ্লা, কিন্তু শিয়র—শিঅর। এক অক্ষরের দুই তিন প্রকার উচ্চারণ ভাল হইতে পারে না। বাঙ্গালা-ভাষা শব্দের মধ্যে শুধু স্বরাক্ষর বসাইতে যেন কুণ্ঠিত। সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষা এমন ছিল না। ওড়িয়া ভাষা সংস্কৃত-প্রাকৃতের নিয়ম রক্ষা করিয়া শব্দের মধ্যে শেষে স্বরাক্ষর লিখিয়া আসিতেছে। সং নগর হইতে ওড়িয়া নঅর। বাঙ্গালায় লিখিতে হইলে অনেকে লিখিবেন নয়র। কিন্তু কোথায় নঅর আর কোথায় নয়র। 'ওড়িয়া' শব্দটির ওড়িয়া বানান ওড়িআ। অর্থাৎ ইয়া উয়া না লিখিয়া লেখা হয় ইআ উআ। হিন্দী ও আসামী-তে ইয়া লেখে, কিন্তু উয়া না লিখিয়া লেখে উৱা কিংবা ওৱা। ৱ অক্ষর থাকিলে পাওয়া খাওয়া জলুয়া প্রভৃতি সচ্ছন্দে পাৱা খাৱা জলৱা লেখা চলিত।

কেহ কেহ হিন্দী ভাষাকে ভারত-ভাষা করিতে অভিলাষী। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হউক না হউক, বাঙ্গালা ওড়িয়া আসামী হিন্দী ভাষার সাধারণ শব্দসম্পত্তির বানানে ঐক্য ঘটিলে অনেক লাভ। য়-ফলা ও ব-ফলার প্রকৃত উচ্চারণ হিন্দী ওড়িয়াতে আছে; আসামীতে ব যেমন আছে, য় তেমন নাই। মরাঠী ও যাবতীয় দ্রাবিড়ী ভাষায় ঠিক আছে। নাই কেবল বাঙ্গালা ভাষায়।

বস্তুতঃ শব্দের উচ্চারণ-বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা নিকৃষ্ট, এবং ইহা দেখিয়া ভারতের অন্যান্য ভাষী বাঙ্গালীকে উপহাস করে। বাঙ্গালীর মধ্যে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত আছেন, অথচ উচ্চারণ-বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন কেন, একথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। সংস্কৃতমূলক যাবতীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা অধিক সংস্কৃতমুখী, অথচ উচ্চারণে অযোগ্য। সময়ে সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিত বাঙ্গালাকে আরও সংস্কৃত দেখিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ভুলিয়া যান, ধ্বনিতে ভাষা, দ্যোতকে নহে। উচ্চারণের প্রতি মন দিলে বানান আপনি আসিবে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বানান ঠিক, না জানুআরি ফেব্রুআরি ঠিক? এখানে শব্দের ধ্বনি প্রধান। কারণ ভাষায় শব্দ নূতন প্রবেশ করিতেছে। বহুয়ারী ঝিয়ারী বানান এখন পরিবর্তন করিতে পারা যায় না। কারণ এই বানানের সহিত পুরাতনের যোগ আছে। এইরূপ, মেনেজার, কেষিআর বানান ঠিক, না ম্যানেজার ক্যাশিয়ার ঠিক? পুরাতনের সাদৃশ্যে অনেক নূতন শব্দের বানান করা হইয়া থাকে। তথাপি শব্দটা কি, এবং বাঙ্গালা উচ্চারণে ধ্বনি কি, এবং কি কি অক্ষরযোগে সে ধ্বনি ঠিক প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। লেখা ধ্বনিকে স্থায়ী করে, একথা লেখককুল বিস্মৃত হইলে ভাষা রক্ষা করিবে কে?

৭। বাঙ্গালা শব্দের ড়। *

বহু বাঙ্গালা শব্দে ড় আছে। ওড়িয়া ও হিন্দী ভাষার শব্দেও আছে। এই সব ভাষা সংস্কৃত ভাষার রূপান্তর। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে ড় পাই না। মরাঠী ভাষাও সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। তাহাতেও ড় নাই।

সংস্কৃত বর্ণমালায় ট ঠ ড ঢ ণ। বাঙ্গালা বর্ণমালায় ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ। ট-বর্গে পাঁচ বর্ণ স্থানে সাতটা বর্ণ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর-মহাশয় ব্যঞ্জন বর্ণের শেষে ড় ঢ় য় এই তিন বর্ণ বসাইয়াছিলেন। গ্রামে পাঠশালায় শৈশবে আমরা এই তিন বর্ণ শিখি নাই। ওড়িয়া পাঠশালাতেও অদ্যাপি শেখানা হয় না। তখন জানিতাম ক হইতে ক্ষ ব্যঞ্জন বর্ণ। বিদ্যাসাগর-মহাশয় ড় ঢ় য় বর্ণত্রয়কে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়াছিলেন। পাঠশালার গুরু-মশায় এই তিন বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

শুধু এই তিন বর্ণের দশা হেয় ছিল না। গুরু-মশায় শিখাইতেন হক্ষ, বিদ্যাসাগর-মহাশয়

* গৌহাটী সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত ও ১৩১৮ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

ক্ষ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ক্ষ একটা স্বতন্ত্র বর্ণ কি না, কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বিচার হইয়া গিয়াছে। ডিগ্রি-ডিস্‌মিস কোন্ পক্ষ পাইয়াছেন, তাহা স্মরণ হইতেছে না। ক্ষ বর্ণের ভাগ্য বরং ভাল, বিচারে উঠিয়াছিল। জ্ঞ ঙ্ক হ্য—এই তিন অক্ষরের ভাগ্য মন্দ। কেহ জিজ্ঞাসে না, এই তিন অক্ষর ব্যঞ্জনাক্ষরের পঙ্‌ক্তিতে বসিবে কি না। মরাঠী জ্ঞ অক্ষরের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষ অক্ষরের পরে জ্ঞ অক্ষরের স্থান করিয়াছেন। কারণ, জ্ঞ অক্ষরের ধ্বনি মরাঠীতে জ্‌ঞ না থাকিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে। আমরা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির মতন আছে, এবং বাঙ্গালা ভাষা আর কিছু নয় সংস্কৃত ভাষার যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তর! বঙ্গীয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ দেখিয়া ক্ষ-বর্ণের ভাগ্যপরীক্ষা করিতে বসিয়াছিলেন! বাঙ্গালায় ক্ষ অক্ষরের উচ্চারণ খিঅ বা খেঅ। এই হেতু সং ক্ষুধা বাঙ্গালায় হইয়াছে খিউধা—খিধা, সং ক্ষমা বাঙ্গালা উচ্চারণে খেমা, সং ক্ষণে—খেনে, ইত্যাদি।*

মানুষ অল্প-জ্ঞান, অল্প-ধৈর্য্য। নিজের সুবিধা-মতন শৃঙ্খলা না পাইলে অতিচার, ব্যভিচার-আদি নিজের রচিত শব্দের অন্তরালে আশ্রয় লইতে চায়। বিধাতা বিধিবাহ্য কিছুই করেন না। তিনি তাঁহার সংসারে প্লুতগতির স্থান রাখেন নাই, সৃষ্টিরূপ উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশ্য করিয়াছেন। এই গূঢ়তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া লোকে দিশাহারা হইয়া পড়ে। তাহারা একটী একটী গণিয়া সংসার অংশাংশি করিয়া লইতে চায়, ক্রমশঃ কত হইয়াছে, কত হইবে, তাহা কল্পনা করিতে পারে না।

বাঙ্গালা শব্দের ড় ঢ় এইরূপ ক্রমশঃ প্রকাশিত বর্ণ। য় স্থানে য (উচ্চারণ জ) পরে আসিয়াছে। জ্ঞ ঙ্ক হ্য অক্ষরের সংস্কৃত বিধি-বাহ্য উচ্চারণ হঠাৎ আসে নাই।

ট-ধ্বনির সহিত হ মিশিলে ঠ-ধ্বনি হয়, ড-ধ্বনির সহিত হ মিশিলে ঢ-ধ্বনি হয়। ড় ধ্বনিতে ল আছে, যেন উহা লড়। বঙ্গের বহুলোকে ড় ধ্বনি শোনে র। এইহেতু ড় স্থানে র, এবং র স্থানে ড় প্রয়োগ করে। কানে প্রভেদ না পাওয়াতে জিহ্বা সে প্রভেদ প্রকাশ করিতে পারে না। কেহ কেহ ড় র ধ্বনির প্রভেদ বুঝিতে পারে, কিন্তু জিহ্বা সে প্রভেদ ব্যক্ত করিতে পারে না। এই হেতু লিখিবার সময় ড় আসে, বলিবার সময় আসে না। গীতজ্ঞ জানেন প্রথমে সুরের সূক্ষ্ম প্রভেদ শুনিতে শিখিতে হয়, তার পর কণ্ঠের ক্ষমতা আনিতে হয়। কাহার পক্ষে কান দুর্বল, কাহার পক্ষে কণ্ঠ দুর্বল, তাহার নিরূপণ দুঃসাধ্য। অনুমান হয়, অধিকাংশের পক্ষে কান দুর্বল। লোকে কালা হইলে বোবা হয়, কিন্তু বোবা হইলেই কালা হয় না। চোখে প্রভেদ দেখিতে না পারিলে চিত্রকর সে প্রভেদ চিত্রে দেখাইতে পারে না।

আমরা ন ও ণকার এক করিয়াছি। হিন্দীভাষীও করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণভারতের

---

* অর্বাদিগের মধ্যে ক্ষ অক্ষরের উচ্চারণ খ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অপর অক্ষরেরও উচ্চারণবিকার ঘটিয়েছে।

পূর্ব প্রান্তে ওড়িয়া, পশ্চিম প্রান্তে মরাঠী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দেশের ভাষায় ন ও ণকারের প্রভেদ আছে। বাঙ্গালীর উচ্চারিত ণকারের সহিত ড় মিশিলে যেমন ড়ঁ মতন শোনায়, দাক্ষিণাত্যবাসীর মুখে তেমন শুনি। একটু সূক্ষ্ম ভেদ আছে তাহাতে ণ কোমল হয়। তেলুগু এ উচ্চারণ করে যেন ণি (ড়িঁ)। বোধ হয়, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ণ উচ্চারণ করিতে পারিত। বোধ হয়, ফারসী ভাষার প্রভাবে ণ উচ্চারণ বিস্মৃত হইয়াছে। রাজ্ঞী স্থানে যে রা-ণী হইয়াছে, তাহার কারণ পূর্বকালে ছিল, এখন নাই। সেই পূর্বকালের কারণে আমরা বিষ্ণু শব্দ উচ্চারণ করি বিষ্টুঁ। নব্যযুবকেরা করিতেছে বিষ্নু। হিন্দীভাষী করে ৱিসুন্থ। বিষ্নু, ৱিসুন্থ যে ভুল উচ্চারণ, তাহা স্মরণ করে না। বিষ্নু অপেক্ষা বিষ্টুঁ যে অনেক ভাল, অর্থাৎ পূর্বকালের উচ্চারণের নিকটবর্ত্তী, তাহা ভুলিয়া যাইতেছে। বিষ্টুঁ অপেক্ষা বিষ্ড়ুঁ আরও নিকটবর্ত্তী। (অবশ্য ৱি কোমল, বি কর্কশ)।

আর এক ধ্বনি আছে, তাহাতে না ল, না ড়, অথচ দুইই আছে। ড় ণ অপেক্ষা এই ধ্বনি বাঙ্গালীর মুখে দুরুচ্চার্য। বাঙ্গালা ভাষা হইতে এই ধ্বনি লুপ্ত হইয়াছে, হিন্দী ভাষা হইতেও হইয়াছে। এ বিষয়েও ওড়িশা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণাপথ পৃথক হইয়াছে। ধ্বনি গিয়াছে, বাঙ্গালা হিন্দী হইতে এই বর্ণ-জ্ঞাপনের অক্ষর পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। ধ্বনি গেলে ধ্বনি-প্রকাশের দ্যোতক বা অক্ষর অনাবশ্যক হয়। (বাঙ্গালা হিন্দীতে য অক্ষর অনাবশ্যক হইয়াও আছে। ইহার কারণ, এই এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের লিখনে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ।)

প্রায় একশত বৎসর পুর্বে প্রবোধচন্দ্রিকা-কর্তা মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যালঙ্কার লিখিয়াছিলেন, "বর্ণ শব্দে স্বর, হল্, বিসর্গ ও অনুস্বারকে কহে। অকারাদি ষোড়শ বর্ণকে স্বর শব্দে কহে। ককারাদি ক্ষকারান্ত চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণকে হল্ ও ব্যঞ্জন ও হস্ শব্দে কহে। এ সমুদায়ে বর্ণ পঞ্চাশৎ। হ-কারের পর ক্ষ-কারের পূর্ব্বে আর এক লকার হয়, এমতে অক্ষর সমুদায় এক-পঞ্চাশৎ। অকারাদি ষোড়শ স্বরের মধ্যে অকারাদি ঔকার পর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ বর্ণ, সেই স্বর। অং অঃ এই দুই বর্ণ অনুস্বার ও বিসর্গ। এ দুয়ের যে নামান্তর যথাক্রমে বিন্দু ও বিসর্জনীয়। * * অনুস্বার-বিসর্গ স্বাতন্ত্র্যে থাকিতে পারে না। অতএব এই দুই অক্ষর স্বরধর্ম্মী। বর্ণ পাঠেতে এই দুই বর্ণের অকার সহিত পাঠের বীজ এই।" এই গণনা হইতে জানিতেছি, একশত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ড় ঢ় য় বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। য র ল ব শ ষ স হ ল ক্ষ এই শেষের ল ক্ষ তখনও পণ্ডিতগণ স্বতন্ত্র বর্ণ স্বীকার করিতেছিলেন।

হ ল ক্ষ এই ল বাস্তবিক লকার নহে। বাঙ্গালা ছাপাখানায় এই অক্ষর নাই। বঙ্গদেশের ও আর্যাবর্তের নাগরী অক্ষর-মালার মধ্যেও এই ল অক্ষর নাই। ওড়িয়া তেলুগু মরাঠী প্রভৃতি ভাষার অক্ষরে এই ল আছে। এই ল এর মূর্তিতে ল ড, এই দুই অক্ষরের মূর্তি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই ল কে ল্ড (লড) বলা যাউক। ফল, জল, বালক, গোপাল প্রভৃতি

শব্দের ল ওড়িয়াতে ळ; মরাঠীতে ফল শব্দে ळ, জল শব্দে ল, বালক ও গোপাল শব্দে বিকল্পে ল ও ळ হয়।

ডকারের সদৃশ ধ্বনি বা বর্ণ তবে এই,—ড ড় ণ ळ র ল। বাঙ্গালায় ড ড় র ল, এই চারি বর্ণ আছে। হিন্দীতেও তাই। মরাঠীতে ড ণ ळ র ল, এই পাঁচ; ওড়িয়াতে ড ড় ণ ळ র ল, এই ছয় আছে। আসামীতে ড় নাই বলিলে বলা যায়। তাহাতে ড র ল, এই তিন বর্ণ আছে।

এক এক জাতি এক এক বর্ণের সূক্ষ্ম ভেদ করিয়া নানাবর্ণের উৎপত্তি করিয়াছে। ফারসী ও আরবী একত্রে ধরিলে আ দুই রকম, ক দুই রকম, গ দুই রকম, স জ চারি চারি রকম আছে। উর্দুতে আরবী ও ফারসী শব্দ আছে। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ যেমন বিকৃত হইয়াছে, বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট উর্দু শব্দের উচ্চারণ তেমন হইয়াছে। কর্ণের আংশিক বধিরতা ও বাগ্‌যন্ত্রের শিথিলতা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচ্য নহে। ফল কি হইয়াছে, তাহা আলোচ্য।

ভাষা চেষ্টা করিয়া লিখিতে হয়, মাতৃভাষাও শিখিতে হয়, আপনা-আপনি শেখা হয় না। পাঠশালার গুরু-মশায় ক খ শিখাইবার সময় শিষ্যকে বর্ণের ধ্বনি অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া শিখাইলে উচ্চারণ বিকৃত হয় না। গুরু-মশায়ের অমনোযোগিতায় বাঙ্গালী বালকবালিকা গুরুবর্ণ উচ্চারণ ভুলিয়া যাইতেছে। সং হস্ত হস্তী বাং হাথ হাথী গত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে হাত হাতী হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ, সং কুঠার বাং কুড়ার, কুড়ালি; সং ঘট ধাতু বাং গড় ধাতু; সং বেষ্ট ধাতু বাং বেড় ধাতু; সং পঠ ধাতু বাং পড় ধাতু ছিল।

বেদের সংস্কৃতে ড় নাই, আছে ড ळ র ল ণ। তারপর ভারতের একস্থানে ळ রহিয়া গিয়াছে, অন্য স্থানে ळ স্থানে ড় আছে, অপর স্থানে ড় আছে ळ ও আছে। বিবর্তনে এইরূপ হয়। ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ অগ্নি-মীলে পুরোহিতং, কোথাও মীলে, কোথাও মীড়ে, কোথাও মীळে আছে। কিন্তু কোথায় সেই ळ, আর কোথায় ড়! ড় কর্কশ, ळ কোমল; ন কর্কশ ণ কোমল।

প্রাচীন ळ স্থানে ড়, এই অনুমান ঠিক বোধ হইতেছে। কিন্তু সব শব্দের ळ স্থানে ড় আসে নাই। কোথাও কোথাও ল আসিয়াছে। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর-ত্রিবেদী-মহাশয়ও ळ স্থানে ড় অনুমান করেন। তিনি ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে ল্‌ঢ পাইয়া অনুমান করেন, বর্তমান ঢ়কারের মূল সেই ল্‌ঢ। সংস্কৃত ব্যাকরণে একটা সূত্র আছে, তাহাতে ড ল অভেদ বলা হইয়াছে। কিন্তু কোথায় ড, আর কোথায় ল মনে হয়। বস্তুতঃ মাঝে ळ স্মরণ করিলে সূত্রে অস্বাভাবিক কিছু থাকে না। জল ও জড় শব্দের সং ধাতু এক। উভয় শব্দের অর্থ এক, সলিল ও শীতল। ওড়িয়াতে জল শব্দে ळ, মরাঠীতে ল অর্থাৎ ওড়িয়াতে জळ—সলিল, মরাঠীতে জল—সলিল। ওড়িয়াতে জড়—শীতল, মরাঠীতে জড—শীতল। ওড়িয়াতে জড় স্থানে জড লেখা ও বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ওড়িয়াতে ড় অক্ষর নূতন নির্মিত হইয়াছে।

ড় কিংবা ळ, শব্দের আদিতে বসে না, ঢ় য় বর্ণও বসে না। অন্য ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলেও বসে না। জড় কিন্তু জাড্য, দৃঢ় কিন্তু দার্ঢ্য, শয় কিন্তু শয্যা। ওড়িয়া ভাষায় ळ প্রয়োগের সূত্র পাইলে বাঙ্গালা ভাষায় ড় প্রয়োগের সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। ওড়িয়া ভাষায় সূত্র এই, ळ শব্দের আদিতে হয় না, সংযুক্ত ব্যঞ্জনেও হয় না। সংস্কৃত শব্দে এবং সংস্কৃত হইতে অপভ্রষ্ট শব্দেও প্রায় এই রূপ। এমন কি, ইংরেজী রেল (গাড়ী) ওড়িয়াতে রেळ হইয়াছে। ওড়িয়াতে চপळ, কিন্তু চাপল্য। সংস্কৃতে যে শব্দে সংযুক্ত ল, ওড়িয়া ভাষায় সে শব্দের সংক্ষেপে ল থাকে, ळ হয় না। সং মল্লিকা হইতে ওং মলি, সং বিল্ব হইতে ওং বেল্। ক্রিয়াপদের ল বর্ণও ळ হয় না। সং কৃত—বাং করিল, ওং কলা; সং গত—বাং গেল, ওং গলা।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ওড়িয়া শব্দের ড ড় ळ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে উচ্চারণ-সৌকর্য ড় ও ळ বর্ণের উৎপত্তির কারণ। সলিল ওড়িয়াতে সলিळ, যেন পরে পরে দুই ল উচ্চারণ কঠিন। এইরূপ, শরীর গ্রাম্য বাঙ্গালাতে শরীল শুনিতে পাই: অড়র (কলাই), কেহ কেহ বলে অড়ল (কলাই); কারণ তাহারা ড় ও র প্রভেদ প্রায় করিতে পারে না। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বের চৈতন্যমঙ্গলে আছে,

রঘুরাম ভাব দেখিঞা চন্দ্রচূড়।
মুরারি গুপ্তের দেখ দীঘল লাঙ্গুল॥

এখানে ড় ল এক বোধ হইয়াছিল।

বাঙ্গালাতে কেহ কেহ ড় র প্রয়োগে ভুল করেন। কোথায় ড় আর কোথায় র, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতেছে।

(১) অসংযুক্ত ও অনাদিভূত ডকার ড় হয়। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, উভয়বিধ শব্দে এই এক সূত্র। উপরে উদাহরণ পাইয়াছি। অন্য উদাহরণ, খড় গুড় ক্রোড় চূড়া লগুড় তড়াগ গরুড় দ্রাবিড় বড়বা। কিন্তু, মার্তণ্ড বিতণ্ডা ভাণ্ড; ডোর ডাকিনী ডমরু ডিম্ব।

(২) সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালা শব্দে ড় আসিয়াছে। টবর্গের বর্ণ হইতে অধিক আসিয়াছে। ট স্থানে, যথা, কর্পট—কাপড়, ঝাট—ঝাড়, চিপিটক—চিড়া; ঠ স্থানে, যথা, কুষ্ঠ—কুড় (ঔষধ), কনিষ্ঠ—কড়িয়া, কড়ি (আঁগুল), কুঠার—কুড়াল; ড স্থানে, যথা, দণ্ড—দাঁড়, কুণ্ডী—কুঁড়ী, কুষ্মাণ্ড—কুমড়া; ঢ স্থানে, যথা, দংষ্ট্রা—দাঢ়া—দাড়া, দৃঢ়—দড়, সং পঠ—পঢ়—পড়,* সং কটাহ—কঢ়াই—কড়াই; ণ স্থানে, যথা,—তীক্ষ্ণ—তোখড়, রণ—রড় লড়, শ্রেণী—শিঁড়ী। টবর্গের বর্ণের মধ্যে ট স্থানে ড় অধিক আসিয়াছে, অন্য অসংযুক্ত বর্ণ স্থানে অল্প।

---

* যেখানে ঢ় স্থানে ড় হইয়াছে, সেখানে উচ্চারণে ঢ় অদ্যাপি শুদ্ধ। যেমন, রাম পুথী পঢ়ে। আর পড়ে—এই ড়ে শুদ্ধ নহে।

(৩) তবর্গের দুই একটা বর্ণ স্থানে ড় আসিয়াছে। ত স্থানে, যথা, আবৃত্তি—

আওড়া, পতিত—পড়া, ধাত্রী—ধাড়ী। র্ধ স্থানে, যথা, অর্ধ—আড় (আড়-পাগলা), সার্ধ—

সাড়ে, বর্ধকী—বাড়ই। ন স্থানে, যথা, রাজন্য—রাজড়া, চর্মন্—চামড়া। দ স্থানে ড, যথা,

দাড়িম্ব—ডালিম, দর—ডর, দণ্ড—ডাঁড় (পাখীর)।

(৪) সংস্কৃত শব্দের র ল স্থানে ড় আসিয়াছে। যথা, অপ-স্থ ধাতু হইতে অপসারি—

আছাড়ি; দ্রু ধাতু হইতে দউড় বা দৌড়; মরক—মড়ক; মাররালী—মাড়োয়ারী; আলি—

আড়ি, আইড়; সং ফাল ধাতু—ফাড়া; চর,—চল চড়।

(৫) বাঙ্গালায় ড়া, আড়, আড়া প্রভৃতি প্রত্যয় আছে। এই সকল প্রত্যয়ের মূল নির্ণয়

এখানে নিষ্প্রয়োজন। সাদৃশ্য, সম্বন্ধ, কর্তৃত্ব, প্রভৃতি অর্থে এই সব প্রত্যয় হয়। চাম—চামড়া,

আঁত—আঁতড়ী, পাত—পাতড়া, লাঠী-আড়া, খেল-আড়, ইত্যাদি বহু শব্দ আছে।

রা রী প্রত্যয়ও এইরূপ। যেমন, কাঠরা, কাঠরিয়া, ঝুপরী, মুহরী (মুখ+রী), ইত্যাদি।

র কি ড়, ইহা নিরূপণের একটা সামান্য সঙ্কেত এই,—যে সংস্কৃত শব্দের র কিংবা ড়

আছে, বাঙ্গালাতেও সে শব্দে সেই বর্ণ থাকে। সংস্কৃত হইতে আগত কিংবা বিকৃত না

হইলে ড় আসে না। নদীর পারে যাওয়া—পার সং; নদীতে পাড়ি দেওয়া—সং পালি হইতে

বাং পাড়ি; নদীর পাড়—পাহাড় (সং পর্বত, পাষাণ কিংবা পাটক) হইতে, অর্থ তীরভূমি।

ছেলেবেলাকার একটা ঠকানিয়া কথা আছে,—গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ী গড়্‌গড়ায়া যায়—

এখানে গড় সং; ঘোড়া—সং ঘোটক; গাড়ী—সং গন্ত্রী; গড়গড়ায়া—ঘর্ঘর শব্দ করিয়া, সং ঘৃ

ধাতু হইতে ঘড়্‌ঘড়ায়া—গড়্‌গড়ায়া।

আরবী ফারসী ইংরেজী শব্দের ড র ল স্থানে বাঙ্গালায় ড র ল থাকে, ড় হয় না। (সং

ঘর্ম), ফারসী গরম বাঙ্গালায় গরম; গড়ম হয় নাই। এই রূপ, জোর, জবর প্রভৃতি শব্দের

র বাঙ্গালাতেও র।

৮। বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিচার্য।*

ঢাকা হইতে প্রচারিত সম্মিলন নামক মাসিক পত্রের বৈশাখের খণ্ডে 'উকার বনাম ওকার'

প্রবন্ধে বাঙ্গালা ব্যাকরণের এক বিচার্য বিষয় আছে। ধাতুর উকার বিভক্তি-যোগে ওকার

হয় কিনা, ইহাই বিচার্য। (সে) শুনে উঠে তুলে, না (সে) শোনে ওঠে তোলে ?

বাঙ্গালা ব্যাকরণে উকার-ওকার দ্বন্দ্ব এক নাই, ইকার-একার দ্বন্দ্ব আছে, আরও দ্বন্দ্ব

আছে। বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার সময় এইরূপ দ্বন্দ্বে পড়িতে হয়। আমার সঙ্কলিত বাঙ্গালা

ব্যাকরণ অধ্যায়ে এই সব দ্বন্দ্বের উল্লেখ ও যথাসাধ্য ভঞ্জন করা গিয়াছে। এখানে পুনরুক্তি

না করিয়া দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে। ক্রিয়াপদের ও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদের ইকার একার,

উকার ওকার লক্ষ্য হইবে।

* প্রবাসী—১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ।

ভাষা কোন্ দিকে চলিয়াছে, প্রথমে তাহা দেখা যাউক। দেখা যায়, সে লেখে, ছেঁড়ে, ধোয়, শোনে ; সে লেখায়, ছেঁড়ায়, ধোয়ায়, শোনায় প্রভৃতি পদ চলিত হইতেছে। লেখা কাগজ, ছেঁড়া কাপড়, ধোয়া হাত, শোনা কথা ; লেখান্, ছেঁড়ান্, ধোয়ান্, শোয়ান্ ; লেখা-লেখি, ছেঁড়া-ছেঁড়ি, ধোয়া-ধোয়ি, শোনা-শোনি। *এখানে বাঙ্গালা শব্দশিক্ষার সূত্র আসিয়া লেখা-লিখি, ছেঁড়া-ছিঁড়ি, ধোয়া-ধুয়ি, শোনা-শুনি করিতে পারে। যেমন সং কোশী হইয়াছে কুশী (কোশা-কুশী), তেমন কোলা-কোলি—কোলা-কুলি, মোটা-মোটি—মোটা-মুটি ইত্যাদি* হইতে দেখা যায়।

ব্যাকরণের ভাষায়, বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে ধাতুর ইকার উকারের গুণ হয়। প্রয়োজক অর্থে আন্ত (সং ণিজন্ত) ধাতুর ইকার উকারের গুণ হয়। কৃৎ আ অন প্রত্যয় হইলেও হয়। বলা বাহুল্য, সামান্য ধাতুর উত্তর যেমন আ, আন্ত ধাতুর উত্তর তেমন অন হয়।

আর এক স্থল আছে। মধ্যম পুরুষে বর্তমান অনুজ্ঞায় ইকার উকারের গুণ হয়। যথা, তুই লেখ্ ছেঁড়্ ধো শোন্ ; তুমি লেখ ছেঁড় ধোও শোন। এইটার বিকল্প-বিধি আছে। কারণ তুমি শুন তুল টিপ পিট ইত্যাদিও শুনিতে পাওয়া যায়। তুই শুন্ তুল্ টিপ্ পিট্ ইত্যাদিও শুনি। বঙ্গের কোন্ অঞ্চলে শুনি, কোন্ অঞ্চলে শুনি না, তাহা কষ্টিপাথর করিয়া ফল নাই। কারণ শব্দ-শিক্ষার সূত্রে যেমন ও পরে ই থাকিলে ও স্থানে উ সহজে চলিয়া আসে, অ পরে ই থাকিলে অ স্থানে ঈষৎ ও আসে, তেমন এ আ পরে থাকিলে ধাতুর ই স্থানে এ, উ স্থানে ও আসিয়া পড়ে। মোটের উপর বলিতে পারা যায়, বঙ্গের পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে ই উ-কারের গুণ প্রায় হয় না।

কৃৎ আ প্রত্যয়ান্ত শব্দের এ-ওকার সম্বন্ধে তর্কের সুবিধা নাই। কারণ, চেনা-শোনা, বেচা-কেনা, ওলা-উঠা, গোঁজা-মিলন, নাম-ঘোষা, সিন্ধি-ঘোটা, ছোঁয়াছিয়া রোগ, জোড়া কাপড়, টেকা দায়, জ্বালা-পোড়া ইত্যাদি একার-ওকারাদি শব্দ অনেক কাল হইতে আছে। ওলা-উঠা শব্দে একদিকে ওলা যেমন আছে, অন্য দিকে উঠা আছে। নী ধাতু হইতে নেওয়া (নেআ), দি ধাতু হইতে দেওয়া (দেআ), শু ধাতু হইতে শোয়া (শোআ), ধু ধাতু হইতে ধোয়া (ধোআ) ইত্যাদি বহু প্রচলিত।

আন্ত (সং ণিজন্ত) ক্রিয়াপদে ইউ-কারের গুণ সব অঞ্চলে কথ্যভাষায় হয় না। কোন্ কোন্ অঞ্চলে ধাতুবিশেষে হয়, ধাতুবিশেষে হয় না। পি ধাতু হইতে পিয়া ধাতু হয়, পেয়া পাই নাই। এইরূপ আরও ধাতু আছে।

এ ও করিবার চেষ্টা অনেককাল চলিতেছে। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন, বিহসি পালটি নেহারি—নিহারি হইবার ছিল। এইরূপ, পবনে ঠেলল—ঠিলল হইতে পারিত। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, ঠেকিল রাজার ঝি, রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন, ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, পোড়ায় আনলে অতি, ইত্যাদি। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন, লোকে ঘোষে অপযশ, শোয় তরুতল, লোটায়্যা কুন্তলভার, আনলে পোড়ায়্যা নষ্ট না করহ তনু, লাজে হেঠ মাথা

করে না তোলে বদন, কুক্তিকা ধরিয়া তোলে, কান্ধেতে লম্বিত ঝুলি দোলে, প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে, গোময়ে লেপিয়া মাটী, পুষ্প তোলা বিনা অন্ত করহ আরতি, ইত্যাদি। অনুমান হয় প্রাচীন যে-কোন গ্রন্থে ধাতুর ইকার উকারের গুণের দুই পাঁচটাও উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

আধুনিক কালের মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ দেখি। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে, রোধে তার গতি, (রুষিলা দানববালা, কিন্তু) রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ, দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা, ফেরে দূরে মত্ত সবে, ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে, কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ, বৈতালিক-গীতে খোলে আঁখি, ইত্যাদি। নোয়া ধাতু (নু ধাতুর আন্তে) বহুকাল চলিতেছে। বৈষ্ণব কবি হইতে স্বর্গীয় কালিপ্রসন্ন-ঘোষ-মহাশয় নোয়া ধাতু স্বীকার করিয়াছেন। প্রভেদ এই পূর্বকালে লেখা হইত নোঙা, এখন হয় নোয়া।

বাঙ্গালাভাষায় সহস্রাধিক ধাতু প্রচলিত আছে। সব ধাতুতে এক নিয়ম চলিতে পারে কি না, তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। শেষে বুঝিয়াছি, যদি এক নিয়ম মানিতে হয়, তাহা হইলে ইকার উকারের গুণ স্বীকার করাই ভাল। যখন নেয় দেয়, তখন মেলে মেশে; যখন শোয় ধোয়, তখন রোষে ভোগে। কেহ একটা ধরেন, অপরটা ছাড়েন; কেহ বা বিকল্প-বিধি আশ্রয় করেন। বিকল্প-বিধি আর কিছু নয়, গ্রাম্যজনের ভাষায় বলিতে হয়, 'এও হয় সেও হয়।' জীবিতভাষার ব্যাকরণে বিকল্প-বিধি অবশ্য থাকিবে। ভাষার বিবর্তনের মূল-মন্ত্র না মানিয়া গতি নাই। যে বিবর্তনের কারণ সুখোচ্চারণ, তাহার রোধ সহজ নহে। পরে এ আ স্বর আনিতে হয় বলিয়া পূর্বের ই উকে এ ও করিয়া ফেলিতে স্বভাবতঃ চেষ্টা হয়। ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধির একমাত্র পরীক্ষা, যোগ্যের জয়।

এখন আর এক প্রসঙ্গে আসি। আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাশয় 'বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্‌রূপ' দেখাইয়াছেন। বিভক্তি-প্রত্যয়-যুক্ত পদকে তিনি শব্দের তির্য্যক রূপ বলিতেছেন। বাঙ্গালা আ প্রত্যয় ও কর্তৃকারকে এ বিভক্তি, এই দুই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ-অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। এখানে দুই একটা কথা সংক্ষেপে তুলি।

বাঙ্গালায় অনাদরে, স্বার্থে, সাদৃশ্যে, বিশেষণে আ তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। রাম—রামা, পাগল—পাগলা, দেব—দেবা, হাত—হাতা, আধ—আধা, রঙ্গ—রাঙ্গা প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্ত আছে। মরা (মাছ), জানা (পথ), শোনা (কথা) প্রভৃতি কৃৎ আ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ অসংখ্য আছে।

ইদানী কেহ কেহ অন্ কৃৎ প্রত্যয়কে অনো লিখিতেছেন। তাঁহারা লাফান, কাঁদান, ধরান প্রভৃতি না লিখিয়া, লাফানো, কাঁদানো, ধরানো লিখিতেছেন। বোধ হয় যুক্তি এই; (১) কেহ কেহ নো বলেন, (২) ন লিখিলে ন্ উচ্চারিত হইবার শঙ্কা থাকে। আমার সামান্য বিবেচনায়, যুক্তিদ্বয় কাজের নহে। কারণ, (১) বাঙ্গালার একটা উচ্চারণ আছে, সে

উচ্চারণ যে প্রত্যেকের উচ্চারণের সহিত মিলিবে এমন নয়; বাঙ্গালার আদর্শ উচ্চারণে অন্ (অকারান্ত), অনো (ওকারান্ত) প্রত্যয় নহে। (২) বাঙ্গালা শব্দের বানান ও উচ্চারণের অ-মেল এই একস্থলে নহে, অসংখ্য স্থলে আছে। কেহ কেহ কালো, ভালো, মতো বানান করিতেছেন। এরূপ বানান স্বীকার করিতে হইলে বাঙ্গালাভাষার নূতন ব্যাকরণ ও শব্দ-কোষ রচনা করিতে হইবে। অকারান্ত শব্দ অল্প নাই। যদি এমন নিয়ম করা যায় যে, সংস্কৃত শব্দের বানানে হাত না দিয়া কেবল সংস্কৃত হইতে অপভ্রষ্ট শব্দের—বাঙ্গালা শব্দের—শেষের অ উচ্চারিত হইলে বানানে ও লেখা যাইবে, তাহা হইলেও প্রশ্ন সহজ হইবে না।

বস্তুতঃ জীব-বিদ্যায় যেমন আদর্শ (type) ধরিয়া জীবের জাতি (species) নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তেমন প্রত্যেক ভাষার একটা আদর্শ আছে। যে লেখক বা বক্তার ভাষা সে আদর্শের যত নিকটবর্তী, তাহাঁর ভাষা তত শুদ্ধ। ব্যাকরণে সে আদর্শের ব্যাখ্যান থাকে। শব্দকোষে জীবজাতির নামমালার তুল্য শব্দরূপ জাতির নাম থাকে।

জাতির অল্পাধিক গৌণ পরিবর্তনে জাতিত্ব লুপ্ত হয় না। পরিবর্তন বা বিকারই নিয়ম, স্থায়ীত্বই ব্যভিচার বলা যাইতে পারে। শব্দেরও এইরূপ বিকার নিত্য ঘটিতেছে। কিন্তু সে বিকার মুখ্য অঙ্গে হইলে এক জাতি অন্য জাতি হইয়া পড়ে। কোন্ বিকারে বা পরিবর্তনে জাতিত্বে আঘাত লাগে না, তাহার নির্ণয় একপ্রকার অসাধ্য। তথাপি সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কিছু দূর যাইতে পারা যায়।

অন প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ—দুইই হয়। আ প্রত্যয়ান্ত শব্দও হয়। দুধ ছাড়ান্ দিয়াছে, দুধ ছাড়ান হইয়াছে; এমন দেখান্ দেখাব, দেখান হবে, ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। ছাড়ান বাকি আছে, দেখানর কথা পরে হবে, ইত্যাদিও আছে।

লিখনে উচ্চারণ-প্রভেদ যত দেখাইতে পারা যায়, ভাষার ততই পূর্ণতা। পূর্ণতা অসম্ভব। একটা সীমা চাই। এই কারণে বলিতে পারা যায় অকারান্ত জানাইতে অক্ষরের মূর্তি পরিবর্তন চলিবে না। না জানাইলে যেখানে চলে না, সেখানে অক্ষরের নীচে মাত্রা লাগাইতেছি। বোধ হয় সাধারণে ইহাও চলিত হইবে না। এই সমস্যার এক উত্তর, অন প্রত্যয়কে অনা প্রত্যয় করা। অনা করিবার পক্ষে যুক্তি এই, (১) জানানা, দেখানা প্রভৃতি আকারান্ত উচ্চারণ অনেক স্থানে আছে; (২) জানা দেখা প্রভৃতি পদ যেমন, জানানা দেখানা ঠিক তেমন, দ্বিতীয়টি প্রথমের অন্তর্গত। প্রভেদ, জান দেখ ধাতুর আত্ত রূপ জানা দেখা বলিয়া আবার আ যুক্ত হইতে পারে না। (৩) বাঙ্গালা বিশেষণ পদ যে প্রায়ই আকারান্ত হইয়া থাকে, তাহা শ্রীরবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধে জানা যাইবে।

এখন বাঙ্গালায় কর্তৃকারকে একার প্রয়োগের প্রসঙ্গ আনিতেছি। ঠাকুর-মহোদয় লিখিয়াছেন, 'মোটের উপর বলা যাইতে পারে সকর্মক ক্রিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্য বিশেষ্যপদ কর্তৃকারকে তির্য্যক্‌রূপ ধারণ করে।' যেমন বলি ছাগলে ঘাস খায়, পোকায়

কেটেছে, ভূতে পেয়েছে। কিন্তু এই সূত্র অসম্পূর্ণ দেখিয়া ঠাকুর-মহোদয় সকর্মক অকর্মক ক্রিয়া ছাড়িয়া সচেষ্টক অচেষ্টক ক্রিয়াভেদ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, সূত্রটি এই,— যেখানে কর্তৃপদে জাতির বা সামান্যের ধর্ম-প্রকাশ উদ্দেশ্য হয়, সেখানে কর্তৃপদে একার আসে। বলা বাহুল্য, সামান্য দ্বারা বহুত্ব প্রকাশিত হয়, এবং বিশেষ্য জাতিবাচক না হইলে সামান্য ধর্ম বলা যাইতে পারে না। আমরা বলি বানরে লাফায়—অর্থাৎ বানরের ধর্ম লাফানা, তেমনই, মানুষে ঘুমায়, লোকে না খেতে পেয়ে মরে, মাছে কামড়ায়, পোকায় কাটে, গাছে ফুল ধরে, গাছে আওতা করে, বাতাসে নড়ায়, ধার্মিকে পুণ্য করে, চোরে চুরি করে, মূর্খে মানে না, ইত্যাদি। যখন বলি, বেদে বলে ইতিহাসে লেখে, তখন বেদ ও ইতিহাসে কি আশা করি তাহা মনে মনে স্বীকার করিয়া লই। এ, য়, ই, একেরই রূপান্তর। হলন্ত শব্দে এ যুক্ত হয়, স্বরান্ত শব্দের পরে য় বসে। বাঙ্গালা ভাষায় বহুবচন বাচক ই বিভক্তি হয় না, আসামী ভাষায় হয় বা হইত। উচ্চারণ-সুখের নিমিত্ত স্বরান্ত বিশেষ্য পরে এ স্থানে তে হয়। গোরুএ— গোরুতে ঘাস খায়, ঘোড়ায়—ঘোড়াতে চাটি মারে, দেবতায় মারিলে রাখে কে, ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে বলে—এখানে 'অনেক' শব্দ যে বিশেষ্য তাহা জানাইতে 'অনেকে'।

ওড়িয়া, হিন্দী, মরাঠীতেও এ বহুবচনের সামান্য বিভক্তি। ওড়িয়াতে, লোকে কহন্তি। এ যে বহুবচনের বিভক্তি, তাহা বাঙ্গালায় যেন কালক্রমে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ওড়িয়াতে হইতেছে। একারণ ওড়িয়াতে ইদানী একটা 'মান' শব্দ বহুবচনের বিভক্তি-স্বরূপ প্রযুক্ত হইতেছে। নব্য লেখক ও বক্তার নিকট 'মান' অত্যাবশ্যক হইতেছে, গ্রাম্য লোকে 'মান' তত লাগায় না। বাঙ্গালাতেও নব্য লেখক 'গণ' শব্দ যত লাগান, প্রাচীন লেখক তত লাগাইতেন না, লাগাইবার প্রয়োজন পাইতেন না। ওড়িয়াতে 'বালকমান', বাঙ্গালায় যেমন 'বালকগণ'। কিন্তু 'বালকমান' যে বহুবচন হইল, তাহা ভুলিয়া বহুবচনের এ আনিয়া নব্য ওড়িয়া লেখক লেখেন 'বালকমানে'। ইহা আর কিছু নয়, এ যে বহুবচনের বিভক্তি অজ্ঞাতসারে তাহাই স্বীকার। মান্য ব্যক্তিকে বহু জ্ঞান করাই রীতি। বাঙ্গালাতে গৌরবে বহুবচন আছে, যদিও প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, ওড়িয়াতে স্পষ্ট আছে। ওড়িয়াতে বলা হয়, 'কবি কালিদাসে লিখিঅছন্তি'—কবি কালিদাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাতে ক্রিয়াপদ বহুবচন করিয়া কর্তার সম্মান করা হয়। এই কারণে, লিখিয়াছে-ন। এ যে বহুবচনের বিভক্তি, আসামীতে তাহা বিস্মৃত হইয়া একবচনে এ বসাইতে বসাইতে এখন এ একবচনের বিভক্তি হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ভুল সকল ভাষাতে ঘটে।

হিন্দীতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে এ, এঁ বসে। যেমন, কুত্তা—কুত্তে, আঁখ—আঁখে। ইঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে আঁ এবং পুংলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে ওঁ লাগে। যেমন, স্ত্রী—স্ত্রিআঁ—স্ত্রিয়াঁ, ভাই—ভাইয়োঁ। মরাঠীতে পুংলিঙ্গ শব্দে এ (যেমন ঘোড়া —ঘোড়ে), ক্লীবলিঙ্গ শব্দে এঁ কিংবা ঈ (যেমন বস্ত্র—বস্ত্রেঁ), স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে আ কিংবা ঈ (যেমন কাঁথ (সং কথা)—কাঁথা, জাত (সং জাতি)—জাতী)। এসব অতি স্থূল নিয়ম;

তা হউক, দেখা যাইতেছে বহুবচনের বিভক্তি এ ই আছে, এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দে এ অনুনাসিক হয়।

যখন সংস্কৃতের বিবর্তনে বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি, এবং যখন সংস্কৃতমূলক সকল ভাষাতে এ হইয়াছে এবং এ ই একেরই রূপান্তর, তখন স্বচ্ছন্দে মনে করা যাইতে পারে যে সংস্কৃত হইতে একার আসিয়াছে। এখানে এবিষয় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমার অনুমানে সংস্কৃত নি (যেমন ফলানি) হইতে ইঁ—ই—য়—একার আসিয়াছে। আসামীতে পুংলিঙ্গ সি (সে) শব্দের বহুবচনে সি-হঁতে (তাহারা)। এখানে য়ঁ-এ মূল রূপ হইতে হঁতে আসিয়া থাকিবে। প্রাচীন বাঙ্গালা তেহঁ, যাহা হইতে বর্তমান তি-নি, মূলতঃ বহুবচনের রূপ, গৌরবে একবচন হইয়া গিয়াছে।

সূচী।

[অঙ্কে পৃষ্ঠাঙ্ক বুঝিতে হইবে]

বাঙ্গালা ভাষা।

তৃতীয় অধ্যায়। ব্যাকরণ।

ব্যাকরণ শব্দের অভিধা।

শব্দ-শিক্ষাধ্যায়ে মূল শব্দের পরিবর্তন আলোচিত হইয়াছে। বাক্যে মূল শব্দের অন্ত্য পরিবর্তন হয়। তৎসহ অর্থের সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন হয়। বাক্যে স্থিতি অনুসারেও মূল শব্দের অর্থের ও অন্বয়ের বিশেষ হয়। এই দ্বিবিধ কারণে মূল শব্দের যে অর্থান্তর ঘটে, তৎপ্রদর্শন ব্যাকরণের মুখ্য লক্ষ্য।

বস্তুতঃ দেহের নির্ম্মাণ বুঝিতে হইলে ব্যবচ্ছেদ যেমন, ভাষার নির্ম্মাণ বুঝিতে হইলে ব্যাকরণ তেমন আবশ্যক। অথবা, যেমন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার মূল এবং মূলের পরস্পর সংযোগাদি ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন, বৈয়াকরণিক ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূল এবং মূলের পরস্পর সংযোগে ভাষার রচনা বুঝিতে প্রয়াসী হন। এই কারণে শব্দ-শিক্ষাও ব্যাকরণের অন্তর্গত হইয়া থাকে। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের সংখ্যা ও বিষয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ-শাস্ত্রী সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার অষ্টম ভাগে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালাভাষার প্রায় আড়াইশত ব্যাকরণ আছে! দুঃখের বিষয়, এই অধ্যায় লিখিবার সময় তিন চারি খানির অধিক দেখিতে পাই নাই। প্রথম খানি, রাজা রামমোহন-রায়-কৃত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (শক ১৭৫০); দ্বিতীয় খানি, শ্রীশ্যামাচরণ-শর্ম্ম-প্রণীত 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' (বঙ্গাব্দ ১২৫৯); তৃতীয় খানি, শ্রীনকুলেশ্বর-বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৫ সাল); এবং চতুর্থ খানি শ্রীলোহারাম-শিরোরত্ন প্রণীত 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' (সংবৎ ১৯৩৬)। রাজা রামমোহন-রায়ের ব্যাকরণ অতি সংক্ষিপ্ত, ব্যাকরণের আরম্ভ মাত্র। অন্য তিন খানি কিঞ্চিৎ বৃহৎ।

সাতান্ন বৎসর পূর্ব্বে শ্যামাচরণ-শর্ম্মা বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-রচনায় যে অনুসন্ধান-ফল দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার পরিপক্ক পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হইলে সমুদয়টি উদ্ধার করিতাম। তিনি লিখিয়াছেন, 'শব্দমাত্র আদৌ দুই ভাগে বিভক্ত, অব্যয় ও সব্যয়। অব্যয় তাহার নাম যাহার রূপ হয় না, যথা, হইতে, দিয়া, এবং, আহা ইত্যাদি। সব্যয় তাহাকে বলে যাহা বিভক্তি আদি যোগে রূপ করা যায়। স-ব্যয় দ্বিবিধ,—ধাতু ও শব্দ।' ইত্যাদি। এই ব্যাকরণে 'অনাদর-সূচক সংজ্ঞার সাধন (যেমন, হরি—হরে, কৃষ্ণ—কেষ্টা),

'অনুকার শব্দ' (যেমন, হুম্ হাম্, হুম্ দাম), 'অনুরূপ শব্দ' (যেমন, ছুরি-টুরি, কাপড়-চোপড়), 'টা আদির প্রয়োগ', ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের সারগর্ভ আলোচনা আছে।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ কিয়দংশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, কিয়দংশে নহে। এই হেতু ইহার ব্যাকরণ-প্রণয়নে কেহ সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র উদ্ধার করিয়া ইঙ্গিতে বাঙ্গালা ভাষা সারিয়াছেন, কেহ বা দুই প্রকার সূত্রের অবতারণা করিয়া গঙ্গা-যমুনা দুই পৃথক নদীর কল্পনা করিয়াছেন।* যিনি সংস্কৃত-সম ও সংস্কৃত-ভব শব্দের ব্যাকরণে তুল্য সূত্র চালাইতে পারিবেন, তাঁহার ব্যাকরণই বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইবে।

এই গ্রন্থ মুদ্রাকরের হস্তে অর্পণ সময়ে শ্রীশ্রীনাথ সেন মহাশয়ের 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩১৬ সাল) নামক দুই খণ্ড পুস্তক আমার দেখার অবসর হয়। 'ভাষাতত্ত্ব' নাম হইতে পুস্তকের প্রতিপাদ্য ঠিক বুঝিতে পারি নাই। পাছে সেন-মহাশয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার পক্ষপাতী করে, এই আশঙ্কাও কিছু কিছু ছিল। এখন নিঃশঙ্কে বলিতে পারি, বহুস্থলে তাঁহার দৃষ্টির এবং আমার দৃষ্টির ঐক্য হইয়াছে, দুই চারি স্থলে হয় নাই। ঐক্য হইতে বুঝিতেছি, বাঙ্গালা বিভক্তি ও প্রত্যয়ের আদি অনুমান একেবারে মিথ্যা হয় নাই। দুঃখের বিষয়, অনৈক্য স্থলে বিশেষ বিচারের সুযোগ হইল না। তাঁহার প্রতিপাদ্য এই যে, "বঙ্গভাষা হিন্দিভাষা উৎকলভাষা প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতের মৌখিক ভাষা।" "সংস্কৃত ভারতবর্ষের সার্ব্বজনিক সাহিত্যের ভাষা এবং "বাঙ্গলা" প্রভৃতি তাহার কথিতাকার। "সংস্কৃত" বা "প্রাকৃত" কোন ভাষা বিশেষের নাম নহে। একই ভাষার পরিমার্জ্জিত সাহিত্যিক আকারের নাম সংস্কৃত এবং অমার্জ্জিত কথিতাকারের নাম প্রাকৃত।" দুঃখের বিষয় তিনি 'ভাষা' শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই। তথাপি, আমি বলি, এই সকল ভাষা সংস্কৃত-ভাষা হইতে উদ্ভূত বটে, কিন্তু ইহাদের বিকৃতি এক প্রকার নহে, বিকৃতির ক্রমও এক প্রকার নহে। রূপান্তর যখনই স্বীকার করি, তখনই সে রূপান্তরের লক্ষণ ধরিয়া তাহাকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, নতুবা জ্ঞান-বৃদ্ধির সুবিধা হয় না। কি লক্ষণ থাকিলে গণ (genus), কি লক্ষণ থাকিলে জাতি (species), এবং কি লক্ষণ থাকিলে জাতির ভেদ কিংবা অভেদ স্বীকার কর্তব্য, তাহা লইয়া চিরকাল বিবাদ চলিতে পারে। এ তর্ক ত্যাগ করিয়া সচ্ছন্দে বলিতে পারি, 'ভাষাতত্ত্ব' একটু অধিক শৃঙ্খলার সহিত লিখিত হইলে সংস্কৃত-ভাষার সহিত বাঙ্গালা-ভাষার মাতা-পুত্রীর সম্বন্ধ-নির্ণয় সফল হইবে।

ব্যাকরণের উদ্দেশ্য।

ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া শব্দের ধাতুপ্রত্যয়-নিরূপণ, পদ-সাধন, বাক্য-রচন প্রভৃতির নিয়ম আবিষ্কার ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হইতে পারে। তেমনই, মূল নিয়ম দেখাইয়া ভাষাকে ব্যাকরণ সংযত করে। মানুষ নিয়ম ভয় করে। যতদিন নিয়ম না জানে, ততদিন সে উদ্দাম থাকে। যে দিন জানিতে পারে, সে

* উল্লিখিত চারিখানি ব্যাকরণের নাম ও প্রচারকাল লক্ষ্য করিলে কোন্ খানির গতি কোন্ দিকে, তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১৭৫০ শকে, বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১২৫১ বঙ্গাব্দে, ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৩০৫ সালে, বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১৯৩৬ সংবতে। বঙ্গদেশে সংবৎ প্রচলিত আছে কি?

দিন হইতে তাহার অভ্যাস পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে। যদি ব্যাকরণ দেখাইয়া দেয়, বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়, তাহা হইলে নূতন লেখক ঈ না লিখিয়া পারিবে না। এখন কথিত ভাষার শব্দের বানানে অনৈক্য দেখা যায়; কারণ ব্যাকরণ নিয়ম দেখাইয়া শব্দ বাঁধিয়া দেয় নাই। অন্যদিকে, অনেকে 'দেশজ' 'দেশজ' রবে বহু শব্দকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ব্যাকরণের দ্বারা জীবন্ত ভাষা সংযত করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ হইতেই পারে না। একথা মানিতে পারি না। ভাষা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, পরিবর্তিত হয়। কিন্তু, স্বভাবেরও স্ব-ভাব আছে। এ কথাও সত্য, ইচ্ছা করিলে মানুষ তাহার ভাষাকে নির্দিষ্ট পথে কতকটা চালিত করিতে পারে। ধ্বনি যখন লেখনীর মুখে বাহির হয়, তখন তাহার পুনর্জন্ম হয়, আয়ুও বাড়িয়া উঠে। ভাষার প্রকৃতির বাহিরে গেলেই ব্যাকরণের নিয়ম নিষ্ফল হয়। জীবন্ত মানুষের জীবন-ধারণের, বৃদ্ধি ও পুষ্টির নিয়ম আছে। সে নিয়ম সূক্ষ্মরূপে আবিষ্কার করিতে না পারি; নিয়ম নাই বলিতে পারা যায় না। সেইরূপ, জীবন্ত ভাষারও গতির নিয়ম আছে। সামাজিক বহুব্যাপারে দশজনে যাহা করে, পরে তাহাই আচার-ব্যবহারে পরিণত হয়। অনেক স্থলে দেখা যায়, অতিতুচ্ছ ব্যাপার কালক্রমে অলঙ্ঘনীয় প্রথায় পরিণত হইয়াছে। মানুষ-রূপ সামাজিক জীবের ভাষা-রূপ সামাজিক সাধনেও মানুষের অনুকরণ-স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিভাশালী কখন কখন নিয়মভঙ্গ করেন; কিন্তু, সাধারণ লোকের নিকট তাহা আর্ষ প্রয়োগ হইয়া দাঁড়ায়।

উপস্থিত গ্রন্থের অভিপ্রায়।

বাঙ্গালাভাষা যেমন পাইতেছি, তাহাই এখানে আলোচ্য। কথিত ভাষাই লিখিত ও সাহিত্যের ভাষাকে জীবিত রাখে। লিখিত ও সাহিত্যের ভাষা অল্পাধিক কৃত্রিম, এবং কৃত্রিম বলিয়াই বাঙ্গালাভাষা নামে একটা ভাষা হইতে পরিয়াছে। সে ভাষা কলিকাতার ভাষা নহে, বঙ্গের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম স্থানের ভাষা নহে। বঙ্গের সকল স্থানের ভাষার তন্মাত্র বঙ্গভাষায় বিদ্যমান। সেই তন্মাত্রের প্রকাশনই বাঙ্গালা-ব্যাকরণকারের কর্তব্য হইবে।

এই কার্য-সাধনের নিমিত্ত বঙ্গের মণ্ডল-বিশেষ—রাঢ়ের কথিত ভাষা অবলম্বন করা যাইতেছে। সে ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, সাধু কি প্রাকৃত, তাঁহার বিচার করা হইবে না। কিন্তু, ভাষার সে তন্মাত্র আবিষ্কার নিমিত্ত অবশ্য অন্যান্য স্থানের কথিত ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কেবল বঙ্গভাষা নহে, পার্শ্ববর্তী আসামী ওড়িয়া ও হিন্দী এবং কিঞ্চিৎ দূরবর্তী মরাঠী ভাষারও ইঙ্গিত মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিতে হইবে। বঙ্গভাষার প্রাচীন রূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে। তার পর, সম্ভব হইলে, এই সকল ভাষার জননী সংস্কৃতভাষার ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়া যাইবে। ইহাই অজ্ঞাতের সহিত পরিচিত হইবার প্রকৃষ্ট বিধি। বস্তুতঃ বঙ্গভাষা যেন এক অজ্ঞাত জীব মনে করিয়া জীববিদ্যার মার্গানুসারে এই ভাষার শব্দের আকার-প্রকার, রীতি-চরিত্র, বংশ-বিস্তার, শ্রেণী-বিভাগ, শ্রেণী-সমূহের পরস্পর জ্ঞাতিত্ব-স্থাপন,

এবং আদি-রূপ-অনুমানের প্রয়াস করা যাইবে। যে শব্দ স্পষ্ট সংস্কৃত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রে গ্রথিত, তাহার নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ আছে। যে শব্দ বাঙ্গালা এবং যে ভাষা বাঙ্গালা তাহার স্থূল বি-আকরণ এখানে অভিপ্রায়। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা শব্দের মধ্যে সংস্কৃত-ভব শব্দ ব্যতীত আর্বী ও ফার্সী ভাষার শব্দ আছে।

এই দুরূহ চেষ্টায় পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। দুই এক স্থলে উচিত-অনুচিত শুদ্ধ-অশুদ্ধের প্রসঙ্গও আসিয়া পড়িবে। নিয়ম-বাঁধনে বাঁধা না থাকাতে অনেক শব্দ আমাদের কেবল কানের অনুভূতির আশ্রয়ে বিচরণ করিতেছিল; এখানে সে সমুদায়কে নিয়মের অধীনে আসিয়া গতি সংযত করিতে হইবে। এই হেতু কোন কোন শব্দের বানানে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যাইবে। অমুক বানান এতকাল চলিয়া আসিয়াছে, অমুক লেখক এই বানান করিয়াছেন, অতএব তাহাই শুদ্ধ এবং অন্য অশুদ্ধ, বোধ করি এরূপ তর্ক তুলিবার সময় গিয়াছে। যে উচ্চারণ বাঙ্গালার সে উচ্চারণ শুদ্ধ; এবং যে বানান মূলের সহিত উচ্চারণ প্রকাশ করে, সে বানান শুদ্ধ। শব্দের মূলের দিকে গেলে বুঝিতে পারি, কালক্রমে ভাষায় তাহার কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তখন ভাষার বিকার ত্যাগ করিলে মূল আকার পাওয়া যাইবে। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্তমান সাহিত্যের এবং বহুস্থলে পুরাতন পুথীর ভাষা বাঙ্গালা-ভাষার আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছে।

শব্দ।

সংস্কৃত-ব্যাকরণের পরিভাষা বাঙ্গালা ব্যাকরণে ঠিক চলে না। কিন্তু বাঙ্গালা-ব্যাকরণের নিমিত্ত পৃথক সংজ্ঞা কল্পনাও সহজ নহে। সংস্কৃত-ব্যাকরণের সংজ্ঞার প্রসারণ কিংবা সঙ্কোচনদ্বারা বাঙ্গালা-ব্যাকরণের পরিভাষা করা যাইতে পারে। যথা, যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহার সামান্য নাম শব্দ। শব্দ দ্বিবিধ, ধ্বন্যাত্মক এবং অর্থাত্মক। মৃদঙ্গাদির শব্দ ধ্বন্যাত্মক, ভাষার শব্দ অর্থাত্মক। অর্থাত্মক শব্দ বর্ণাত্মক। মানুষের কণ্ঠযোগে-জাত শব্দ বর্ণ। যেমন কখ ইত্যাদি। এক কিংবা বহুবর্ণের যোগদ্বারা অর্থাত্মক শব্দ হয়।

ধাতু।

বৈদ্য-শাস্ত্রে যেমন বায়ু-পিত্ত-কফ কিংবা রস-রক্ত-মাংস-মেদাদি শরীর ধারণ করিয়া থাকে, তেমন ভাষার যে ক্ষুদ্র অংশ শব্দ ধারণ করে, তাহার নাম ধাতু। অর্থাৎ ভাষার শব্দের কতকগুলি মূলধ্বনি আছে, সেই মূলধ্বনির নাম ধাতু। যথা, সং ধৃ বাং ধর্ ধাতু হইতে ধর, ধরা, ধরণ, ধরণা, ধর্ম, ধার্মিক, ধর্মী ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল শব্দে ধর্ ধাতু বর্তমান। সং ধৃ বাং ধর্ ধাতুর সামান্য অর্থ ধারণ, স্থিতি। ধর্ ধাতুর সহিত অ যোগে ধর, আ যোগে ধরা, অন যোগে ধরণ, অনা যোগে ধরণা, ম যোগে ধর্ম।

প্রত্যয়।

ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ করিয়া যে শব্দ হয়, তাহার নাম প্রাতিপদিক। 'ধর্ম' প্রাতিপদিকে ইক যোগে ধার্মিক, ঈ যোগে ধর্মী, ইত্যাদি। অ আ অন অনা ম ইক ঈ যোগে ধাতু ও প্রাতিপদিকের এক এক অর্থ প্রত্যয় হয়;

এই হেতু ইহাদের নাম প্রত্যয়। অতএব ধাতু কিংবা প্রাতিপদিকে যে শব্দ যুক্ত না হইলে নিজের অর্থ বোধ করাইতে পারে না, তাহার নাম প্রত্যয়। প্রত্যয় দ্বিবিধ; ধাতু-প্রত্যয় এবং প্রাতিপদিক-প্রত্যয়। ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় বসে, তাহা কৃৎ-প্রত্যয়; প্রাতিপদিকের উত্তর যে প্রত্যয় বসে, তাহা তদ্ধিত-প্রত্যয়।

ধাতুর উত্তর যে শব্দ-রূপ অংশ যুক্ত হইলে ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল, ভাব *, পুরুষ, এবং

বিভক্তি। পুরুষের সঙ্খ্যা বুঝায়, তাহার নাম ক্রিয়া-বিভক্তি। শব্দের সহিত ক্রিয়ার এবং অন্য শব্দের অন্বয় থাকে। এই অন্বয় বুঝাইতে শব্দের উত্তর যে বিভক্তি থাকে তাহার নাম প্রাতিপদিক-বিভক্তি। (কারক দেখ)

বাক্যের অর্থাত্মক এক এক অংশের অর্থাৎ শব্দের নাম পদ। যথা, রাজা-দশরথের পুত্র-রাম

পদ। সীতার সহিত চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিলেন। এখানে এগারটি শব্দ আছে। তন্মধ্যে 'রাজা-দশরথের' এবং 'পুত্র-রাম' সমাসে এক এক পদ হইয়াছে। অতএব এই বাক্যে নয়টি পদ আছে। দেখা যায়, 'করিলেন' পদে ক্রিয়া-বিভক্তি, এবং 'দশরথের, 'সীতার' 'বনে' পদে প্রাতিপাদিক-বিভক্তি আছে, এবং 'রাম' 'সহিত' 'চৌদ্দ' 'বৎসর' 'বাস' এই কয়েক পদে বিভক্তি নাই। বাক্য হইতে পৃথক হইলে এই বিভক্তি-শূন্য পদগুলি শব্দ নাম পাইবে। অতএব বিভক্তি দ্বারা এবং বাক্যে স্থিতি দ্বারা পদ জানা যাইতেছে। সংস্কৃত-ব্যাকরণে বিভক্তি-হীন শব্দ পদ-নাম পাইতে পারে না, বাঙ্গালাতে পাইতে পারে।

পরিশেষে আর এক কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। শাস্ত্রে সূত্র-সঙ্কলনের দুই উদ্দেশ্য থাকে। (১) জানা ব্যাপার অল্প নিয়মের অধীনে আনা, (২) অজানা ব্যাপার আবিষ্কারের পথ দেখানা। ব্যাকরণের পক্ষে, শব্দ কিংবা পদ পাইলে তাহার অর্থ নিরূপণ, এবং অর্থ পাইলে শব্দ ও বাক্য রচনা, দুইই আবশ্যক। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কাজ চিরদিন দুরূহ। *

সাঙ্কেতিক শব্দ।

আসা°...আসামী
তু°...তুলনা কর
উ°...উচ্চারণ
ম°...মরাঠী
ও°...ওড়িয়া
সং°...সংস্কৃত
সং প্রা°...সংস্কৃত প্রাকৃত

গ্রা°...গ্রাম্য বাঙ্গালা, যে বাঙ্গালায় অশিক্ষিত লোকে কথা কহে। গ্রামের অশিক্ষিত নরনারীর ভাষা।

প্রা°বা°...প্রাকৃত বাঙ্গালা, যে বাঙ্গালায় শিক্ষিত লোকে কথা কহে।

বা°...বাঙ্গালা। ব...অন্তঃস্থ ব অর্থাৎ ৱ।

---

* সংস্কৃত-ব্যাকরণে আশীর্লিঙ বিধিলিঙ লুঙ এবং লোটও ক্রিয়ার কাল প্রকাশ না করিয়া ভাব প্রকাশ করে।

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালায় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় এবং দ্বিরুক্ত শব্দের সূচনা করিয়াছিলেন।

১ম পরিচ্ছেদ। ক্রিয়াপদ সাধন।

৭৬। বাঙ্গালা ধাতু।

বাঙ্গালা ধাতুর সঙ্খ্যা।

/০ বাঙ্গালায় প্রায় আট শত ধাতু চলিত আছে। চলিত সংস্কৃতেও ধাতুর সঙ্খ্যা প্রায় এই। বাঙ্গালা প্রয়োজক ধাতু গণিলে মোট ধাতু প্রায় এগার শত হইবে। বাঙ্গালা-শব্দকোষে এই সকল ধাতু দেওয়া গিয়াছে। এই এগার শত ধাতু ব্যতীত প্রায় তিন শত দ্বিরুক্ত ধাতু আছে। কন্-কন, দপ্-দপ, ধক্-ধক প্রভৃতিকে দ্বিরুক্ত ধাতু বলা যাইতেছে। দ্বিরুক্ত ধাতুর মধ্যে অত্যল্প ক্রিয়ারূপে পাই, অধিকাংশে কেবল কৃৎ প্রত্যয় বসে। এইহেতু দ্বিরুক্ত মূল শব্দ ধাতুর মধ্যে গণ্য যাইতেছে। বিশেষ কারণ পরে বলা যাইবে। অতএব বাঙ্গালায় প্রায় দেড় হাজার ধাতু চলিত আছে। বাঙ্গালা ভাষা দীন ভাষা নহে।

ধাতুর মূল।

৵০ এই সকল ধাতুর প্রায় ষোল আনা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। দুই দশটা যাবনিক শব্দ। দ্বিরুক্ত ধাতুর সমুদায় সংস্কৃত-মূলক।

সামান্য ও নাম ধাতু।

৶০ সমুদায় ধাতুকে সামান্য ও নামধাতু, এই দুই ভাগে ভাগ করা চলে। কর্, খা, চল্, ইত্যাদি সামান্য ধাতু। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উর্দূ ভাষার অনেক বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ বাঙ্গালায় ধাতুরূপ পায়। ইহাদের সঙ্খ্যা নাই বলিলেও চলে। ভাষা সঙ্কোচে এবং ইচ্ছামত বহুল প্রয়োগে নানা নামধাতুর সৃষ্টি হইতেছে। সং জিজ্ঞাসা হইতে জিজ্ঞাস, সং দণ্ড হইতে দাঁড়া, ইত্যাদি বহুধাতু আছে। সং আবৃত্ ধাতু হইতে বাং আওট, এবং সং আবর্ত্তিত বিশেষণ শব্দ হইতে বাং আওটা ধাতু আসিয়াছে। বাঙ্গালায় বলা যায়, দুধ আওট, দুধ আওটাও; আওটা দুধ, আওটানা দুধ। এইরূপ, সং আ-চর ধাতু হইতে বাংতে চুল আঁচড়ি, এবং আচীর্ণ হইতে বাংতে চুল আঁচড়াই। আবর্ত্তিত আচীর্ণ প্রভৃতির তুল্য সং বিশেষণ শব্দ হইতে বাংতে অনেক নাম ধাতু আসিয়াছে। লতানা, মুখানা, হাতানা, কামানা, হাঁপানা, কমানা, নরমানা, জুতানা, বেতানা, (তাশখেলায়) তাশানা, পাশানা, তুরপানা, ইত্যাদি বহু বহু শব্দে নামধাতু পাই। কন্-কনানি, দপ-দপানি, ভঁ-ভঁআনি ইত্যাদির মূল দ্বিরুক্ত ধাতু, নামধাতুর তুল্য। পদ্যে অনেক ক্রিয়াপদ পাই, যাহা কথিত ভাষায় কিংবা লিখিত গদ্যে পাই না। কৃত্তিবাসে, উত্তরিল, বন্দিল, হিংসিস্, নমস্করি, চক্ষু না নিমিষেন রাম, ইত্যাদি পাই। কবিকঙ্কণে আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা, ইচ্ছিলা, অবতরি, নাশিবারে, পরিহরি, আশ্রয়ি (আশ্রয় করিয়া), প্রবেশিয়া,

---

সম্প্রতি 'শব্দতত্ত্ব' নামক পুস্তিকায় তাহা প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীব্যোমকেশ-মুস্তফী ও শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর-ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় কয়েকটা বাঙ্গালা প্রত্যয় ও কারকের বিভক্তির আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের আলোচনা এবং পণ্ডিত শ্যামাচরণ-শর্ম্মা ও নকুলেশ্বর-বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যাকরণ হইতে সাহায্য পাইয়াছি। দুই

আরোপিয়া, বিড়ম্বিল, স্মরে, প্রশংসে, ভ্রমিলা, ইত্যাদি। মেঘনাদবধ-কাব্য পড়িবার সময় মনে হইয়াছিল, কবি বাঙ্গালায় নামধাতুর প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা আমাদের ভাষাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছি।* বাঙ্গালা ভাষা যে-কোন বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দকে নামধাতুতে পরিণত করিতে পারে। বাঙ্গালা, হিন্দী, ওড়িয়া, মরাঠী, এই চারিভাষারই এই শক্তি অল্পাধিক আছে। ইহাদের মধ্যে মরাঠী বাঙ্গালা ভাষাকে হারাইয়াছে। মরাঠী ভাষা দণ্ড, দুঃখঃ, দুন (দ্বিগুণ), অন্বেষণ প্রভৃতি শব্দকেও নামধাতু করিয়াছে। এই যে শক্তি, তাহা অবশ্য সংস্কৃত ভাষা হইতে আসিয়াছে। এই চারি ভাষার মধ্যে ওড়িয়া ভাষা পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কালের ধর্মে কতকগুলি ধাতুর প্রয়োগ কমিয়া আসিতেছে। নারিব (ন- বা না-পারিব), ত্যজিব, পিইব (পান করিব), চিন্তিব, ইত্যাদি পদ শুনি না। কিন্তু কথিত ভাষা হইতে ধাতুগুলি এখনও নাম কাটায় নাই। বাছুর পিইয়াছে, ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিব ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। বাঁকুড়া জেলায় নারি, নারিব, এবং আসামী ভাষায় ন-আরিব (নোৱারিব) এখনও চলিত আছে।

সহচর ক্রিয়া।

।০ অনেক ধাতু অপর ধাতুর সঙ্গে এক যোগে ক্রিয়া সাধন করে। হওয়া, যাওয়া, পড়া, উঠা, তুলা, দেওয়া ইত্যাদি এইরূপ সহচর-ক্রিয়া। করা হইল, করা গিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, হইয়া উঠিল না, কাজ করিয়া তুলিলাম, ইত্যাদি উদাহরণের 'করা হইল' বাক্যের হইল ক্রিয়াপদের স্বাতন্ত্র্য বরং দেখা যায়, অন্যগুলি অন্যের অনুচর্যা না পাইলে ক্রিয়া-সমাপ্তি করিতে পারে না (পরে দেখ)। আছ ধাতুর অধিকার বহুবিস্তৃত। তিনি আছেন, তাঁর বাড়ী ঘর আছে, তাঁর জানা আছে, শোনা আছে, যাওয়া আছে, তিনি করিতে-আছেন, করিয়া-আছেন ইত্যাদি প্রায় সর্বঘটে আছ ধাতু বিদ্যমান। কোন কোন স্থলে আছ ও থাক ধাতুর মধ্যে ক্রিয়া বিভাগ আছে। এসময়ে তিনি বাড়ীতে থাকেন, ছুটির সময় তাঁর বাসা থাকে, তিনি করিয়া থাকেন, তাঁর জানা থাকিত, তাঁর থাকা না থাকা সমান, তিনি থাকিয়া কাজ করাইবেন, আমার থেকে তিনি বড়, ইত্যাদি উদাহরণে থাকার অধিকার দেখা যায়। কর ধাতুর অধিকারও কম নহে। এমন কি, কর ধাতুকে বাঙ্গালার অধম-তারণ বলিতে পারা যায়। ভাল করিয়া বলিও, এমন করিয়া দিন কাটাইলে, তাতে ক'রে কাজের ক্ষতি হবে, শীত করিতেছে, ইত্যাদি ত আছেই; দুষ্টলোককে তাড়না করিয়া ভদ্রলোক উপস্থিত করিবে; এমন কি, আবর্জনা বহিষ্কৃত করিয়া ঘর পরিষ্কার (বা পরিষ্কৃত) করা কর্তব্য। বস্তুতঃ সংস্কৃত অসংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ যে-কোন শব্দ পাইলেই 'করা' ক্রিয়া আগমন করিয়া পাশে আসন করিয়া বসে।

এক স্থলে শ্রীশ্রীনাথ-সেন মহাশয়ের 'ভাষাতত্ত্বের' অনুমানের সমালোচনা করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, সকল স্থলে ইহাদের মত স্বীকার করিতে পারি নাই।

* মধুসূদনের সৃষ্টির প্রধান দোষ, তিনি নামধাতু প্রয়োগের বাঙ্গালা রীতি মানেন নাই। সংস্কৃত ধাতু লইয়া তিনি এই দোষ অনায়াসে পরিহার করিতে পারিতেন। (কর্মকারকের বিভক্তি দেখ)।

'করা' না লাগাইয়া কেবল মূল ধাতু লইয়া থাকিতে হইলে বাঙ্গালাভাষার নির্বাহ হইত না। তথাপি, 'করার' অত্যধিক আদর করতঃ বাঙ্গালা ভাষার দৈন্য ঘোষণা উচিত বোধ হয় না। যাঁহার লেখায় সংস্কৃত শব্দ যত, তাঁহার 'করা'র ভরসা তত। কবি 'করার' হাত অনেকটা এড়াইয়া থাকেন। নামধাতুর প্রয়োগ যদি বাঙ্গালা ভাষার রীতি-বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে গদ্যলেখকেরাও 'করা' লইয়া টানাটানি কিছু কমাইতে পারেন।

প্রয়োজক ধাতু।

৷/০ সামান্য ধাতু ও নাম ধাতু ব্যতীত প্রয়োজক ধাতু আছে। ণিজন্ত বলিব কি প্রয়োজক বলিব, সে তর্কে এখন প্রয়োজন নাই। দেখা যায়, অল্প কয়েকটি সামান্য ধাতুর অকর্মক সকর্মক দুইরূপ আছে, অধিকাংশ সামান্য ধাতুর প্রয়োজক রূপ আছে, এবং অধিকাংশ নাম ধাতুর নাই। যে যে ধাতুর অকর্মক সকর্মক দুই রূপ আছে, সে সে ধাতুর অকর্মক রূপের আদিস্থিত অ স্থানে সকর্মক রূপে আ আসে। যথা ফল পড়ে, ফল পাড়ি; কাঠ জ্বলে, কাঠ জ্বালি; আমি চলি, গুটী চালি। ধাতুর উত্তর আ করিলে প্রয়োজক রূপ পাওয়া যায়। যথা, আমি কাজ করি, তাহাকে কাজ করাই। অর্থাৎ সকর্মক সামান্য ধাতু আন্ত করিলে দ্বিকর্মক হয়। অকর্মক ধাতু আন্ত করিলে সকর্মক হয়। যথা, আমি হাসি, তাহাকে হাসাই। সং-প্রাকৃতে আ আসিত। যথা, সং দর্শয়তি, সংপ্রা° দিখাবই, বা° দিখাই—দেখায়। এক অক্ষরের ধাতু আন্ত করিলে ধাতুর ই স্থানে এ, উ স্থানে ও হয়। যথা, আমি দিই, আমি দেআই; আমি শুই, আমি শোআই। ধাতু দুই অক্ষরের এবং শেষ অক্ষর হলন্ত হইলেও প্রথম অক্ষরের ই উকারের গুণ হয়। যথা, আমি চিনি, তাকে চেনাই; ফুল ফুটিয়াছে, আমি ফোটাইয়াছি। আকারান্ত এক অক্ষরের ধাতুর উত্তরও আ হয়। যথা, আমি খাই, তাকে খাআ-ই; আমি যাই, তাকে যাআ-ই। আমরা খাওয়া, যাওয়া লিখি বটে; কিন্তু খাআ, যাআ শুনি না, এমন নহে। মৈথিলীতে খাআ, ওড়িয়াতে খআ। বা°তে (অন্ততঃ রাঢ়ে) খাআন্ (ভোজন) আছে। বর্তমান বাঙ্গালা উচ্চারণে খা-আ মিশিয়া খা হইতে পারে; এই আশঙ্কায় খা এবং আ মাঝে ও স্বর বসিয়াছে।* অধিকাংশ নামধাতু আকারান্ত। নামধাতুর প্রয়োজক রূপ প্রায় হয় না। পূর্বে বলা গিয়াছে, দ্বিরুক্ত-ধাতু নাম-ধাতুর তুল্য। বলা বাহুল্য, দ্বিরুক্ত ধাতুরও প্রয়োজক রূপ নাই। হওয়া করা প্রভৃতি ক্রিয়া-যোগে নামধাতু বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। যথা, মোটা হওয়া মোটানা, কম করা কমানা। অনেক নামধাতু প্রায়ই ইয়া প্রত্যয়ান্ত রূপে দেখিতে পাই। ল-কার রূপে ইহাদের প্রয়োগ নাই। যথা, আম তুবড়াইয়া গিয়াছে, বাঁশ মচ্‌কাইয়া গিয়াছে। প্রয়োগ-বাহুল্যে নাম-ধাতু সামান্য-ধাতুতে পরিণত হয়। যথা, দই টকিয়া গিয়াছে টকিয়াছে; সে গাড়িয়া ফেলিবে গাড়িবে; সে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। বোধ হয় প্রয়োগ-বাহুল্যে কয়েকটি নামধাতুর প্রয়োজক রূপ ঘটিয়াছে। যথা, গাছ

---

* খাবা, যাবা ইত্যাদি রূপ হইতে খাওয়া, যাওয়া আসিয়াছে। তু° ও° খাইবা, যিবা। (পরে দেখ)

জন্মে, সে গাছ জন্মায়;* সে খেলা জিতিয়াছে, তাহাকে জিতাইয়াছে। প্রয়োজক রূপেও ধাতু আকারান্ত হয়; কিন্তু, প্রথম স্বর ই-উকারের গুণ কিংবা অন্য পরিবর্তন হয় না। সাধারণতঃ নামধাতুর স্বাভাবিক রূপ সামান্য ধাতুর আদ্য রূপের তুল্য। তথাপি, সকল স্থলে সামান্য ধাতু হইতে নামধাতু পৃথক করা সহজ নহে। পরে নামধাতুর আর দুই একটা লক্ষণ পাওয়া যাইবে।

।৵০ সে সকল অকর্মক ধাতুর প্রয়োজক রূপ হয় না, সে সকল ধাতু হইতে বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ শব্দ লইয়া 'করা' ধাতু যোগ করিতে হয়। যথা, আমি দাঁড়াইয়াছি (নামধাতু), তাহাকে দাঁড় করাইয়াছি; মাছ লাফায় (সামান্য ধাতু), মাছ লাফানা করায়, লাফ করায়, লাফ দেওয়ায়। এ সকল স্থলে দাঁড়-করা, লাফ করা বা লাফ-দেওয়া ধাতু মনে করা চলে। লাফানা-করা, তাকানা-করা ইত্যাদিও হয়। আমি বসিয়াছি, তাহাকে বসাইয়াছি, তাহাকে বৈস বা বসা করাইয়াছি; আমি শুইয়াছি, তাহাকে শোআইয়াছি, শোআ করাইয়াছি,—ইত্যাদি উদাহরণে বসানা এবং বৈস-করানা, শোআনা এবং শোআ-করানা অর্থে ঠিক এক নহে। করা ধাতু যোগে বল প্রয়োগ প্রকাশ হয়।

।৶০ ক্রিয়াপদের কতটুকু ধাতু এবং কতটুকু বিভক্তি, তাহা নিশ্চয় করিবার সাধারণ নিয়ম বলা যাইতেছে। উত্তম পুরুষে বর্তমান কালের ধাতুরূপ হইতে শেষের ই বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা ধাতু। শব্দকোষে এইরূপ দেওয়া গিয়াছে। যথা, আমি হ-ই, হআ-ই; লই, লআ-ই; শুই, শোআ-ই; কর্-ই করা-ই; শিখ্-ই, শেখা-ই; দাঁড়া-ই, তাকা-ই, পশতা-ই, ইত্যাদি। কথিত ভাষায় কই, সই, বই, রই, চাই, ইত্যাদি হয়, লিখিত ভাষায় কহি, সহি, বহি, রহি, চাহি। ইহাদের ব্যুৎপত্তি দেখিলে সকল স্থলে হ না আনিলেও চলিতে পারে। সং লভ ধাতু হইতে বাং লহ বা ল ধাতু আসিয়াছে। যদিও লহি, লহিয়া হয় না, লহনা আছে। তিনি লহেন—লয়েন, বস্তুতঃ লএন। অতএব কহ্, সহ্, বহ্, রহ্, চাহ্, লহ্, রূপ নৈয়মিক ভাষার, এবং ক স ব র চা ল রূপ সাধারণ ভাষার ধাতু মনে করা যাইতে পারে। এই বিভাগের কারণ ধাতুরূপ করিবার সময় পাওয়া যাইবে। ধাতুরূপে, ন নই বলিয়া নিস্তার পায় না। পদ্যে নই নহি, গদ্যে নহে নহেন আছে। সং নী ধাতু হইতে বাং নি ধাতু নেআ বা নেওয়া। নী ধাতু প্রাপণে। লভ ধাতু লাভে। বাং নি ও ল ধাতুর প্রভেদ লোপ পাইয়াছে। উভয় ধাতুর অর্থ, গ্রহণ দাঁড়াইয়াছে। ন স্থানে ল, এবং ল স্থানে ন করিবার অভ্যাসে ঐ দুই ধাতু অভিন্ন বোধ হইয়াছে, কিন্তু ক্রিয়াপদে ভিন্ন আছে। আমি নি-ই, ল-ই; নেআ বা নেওয়া, লআ বা লওয়া। তাকে ধরিয়া নিয়াছে, আমি টাকা লইয়াছি, সে লয় নাই। যাহা হউক, ধাতু দুইটি পৃথক রাখায় লাভ আছে।

ধাতু নির্ণয়।

---

* সং জন্ম হইতে বাং জন্মা ধাতু। এই হেতু অনেকে বলে, দেশে কাপাস ভাল জন্মায় না—জন্মে না। প্রয়োজক ধাতু আবশ্যক বলিয়া জন্ম সামান্য ধাতু হইয়াছে।

লহনা-পাঅনা যদিও নেনা-দেনা নহে, হিন্দী লেনা থাকাতে গ্রাম্য লোককে প্রভেদ-প্রদর্শন কঠিন। হিন্দীতে লেনা একা আছে। ওড়িয়াতে লবা নেবা একই অর্থ পাইয়াছে, নেবা বেশী শুনিতে পাই। মরাঠীতে ঐ দুই ধাতুর বালাই নাই, ঘেণেঁ (সং গ্রহণ) করিয়াছে। ওড়িয়াও ঘেণিবা রাখিয়াছে, সুতরাং আবার নেবা না রাখিয়া লবা রাখিলে ভাল করিত। ওড়িয়া যা ধাতু ও গ (সং গম) ধাতু আসামী ও বাঙ্গালা যা ও গি (সং গম) ধাতুর মতন ভাগাভাগি করিয়া ক্রিয়া পদ সাধিত করে। ওড়িয়া পদ্যে গমিল্যা পর্যন্ত আছে, বাং গেল করিয়াছে। প্রাচীন বাং গোঁয়ানা—গমিত করানা। বাঙ্গালা ও ওড়িয়া আস্ ধাতু (আগমনে) কোথায় পাইল? সং আ-য়া ধাতু মিশাইয়া হিন্দী আ আগমনে, এবং সং যা হইতে জা গমনে করিয়াছে। মরাঠীতেও সং য়া হইতে যে ধাতু আগমনে এবং যেই সং যা হইতে জা ধাতু গমনে আছে। বাঙ্গালা ও ওড়িয়াতেও সেই রূপ। শূন্য পুরাণে, কৃত্তিবাসে এবং বাঙ্গালা ও ওড়িয়া প্রাকৃতে আইলা; আসিলা বা আসিল নহে। বলা বাহুল্য, আইলা = আয়িলা, অর্থাৎ আ-য়া ধাতু। বোধ হয়, আইলা কে আহিলা মনে করিয়া হ স্থানে স দাঁড়াইয়াছে। আসামীতে আহিলা আছে। তুমি আ-য়াহ, আহ—আস, কিংবা আয়াহ-আয়িহ-আয়িস-আইস, সং আয়াহি। ঢাকায় আইস কিংবা রাঢ়ের এস নহে, আহ। আসামীতে আহ ধাতু। সং অস ধাতু হইতে মরাঠীতে অসে এবং আহে ধাতু হইয়াছে। অর্থাৎ হ স্থানে স এবং স স্থানে হ হইয়াছে (৩৭সূঃ)।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ধাতুর মূল খুঁজিলে প্রায় সকল ধাতুর সংস্কৃত মূল পাওয়া যায়। শব্দ-কোষে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

৭৭। ধাতুর বিভক্তি।

/০ লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে ক্রিয়াপদে যত প্রভেদ আছে, ভাষার অন্য অংশে তত নাই। কথিত ভাষার ক্রিয়াপদ ছোট, লিখিত ভাষার বড়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কথিত ভাষার ক্রিয়াপদ এক নহে, কিন্তু লিখিত ভাষার এক। পরে দেখা যাইবে, লিখিত ভাষার ক্রিয়াপদ-সাধন অতি সহজ, এবং দুই এক স্থান ব্যতীত কথিত ভাষার ক্রিয়াপদের প্রভেদ অধিক নহে।

বিভক্তির নামকরণ।

৵০ প্রথমে লিখিত ভাষার ধাতুর বিভক্তি একত্র করা যাউক। এখানে সংজ্ঞা আবশ্যক। সংস্কৃত ব্যাকরণের লটলোটাদি সংজ্ঞা বাঙ্গালায় ঠিক হইবে না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান অনুজ্ঞাদি নামে বিভক্তি-ভাগও যুক্তি-সঙ্গত হইবে না, কারণ বিভক্তি দ্বারা কাল ও অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইলেও অর্থভেদে কালের ভেদ হয়। দুই একটী বিভক্তি ব্যতীত সকলের দ্বারা পুরুষজ্ঞান হয়। বাঙ্গালায় একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি এক। শব্দের বিভক্তি দ্বারাও একবচন বহুবচন জ্ঞান হয় না। অন্যত্র কারকজ্ঞানও ঠিক হয় না (কারক দেখ)। এই হেতু সংস্কৃতে শব্দের

বিভক্তি প্রথমা দ্বিতীয়াদি নামে উক্ত হইয়াছে, এবং ধাতুর বিভক্তি বর্ত্তমান অতীতাদি নামের পরিবর্ত্তে লটলোটাদি নাম পাইয়াছে।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে নূতন নাম আবশ্যক। কাল-জ্ঞান কিছু কিছু হয় বলিয়া কাল শব্দের ল লইয়া উত্তম পুরুষের বিভক্তি জুড়িয়া নূতন নাম করা যাইতেছে। ব্যাকরণবিৎ সংজ্ঞার দোষ না ধরিয়া উদ্দেশ্য বিচার করিবেন। করি—লি, করিলাম—লিমু, করিতাম—লিতুম, করিব—লিবু, করিয়াছি—লিছি, করিয়াছিলাম—লিছিমু, করিতেছি—লিতেছি, করিতেছিলাম—লিতেছিমু। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার নিমিত্ত লুক ও লিস। পরে এই সকল লকারের অর্থ দেওয়া যাইবে।

ধাতুর গণভাগ। ৶০ বিভক্তি বিচার করিলে বাঙ্গালা ধাতু নিম্নলিখিত গণে ভাগ করা চলে।

১। করাদিগণ। কর্ বল্ কাট্ মার্ খেল্ ইত্যাদি যে সকল ধাতুতে দুই বা অধিক অক্ষর আছে, এবং যাহাদের প্রথম বর্ণে অ আ এ কিংবা ও আছে।

২। খাদিগণ। খা, গা, পা ইত্যাদি এক-অক্ষর-জাত আকারান্ত ধাতু।

৩। গালাদি গণ। গালা, করা, চালা ইত্যাদি দুই বা অধিক অক্ষরজাত আকারান্ত ধাতু। প্রয়োজক ধাতু এই গণের অন্তর্গত।

৪। চিনাদি গণ। দি, নি, চিন্, ফিঁক্ ইত্যাদি ইকারান্ত এক-অক্ষর-জাত ধাতু, এবং প্রথমবর্ণ ইকারান্ত এমন দুই অক্ষর-জাত ধাতু।

৫। ছুটাদি গণ। ছুঁ, ধু, শু, ছুট্, ফুট্ ইত্যাদি উকারান্ত এক-অক্ষর-জাত ধাতু, এবং প্রথম বর্ণ উকারান্ত এমন দুই অক্ষর জাত ধাতু।

৬। হাদিগণ। হ, ল, র ইত্যাদি অকারান্ত এক-অক্ষর-জাত ধাতু।

৭। নাম ধাতু।

।০ লিখিত রূপ।

কর্ ধাতু।

	লি	লিমু	লিতুম	লিবু	লুক	লিস
আমি	করি	করিলাম	করিতাম	করিবু	করি	করিব
তুমি	কর	করিলে	করিতে	করিবে	কর	করিও
তুই	করিস	করিলি	করিতিস	করিবি	কর	করিস
তিনি	করেন	করিলেন	করিতেন	করিবেন	করুন	করিবেন
সে	করে	করিল	করিত	করিবে	করুক	করিবে

বিভক্তি-যোগে এই কয়েকটি ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়। অন্যান্য ক্রিয়ারূপ পাইতে হইলে অন্য ক্রিয়া যোগ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে আছ্ ধাতু প্রধান। আছ্ ধাতু একা সব ক্রিয়ারূপে

থাকে না, থাক্ ধাতুও আবশ্যক হয়। * আছ্ ও থাক্ ধাতুর স্বাতন্ত্র্যও আছে। থাক্ ধাতুর রূপ কর্ ধাতুর তুল্য।

।/০ আছ্ ধাতু।

	লি	লিমু
আমি	আছি	আ) ছিলাম
তুমি	আছ	আ) ছিলে
তুই	আছিস	আ) ছিলি
তিনি	আছেন	আ) ছিলেন
সে	আছে	আ) ছিল্

স্বতন্ত্র প্রয়োগে ছিলাম, অন্য ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে আছিলাম। মৈথিলীতে আছ ধাতু রূপের আদ্য আ প্রায়ই থাকে না। আমাদের কথিত ভাষাতেও থাকে না। আমরা বলি করিছি, করেছিলাম।

।৵০ আছ্ ধাতু যোগে কর্ ধাতুর অন্য পদ।

	লিছি	লিছিমু	লিতেছি	লিতেছিমু
আমি	করি-আছি	করি-আছিলাম	করিতে (আ) ছি	করিতে-ছিলাম
তুমি	করি-আছ্	করি-আছিলে	করিতে (আ) ছ্	করিতে-ছিলে
তুই	করি-আছিস	করি-আছিলি	করিতে (আ) ছিস	করিতে-ছিলি
তিনি	করি-আছেন	করি-আছিলেন	করিতে-(আ) ছেন	করিতে-ছিলেন
সে	করি-আছে	করি-আছিল্	করিতে (আ) ছে	করিতে-ছিল

।৵০ কথিত রূপ (রাঢ়ের)।

কর্ ধাতু।

	লি	লিমু	লিতুম	লিবু	লুক	লিস
আমি	করি	কর্লাম	কর্তাম	কর্ব্	করি	কর্ব্
তুমি	কর্	কর্লে	কর্তে	কর্বে	কর্	করিঅ
তুই	করিস	কর্লি	কর্তিস	কর্বি	কর	করিস
তিনি	করেন	কর্লেন	কর্তেন	কর্বেন	করুন	কর্বেন
সে	করে	কর্লে	কর্ত্	কর্বে	করুক	কর্বে

* অন্যান্য ভাষাতেও আছ ধাতু অসম্পূর্ণ; থাক ধাতু এবং হ ধাতু লইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। যথা,

	বাঙ্গালা	আসামী	মৈথিলী	ওড়িয়া	হিন্দী	মরাঠী
সে	আছে	আছে	অছি	অছি	হৈ	আহে, অসতো (প্রাচীন, অসে)
	ছিল	আছিল	ছল	থিলা	থা	হোতা, অসে

মরাঠীতে সং অস ধাতু হইতে অস এবং আহে দুই ধাতু হইয়াছে।

	লিছি	লিছিনু	লিতেছি	লিতেছিনু
আমি	করেছি	করেছিলাম	কর্‌চি	কর্‌ছিলাম
তুমি	করেছ	করেছিলে	কর্‌চ	কর্‌ছিলে
তুই	করেছিস	করেছিলি	কর্‌চিস	কর্‌ছিলি
তিনি	করেছেন	করেছিলেন	কর্‌চেন	কর্‌ছিলেন
সে	করেছে	করেছিল	কর্‌চে	কর্‌ছিল

অনন্তরার্থে কর্ ধাতুর উত্তর ই ইয়া করিলে 'করি' কিংবা 'করিয়া'। পদ্যে কথন কথন করি। প্রাচীন বাঙ্গালা ও হিন্দীতে এবং বর্তমান ওড়িয়াতে, করি। আমি কাজ করি-(কিংবা করিয়া-) আছি ; করিতে-আছি বা করিতেছি।

॥৹ এখন লিখিত ও কথিত রূপের তুলনা করা যাউক। রাঢ়ে শব্দের উচ্চারণ-নিয়মে পরে ই থাকিলে পূর্ব অকার ঈষৎ ও হয়। কর্‌লাম, কর্‌তাম, কর্‌ব, করেছি ইত্যাদির উচ্চারণমতন বানান হয় নাই। করিলাম-কর্‌লাম-কোল্লাম। এইরূপ, কোর্তাম কোর্ব। করিয়াছি—করেছে নহে ; বরং করেছি বা ক'রেছি। ই+আ=য়া হয়। করি-আছি—কর্যাছি। তুমি করিঅ, ইহাই শুদ্ধ। করিও আধুনিক, এবং সকলে করিও বলে না। বিদ্যাপতি ও কৃত্তিবাসে অ হ। কৃত্তিবাসে কোথাও কোথাও য় আছে। যথা, চালাহ, যাইহ, যাহ, দিয়। দিয় বাস্তবিক দিঅ। শূন্য-পুরাণে করহ, দেহ ইত্যাদি। ওড়িয়াতে দিঅ, আসামীতে দিয়। করিয়া, সংক্ষেপে কর্যা। কৃত্তিবাসে হৈয়া, ধর্যা, লৈয়া। কবিকঙ্কণে রান্ধ্যা, বাড়্যা। মাণিকরামে ভেস্যা, চড়্যা, কর্যা, বল্যা। করিয়া স্থলে করে, ভাসিয়া স্থলে ভেসে লিখিলে উচ্চারণ ঠিক প্রকাশ হয় না। অধিকাংশ শব্দের কোথাও না কোথাও বল দিতে হয়, নতুবা অর্থবোধ হয় না। বানানে তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে না পারিলে বানানের উদ্দেশ্য বৃথা হয়। ভাষার শব্দ বাস্তবিক শব্দমাত্র। কাগজে রঙ্গা লিপিয়া সে শব্দ জানানার নাম বানান। পূর্বে এ বিষয় পুনঃ পুনঃ বলা গিয়াছে। তথাপি মূল কথা মাঝে মাঝে মনে করা ভাল।

(পার্শ্বটীকা: ক্রিয়াপদের লিখিত ও কথিত রূপ।)

॥/৹ এখন লিখিত ও কথিত বিভক্তি পৃথক করিলে,

লিখিত ভাষার বিভক্তি।

	লি	লিনু	লিতুম	লিবু	লুক	লিস
আমি	ই	ইলাম	ইতাম	ইব	ই	ইব
তুমি	অ	ইলে	ইতে	ইবে	অ	ইঅ
তুই	ইস	ইলি	ইতিস	ইবি	—	ইস
তিনি	এন	ইলেন	ইতেন	ইবেন	উন	ইবেন
সে	এ	ইল	ইত	ইবে	উক	ইবে

	লিছি	লিছিনু	লিতেছি	লিতেছিনু
আমি	ইয়াছি	ইয়াছিলাম	ইতেছি	ইতেছিলাম
তুমি	ইয়াছ	ইয়াছিলে	ইতেছ	ইতেছিলে
তুই	ইয়াছিস	ইয়াছিলি	ইতেছিস	ইতেছিলি
তিনি	ইয়াছেন	ইয়াছিলেন	ইতেছেন	ইতেছিলেন
সে	ইয়াছে	ইয়াছিল	ইতেছে	ইতেছিল

কথিত ভাষার বিভক্তি।

	লি	লিনু	লিতুম	লিবু	লুক	লিস
আমি	ই	লাম	তাম	ব	ই	ব
তুমি	অ	লে	তে	বে	অ	ও
তুই	ইস	লি	তিস	বি	—	ইস
তিনি	এন	লেন	তেন	বেন	উন	বেন
সে	এ	ল, লে	ত	বে	উক	বে

	লিছি	লিছিনু	লিতেছি	লিতেছিনু
আমি	য়াছি	য়াছিলাম	চি	ছিলাম
তুমি	য়াছ	য়াছিলে	চ	ছিলে
তুই	য়াছিস	য়াছিলি	চিস	ছিলি
তিনি	য়াছেন	য়াছিলেন	চেন	ছিলেন
সে	য়াছে	য়াছিল	চে	ছিল

দেখা যাইতেছে, লি ও লুকে লিখিত ও কথিত রূপ এক। লিছি ও লিছিনু-তে কথিত য়া, লিখিত ইয়া হইয়াছে। সুতরাং এক বলা যাইতে পারে। লিনু লিতুম লিবু-তে কথিত ভাষায় ই লোপ, লিখিত ভাষায় যোগ, এই প্রভেদ। লিতেছি ও লিতেছিনু-তে কথিত ও লিখিতরূপে অত্যন্ত প্রভেদ ঘটিয়াছে। লিখিত রূপ ঐ দুই লকারের মূল দেখায়; কথিত রূপ মূলে না গিয়া বিভক্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষার ক্রম-বিকাশ এবং বিভক্তি প্রত্যয়ের সৃষ্টি এই প্রকারেই হয়। লিখিত ভাষা বলে, 'শুনিবার লোক আছে তুমি বলিয়া যাও, আমি শুনিতেছি; কথিত ভাষা বলে, 'শুনবার লোক আছে তুমি বল্যে যাও আমি শুনচি।' অর্থাৎ স্বরবর্ণ ও ত-কারের লোপ। এইরূপ বর্ণই লুপ্ত হইয়া থাকে। কবি মধুসূদন তে লোপ করিয়া লিখিয়াছেন, চলিছে ধাইছে কাঁদিছে। আসামীতেও তে লুপ্ত হইয়াছে।

॥৶৹ অন্ত গণের ধাতু লইয়া দেখা যাউক। খা ধাতুর উত্তর ই ইলাম ইত্যাদি বসাইয়া গেলে লিখিত রূপ পাওয়া যাইবে। **বস্তুতঃ দুই একটা ধাতু ভিন্ন সমুদায় ধাতুতে দশ লকারের বিভক্তি যোগ করিলে ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়।** ইহাকে লিখিত

ভাষার বিশেষ গুণ বলিতে পারা যায়। শব্দের সংক্ষেপ এবং উচ্চারণের সুখের দিকেই কথিত ভাষার টান। তথাপি, আশ্চর্যের কথা, কথিত ভাষা নিয়ম মানিয়া চলে। সে নিয়ম কেহ লিখিয়া দেখায় না। আপামর সকলেই সে নিয়ম জানে, নিয়ম মানে। (রাঢ়ে) আমি খাই খেলাম খেতাম খাব খেয়েছি খেয়েছিলাম খাচ্চি খাচ্ছিলাম। তুই খাস, তিনি খান, সে খাএ খাক। তুমি খাঅ। কেহ কেহ বলে, খাও; অর্থাৎ অকারকে ঈষৎ ওকার করে। সে খায় এরূপ উচ্চারণ নহে, সে খাএ (এ হ্রস্ব)। য়বর্ণের উচ্চারণ ভুলিয়া আমরা লিখি খায়। দেখা যাইতেছে, কথিত ও লিখিত ভাষায় লি ও লুক-তে প্রভেদ নাই। খা+ইলাম=খেলাম— সন্ধি হইয়াছে। সেইরূপ, খেতাম। রাঢ়ে বাস্তবিক খেলাম খেতাম নহে, বরং খেলেম খেতেম। চণ্ডীদাসে যেতেম, পেতেম। খালাম, খাতাম—পরে পরে দুই আ থাকাতে আ স্থানে এ হয় (২৫ সূ:)। তাই খেলেম খেতেম। (খেলুম, খেনু, খেতুম, পরে দেখা যাইবে)। খায়াছি, অবশ্য খা-আছি নহে। খায়াছি—খেয়েছি। খাচ্চি, খাচ্ছিলাম এখানে এক একটি অতিরিক্ত চ আসিয়া জানাইতেছে যে একটি বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে, তাই দ্বিত্ব। এ স্থলে সে বর্ণটি ত্, যাহা চ হইতে পারে। খাত্চি—খাচ্চি, খাত্ছিলাম খাচ্ছিলাম। কর্চি শুন্চি ইত্যাদি স্থলে র্চি, ন্চি সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকাতে লুপ্তবর্ণ দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। ভাষার একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন অক্ষর উচ্চারণে লুপ্ত হইলে তাহা পূর্ব (কিংবা পরবর্ণ) দীর্ঘ স্বরিত করিয়া লোপ জানাইয়া দেয়। ইহার বহু দৃষ্টান্ত নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। (তু° বারহ—বার (১২); (ক্রিয়া) করহ—কর)। কৃত্তিবাসে যাতে (যাইতে), আসেছে, পাড়েছে, বান্ধাছে ইত্যাদি পদের প্রথম আ-কার এ হয় নাই। কবিকঙ্কণে কিছু কিছু একার আসিয়াছে, মাণিকে অধিক আসিয়াছে। এই এক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই বুঝিয়াছি যে, যদি কবিকঙ্কণের পাঠ শুদ্ধ করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি কৃত্তিবাসের পরে ছিলেন, মাণিকরাম আরও পরে। পূর্বকালে যে সকল বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ ওড়িশায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহাঁদের বর্তমান বংশধরেরা এখনও পূর্বের মতন খা-তে যা-তে বলেন, খেতে যেতে বলিতে শেখেন নাই এবং সহজে শিখিতে পারেন না। সজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে নূতন স্থানে জীবজাতি বহুকাল পর্যন্ত প্রাচীন ভাব রক্ষা করে।

আস্ ধাতু কথিত ভাষায় কোন কোন লকারে আ হয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে ধাতুটি আ। তুমি আইস্—এস্; তুই আসিস্, আএ; তিনি আসেন, আসুন; সে আসে আসুক। আমি আস্লাম, আইলাম—এলাম; আস্তাছি—এসেছি, আইয়াছি—এয়েছি; আস্চি, আস্ছিলাম।

যা ধাতু লিঙ্-তে গা, এবং লিছি ও লিছিস্-তে গি হয়। গা ধাতুর রূপ খা ধাতুর তুল্য। গেলাম, যেমন খেলাম। গি ধাতু দি ধাতুর তুল্য। দিয়াছি—গিয়াছি, দিয়াছিলাম—গিয়াছিলাম। লিছি ও লিছিস্-তেও গা হইয়া গেয়েছি, গেয়েছিলাম। গেয়েছি—সংক্ষেপে গেছি। গেছিলাম—গেয়েছিলাম, গেছলাম।

৷৶৹ গালা-আদি দুই কিংবা অধিক অক্ষরজাত আকারান্ত ধাতুর রূপ খাদি-গণীয় তুল্য। প্রভেদ এই, কোনও লকারে ধাতু নিজের রূপ ছাড়ে না। পাঠা ধাতু দেখা যাউক। পাঠাই, পাঠালাম, পাঠাতাম, পাঠাব। লিখিত ভাষায় পাঠাইয়াছি, পাঠাইতেছি; কথিত ভাষায় স্থানভেদে রূপের প্রভেদ হইয়াছে। রাঢ়ে পাঠিএছি, পাঠাচ্চি। কোন্ কোন্ স্থানে পাঠাইছি, পাটিইচি। পাঠা+য়াছি—পাঠায়াছি; যেমন খায়াছি। খায়াছি—খেয়েছি; তেমনই পাঠায়াছি—পাঠেয়েছি। য়া স্থানে এ হয়, কদাচিৎ ই। বোধ হয়, পাঠায়েছি ভাষার নিয়ম-সঙ্গত। সাধুভাষায় পাঠায়াছি লেখা চলে। বলা বাহুল্য, পাঠায়াছি বস্তুতঃ উচ্চারণে পাঠাইআছি।

৸৹ চিনাদি-গণীয় ধাতুর লি ও লুকলিসের কোন্ কোন্ বিভক্তিতে ধাতুর ই স্থানে এ হয়। (রাঢ়ে) লিতে আমি দি-ই, তুমি দাঅ, তুই দিস, তিনি দেন, সে দেয়। লুকে আমি দি-ই, তুমি দিঅ (বা দিও), তুই দে, তিনি দিন, সে দিক। তুমি দাঅ, কোথাও দ্যাও, কোথাও দেও। বোধ হয়, প্রথমে দি হইতে দে, পরে দ্যা শেষে দা হইয়াছে। অতএব দেঅ বা দেও করিলে সব দিক রক্ষা হয়। এইরূপ, নেঅ বা নেও, চেন্, শেখ্, লেখ্। তিনি দেন, নেন, চেনেন, শেখেন, লেখেন। মূল আকার দিন, নিন ইত্যাদি। দিন নিন বস্তুতঃ দিএন, নিএন; যেমন খাএন যাএন করেন। দিএন, নিএন সংক্ষেপে দেন, নেন। লোকে কেনে, পসারী বেচে, নেয় দেয় ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসে দেও, বেচে, কেনে। কবি-কঙ্কণেও তাই। শূন্য পুরাণে দেএ (দেয়)। অতএব অন্ততঃ তিন চারি শত বৎসর হইতে ধাতুর ই স্থানে এ বসাইবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গের অনেক স্থানে তিনি শিখেন, লিখেন, নিন ইত্যাদি। কিন্তু এই ই অধিক দিন রাখা কঠিন হইবে। হএন, করেন, ইত্যাদির শেষের এন যেমন আসিয়াছে, তেমনই দেন নেন প্রভৃতি পদও আসিয়াছে। এইরূপ ছুটাদিগণীয় ধাতুর উকার ও হইতেছে। * (১৩১৮ সালের ভাদ্রমাসের প্রবাসী দেখ)

৸৶৹ বস্তুতঃ ছুটাদিগণীয় ধাতুর লি ও লুকলিসে কিছু প্রভেদ আছে। কথিত ভাষায়, তুমি শোঅ, তুই শুস শো, তিনি শোন, সে শোএ (বা শোয়) শুক। বোধ হয়, তুমি শোঅ বা শোও, তিনি শুউন, সে শোএ বা শোয় লেখা ভাল। তুই শুস শো, সে শুউক। তুমি ধোঅ, তিনি ধুউন্, সে ধোএ বা ধোয়, তুই ধুস ধো, সে ধুউক। তুমি বোঝ, তিনি বুঝুন, সে বোঝে, তুই বুঝিস বোঝ, সে বুঝুক। সে শুএ ধুএ বুঝে কদাচিৎ শুনিতে পাই। এ স্থানে য় লেখাতে পূর্ব উকার ও উচ্চারিত হয়। শুইয়া রাঢ়ে শুয়ে; যেমন পেয়ে খেয়ে। বঙ্গের বহুস্থানে শুয়া, পায়া, খায়া। অতএব শুয়াছি, শুচ্চি লিখিলে চলে। (তুং পাঠায়াছি)

---

* কবি মধুসূদন ই উ না লিখিয়া প্রায়ই এ ও লিখিয়াছেন। যথা, ডোবে শোকসাগরে, কেহ শোষে রক্ত স্রোতে, সেখানে ফোটে এফুল, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী, খোলে তাহে অসিবর, কে ছেঁড়ে পদের পর্দ; খোলে আঁখি, ইত্যাদি।

৮৮/০ হাদি-গণীয় ধাতুর মধ্যে হ, ন, এবং কথিত ভাষায় ব, র, স ইত্যাদি ধাতু। তুমি হঅ (বা হও), তুই হস হ, তিনি হএন হন হউন, সে হএ (বা হয়) হউক। হয়াছি, হচ্ছি। লয়াছি লচ্ছি। এই এই রূপ ভাল বোধ হয় না। কারণ, লতে, ললে ভাল শোনায় না, লইতে লইলে পদের মাঝের ই লোপ করিতে হইলে লোপ-চিহ্ন দেওয়া উচিত। ন ধাতু (নাই) হইতে তুমি নঅ (বা নও), তুই ন'স নয়, তিনি নন নএন, সে নএ (বা নয়)। (বাতাস বএ, না বাতাস বয়? কোন্‌টা উচ্চারণের কাছে যায়? উপরে যেখানে যেখানে প্রচলিত বানানের ও য় স্থানে অ এ লেখা গিয়াছে, সেখানে সেখানে উচ্চারণের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিয়াছি, ধাতুর বিভক্তির মূল রূপ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।) ল ধাতু হইতে তুমি লঅ লও, তুই লইস বা ল'স ল, তিনি লএন লন লউন, সে লএ বা লয়, লউক। তুই ল, শুনিতে নূতন ঠেকিতেছে। কারণ ইহার পরিবর্তে নি ধাতুর নে প্রচলিত আছে। (রাঢ়ে) কথিত ভাষায় ল ধাতুর প্রয়োগ প্রায় শোনা যায় না।

৮৮/০ নিষেধার্থক না পরে থাকিলে ধাতুর লিছি ও লিছিনু-র লিখিত ভাষায় আছি ও ছিলাম, এবং কথিত ভাষায় ছি ও ছিলাম বিভক্তির লোপ হয়, এবং না স্থানে নাই হয়। করিয়াছি না—করি-নাই, করিয়াছিলাম না—করি-নাই; গিয়াছিলাম না—যাই-নাই; করাইয়াছিলাম-না—করাই-নাই। বঙ্গদেশের পূর্বাংশে এই এই সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত নাই।

৯\ পার্ ধাতুর সহিত না যুক্ত হইয়া না-পার্ ধাতুর প লোপে নার্ ধাতু। নারি, নারিব ইত্যাদি পদ কোন কোন স্থানে চলিত আছে। পদ্যে নারিলা, নারিনু আছে।

৯/০ রহ্ বা র ধাতু অসম্পূর্ণ। বর্তমান কাল ব্যতীত অন্য কালে এই ধাতুর প্রয়োগ নাই। ওড়িশা-প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখে কখন কখন রয়েছিলাম, রইব শুনিতে পাই। পূর্বকালে এরূপ প্রয়োগ ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। বর্তমান কালে আমি রই, তুমি রহ, তুই রহিস বা র'স, র, সে রএ বা রয়, রহুক। অন্যান্য পদের স্থানে আছ ও থাক ধাতুর পদ বসে। সং অস্ ধাতু ও সংপ্রাং রহ ধাতু মূলে এক। (বাংতে আর এক রহ ধাতু আছে। তাহা সং রহ ধাতু (ত্যাগে) হইতে আসিয়াছে। শব্দকোষ দেখ।)

৯৵০ বট্ ধাতুও অসম্পূর্ণ। বর্তমান কালে বটি বট বটেন বটে। কদাচিৎ সকল পুরুষেই, বটে। আমি মন্দ বটে অর্থাৎ আমি মন্দ ইহা বটে। বিহারীতেও বট ধাতু আছে। ওড়িয়াতে অট। হিন্দী ও মরাঠীতে নাই। সং বৃত ধাতু বিদ্যমানতা হইতে বট ধাতু। সং বর্ততে বাং বটে। বাং ও আসামীতে বর্ত ধাতুও বর্তমানতা অর্থে আছে।

৯৶০ নামধাতুর শেষ স্বর অনুসারে বিভক্তি লাগে। ধাতুর পরিবর্তন প্রায় হয় না।

নামধাতু। অধিকাংশ নামধাতুর দশ লকারে প্রয়োগ নাই। ভাপ ধাতু (সং বাষ্প হইতে)—সে ভাপে, ভাপেছে বা ভেপেছে, আমি ভাপাই, ভাপালাম, ভাপায়াছি বা ভাপিয়েছি।

১।০ বাঙ্গালা-ব্যাকরণকার ক্রিয়াকে সমাপ্তিকা ও অসমাপিকা এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। সংস্কৃতে অসমাপিকা ক্রিয়া পাই না, ইংরেজীতে পাই। বোধ হয় ইংরেজী হইতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাগ-কল্পনা বাঙ্গালা ব্যাকরণে ঢুকিয়াছে। এবিষয় পরে আলোচনা করা যাইবে। এখানে ইয়া ইতে আতে ইলে প্রত্যয় বলা যাউক। কর্+ইয়া—করিয়া, কথিত ভাষায় সংক্ষেপে ক'র্‌ য়া। ই পরে আ থাকিলে রাঢ়ের নিয়মে আ স্থানে এ উচ্চারিত হয়। এই নিয়মে করিয়া—ক'র্‌ য়া, —কোরে; খাইয়া খেয়ে, যাইয়া যেয়ে বা গিয়ে, হাসিয়া হেসে, ধুইয়া ধুয়ে, হইয়া হয়ে, ইত্যাদি।

ইয়া প্রত্যয়।

১।/০ করিতে—কথিত ভাষায় ক'র্তে কোর্তে কোত্তে। এইরূপ, খাইতে খেতে, যাইতে যেতে, হাসিতে হা'স্‌তে, ধুইতে ধুতে, হইতে হ'তে—হোতে। কিন্তু, গাইতে গেতে, চাইতে চেতে হয় না। তেমনই ক র ব স ল একব্যঞ্জন ধাতুতেও মাঝের ই আবশ্যক হয়। ইহার কারণ, এই সকল ধাতুর পরে একটা হ আছে। ধাতু বাস্তবিক গাহ কহ চাহ রহ বহ সহ লহ। ভাষার এমনই ধারা যে কোন্ বর্ণ সহজে লুপ্ত হইতে দেয় না। যদি কোথাও লুপ্ত হয়, অমনই স্বর দীর্ঘ করিয়া তাহার অস্তিত্ব জানাইতে থাকে। বহুকাল না গেলে সে চিহ্ন লুপ্ত হয় না।

ইতে প্রত্যয়।

১।৵০ করাতে, খাওয়াতে, হাসাতে শোআতে চেনাতে ছোটাতে ইত্যাদি স্থলে লিখিত ও কথিত ভাষার রূপ এক। আতে প্রত্যয় ঠিক নহে, আ-কৃদন্ত শব্দের পরে কারকের তে জুটিয়াছে।

১।৶০ করিলে—কথিত ভাষায় ক'র্লে কোল্লে। খাইলে খেলে, হাসিলে হা'স্‌লে, ধুইলে ধুলে, হইলে হ'লে হোলে। কিন্তু, যাইলে স্থানে গেলে হয়। গাইলে, কইলে, রইলে, লইলে, সইলে, লইলে, নইলে।

ইলে প্রত্যয়।

১॥০ এখন লকারের অর্থ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে। উদাহরণ দিলে অর্থবোধ হইবে।

লকারার্থ।

লি। তিনি বাড়ীতে আছেন—সামান্য বর্তমানে। গ্রীষ্মকালে আম পাকে—নিত্য বর্তমানে। রামমোহন-রায় খানাকূল-কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন—অতীত বর্ণনায়। যদি তিনি আসেন তবে আমি বলিব—ভবিষ্যৎ সংশয়ে। যখন তিনি আসেন তখন বৃষ্টি হইতেছিল—লিতেছিনু থাকাতে অতীতে বর্তমান। যদি তুমি যাও তবে আমি যাই—যাই লুকের পদ বলা যাইতে পারে।

দেখা যাইবে, লি দ্বারা বাস্তবিক বর্তমান কাল বুঝায়। বাক্যে অন্য কালের পদ না থাকিলে লি সে কাল বুঝাইতে পারে না। রামমোহন-রায় জন্মগ্রহণ করেন, এই বাক্যের পূর্বে কিংবা পরে অতীত কালের পদ থাকে বলিয়া লি দ্বারা অতীত কাল সূচীত হয়। সংশয়ার্থ প্রকাশ করিতে হইলে 'যদি' আবশ্যক।

লিতেছি। বৃষ্টি হইতেছে—বর্তমানে অবিরাম ক্রিয়া। একটু দাড়াও, যাইতেছি—ভবিষ্যৎ। পথে আসিতেছি দেখিলাম একটা বাঘ শুইয়া আছে—আসিতেছিলাম দেখিলাম দুইটা লাম পরে পরে না আনিয়া প্রথম ক্রিয়ার লাম তুলিয়া দেওয়া গিয়াছে, ফলে অতীতে।

লিনু। বৃষ্টি হইল—বর্তমানের নিকটবর্তী ভূতকাল। খাইতে না পাইয়া মরিয়া গেলাম—অতিশয়োক্তিতে বর্তমান অর্থে অতীত। কোথায় চলিলে?—কোথায় চলিতেছ—চলা নিশ্চিত। রাম মারুন আর রাবণ মারুক আমি মরিলাম—মরিব, কিন্তু মরণ নিশ্চিত। খাইল না চলিয়া গেল—খাইল না—না যোগে অতীতের অতীত—চলার পূর্বে না খাওয়া। বাঁধা ছিল, খুলিয়া গিয়াছে—ছিল অতীতের অতীত অর্থেও বসে।

লিছি। পত্র লিখিয়াছি এখনও উত্তর আসে নাই—অতীত ক্রিয়ার ফল-সম্ভাবনা। পথে কাদা হইয়াছে— অতীত ক্রিয়ার ফল বর্তমান।

লিছিনু। বলিয়াছিলাম কিন্তু কথা শোনে নাই—অতীতের পূর্বের অতীত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা মাতুলালয়ে বাস করিয়াছিলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বে।

লিতেছিনু। বৃষ্টি হইতেছিল—অতীতকালে অবিরাম ক্রিয়া।

লিতুম। নদীর তীরে একা বেড়াইতাম— অভ্যাসে অতীত। সে কালে চোরকে শূলে দেওয়া হইত—বিধানে অতীত। যদি সে আসিত কি সুখ হইত—সংশয়ার্থে অতীত। (অনুরূপ, সে আসিলে কি সুখ হইত)।

লিবু। বৃষ্টি হইবে—সামান্য ভবিষ্যৎ। যদি তিনি আসিবেন, তবে এমন কেন হবে?—খেদে অতীত অর্থে। তিনি আসিয়া থাকিবেন—সংশয়ার্থে অতীত। থাক ধাতু দ্বারা এই অর্থ।

লুক। তুমি সর আমি করি—বর্তমান ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা। সুখে থাক—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

লিস। তুমি আসিও, আমি থাকিব—ভবিষ্যৎআদেশ। তুমি আসিবে—নম্রভাবে আদেশ বা অনুরোধ। সত্য কথা কহিবে—বিধি। তোমাকে করিতে হইবে—ঔচিত্য।

১॥/০ রাঢ়ে অবজ্ঞা ও বিরক্তি প্রকাশার্থ অনুজ্ঞায় বিভক্তির পরে গে ও সে বসে। যথা, বল্‌গে (বোল্‌গে), কর্‌গে (কোর্‌গে) যাগ্‌গে (যাউকগে), মরুগ্‌গে (মরুক গে), ইত্যাদি। মেঘনাদবধে,—কেহ কহে চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে। নদীয়া জেলায় এই গে, গা হইয়াছে। কর্‌গা, খাগা, ইত্যাদি। মাণিকে, 'পাক হেতু প্রেরিত করগ্যা তাকে তুমি।' গিয়া ক্রিয়াপদের সংক্ষেপে এই গা গে বিভক্তি। ইহার সহিত হিন্দীর গা গে এর সম্বন্ধ নাই। কবিকঙ্কণে, 'ভৃঙ্গারে পাখাল গিয়া মুখ।' —ভৃঙ্গারে মুখ পাখালগে। গিয়া পদের বিপরীত আসিয়া—সংক্ষেপে এসে। ইহা হইতে শুন্‌সে বা শোন্‌সে—শোন্ আসিয়া বা এসে।

অনুজ্ঞায় গে, সে।

১৸৴০ অস্তির বিপরীত নাস্তি। সং স্থা বাং থাক ধাতুর পূর্বে বা পরে না বসিলে নাস্তি হয়। নাস্তি হইতে নাই। নাই অতীত কাল। করি-আছিনা=

না যোগে ক্রিয়াপদ।

করি নাই, করি-আছিলাম না=করি নাই অর্থাৎ বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের পরে নাই যোগ করিলে অতীত কালের নিষেধার্থ ক্রিয়াপদ হয়। নাই শব্দের একরূপ, নি হইয়াছে। সে আসে না, সে আসে নি, সে আসে নাই, এই তিন বাক্যের অর্থ এক নহে। সে আসে না—কোন বিঘ্ন আছে এই হেতু সে আসে না। সে আসে নি—সামান্য অতীত কাল; সে আসে নাই—বিশেষ অতীত কাল বা নিশ্চয়ে। না-ই সংস্কৃত নহি মনে করাও যাইতে পারে। না-ই শব্দের ই নিশ্চয়ে। ওড়িয়াতে নি নিশ্চয়ার্থ প্রকাশ করে। যথা, সে খাইলা-নি—সে খাইয়াছে। বোধ হয়, নিশ্চয়ে ই হইতে নি-এর উৎপত্তি। এই নি র প্রায় অনুরূপ বাঙ্গালাতে অনুরোধে, না। যথা, খাওনা, খেয়ে ফেলনা—বাস্তবিক খাইতে অনুরোধ। (অব্যয় পরিচ্ছেদে না প্রয়োগ দেখ)।

১৷৷৴০ পূর্বে দেখা গিয়াছে, লিখিত ভাষায় গণভেদে ধাতুর ক্রিয়াপদের রূপের প্রভেদ হয় না। এই এক কারণে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ-সাধন অতি-সহজ হইয়াছে। সং-প্রাকৃতেও ধাতুর গণভেদ ছিল না। কিন্তু, বাঙ্গালা কথিত ভাষা সম্বন্ধে ঠিক একথা বলিতে পারা যায় না। স্থানভেদে ক্রিয়াপদের ন্যূনাধিক প্রভেদ হইয়া থাকে। পরে বঙ্গের নানাস্থানের ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। দুই এক স্থান ব্যতীত অধিকাংশ স্থানের প্রভেদ যৎসামান্য বলিতে পারা যায়। কোন্ ধাতু কথিত ভাষায় কি রূপ ধরে তাহা দেখানা এই প্রকরণের উদ্দেশ্য। লিখিত ভাষার ক্রিয়াপদ আদর্শ রাখিয়া কথিত ভাষা ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত করিয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত রূপ লিখিত ভাষায় চলিত হউক কিংবা না হউক, নাটকাদিতে কথিত রূপ আবশ্যক হয়। তখন একটা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। সে নিয়ম কি, তাহা পাঠকের জানা না থাকিলে তাহাঁকে ভাষার ধাঁদায় পড়িতে হয়।

কর ধাতুর পদ।

	হুগলী	বীরভূম	মুরশীদাবাদ	নদীয়া	রঙ্গপুর	যশোহর	ঢাকা	মৈমনসিং	বরিশাল	চাটিগাঁ
আমি	কোরেছি	করেছি	কোরেছি	কোরিছি	করিছি	কোরিছি	কর্ছি	কর্ছি	কর্ছি	কোর্গি
	কোচ্চি	কর্ছি	কর্ছি	কোচ্ছি	ক'তেছি	কোত্তিছি	কর্তেছি	কোর্তাছি	কর্তেছি	করির্
	করাচ্ছিনু করাচ্ছিলুম্	করাছিলুম্	করাছিলাম্	করাচ্ছিলাম্	করাতেছিনু করাতেছিলাম্	করাচ্ছিলাম্	করায়লইতে ছিলাম্	করায়ালইতা ছিলাম্	——	করাই লচ্ছিলাম্
	কোরিয়েছিনু কোরিয়েছিলুম্	কঁরাইছিলাম্	কোরিয়েছিলাম্	করিইছিলাম্	— —	করাইছিলাম্	করাই ছিলাম্	করাই ছিলাম্	করাই ছিলাম্	করাই লাম্
আমি	কোর্নু কোল্লুম্	কল্লম্	কোর্ল্যাম্	কোর্লাম্	ক'র্নু ক'ল্লাম্	কল্লাম্	কল্ল্যাম্	ক'লাম্	কর্লাম্	কোল্লাম্
তুমি	কোল্লে	কোর্লে	কোর্লে	কোল্লে	ক'ল্লে	কো'ল্লে	কল্ল্যা	কর্লা	কর্লা	কোর্গ্যা
সে	কোল্লে কোল্ল	কোল্ল কোল্লেক্	কোর্ল	কোর্লো	ক'ল্ল	কোল্লো	কল্ল	কর্লো	কর্লো	কোর্ল্যো
আমি	কোর্বো	কর্বো	কোর্বো	কোর্বো	করিম্ ক'র্ব	কর্বো	কর্মু করুম্	কর্মু	কর্মু	কর্গ্যাম্
তুমি	কোর্বে	কর্বে	কোর্বে	কোর্বে	ক'র্বে ক'র্বা	কর্বা	কর্ব্যা	কর্বা	কর্বা	করিবা
সে	কোর্বে	কর্বেক্	কোর্বে	কোর্বে	ক'র্বে	কর্বে	কর্বে	কোর্ব	কর্বে	করিবো
	কোর‍্যে	কোরি	কোর্যে	কোর্যে	করিয়া	কো'রে	কর‍্যা	কইরা	করিয়া	কোরি
	কোত্তে	কত্তো	কোর্তে	কোত্তো	ক'ত্তে	কোর্তি	কোর্তে	কোর্তো	কর্তো	কোর্তো
	করাতে	করাতে	করাতে	করাতে	করাতে	করাতি	করাইতে	——	করণে	——

অন্য ক্রিয়াপদ।

হুগলী	বীরভূম	মুরশীদাবাদ	নদীয়া	রঙ্গপুর	যশোর	ঢাকা	মৈমনসিং	বরিশাল	চাটিগাঁ
দি-ই	দি	দিই	দেই	দ্যাই	দিই	দেই	দেই	দি	দিই
দাও	দাও	দ্যাও	দাও	দ্যাও	দ্যাও	দ্যাও	দ্যাও	দ্যাও	দেও
দিন, দেন্	দেন্	দেন্	দিন্, দেন্	দ্যান্	দ্যান্	দ্যান্	দ্যান্	দেন্	দেতক্
দ্যায়	দ্যায়	দেয়	দ্যায়	দ্যায়	দ্যায়	দেয়	দ্যায়	দেয়	দেয়
{ গেছনু { গেছলুম্	গেই ছিলাম্	গিয়েছিলাম্	গিই ছিলাম্	{ গ্যাছনু { গ্যাছলাম্	গিছিলাম্	গেছিলাম্	গেছিলাম্	গেছিলাম্	গেইলাম্
{ গেনু { গেলুম্	গেলম্	গেলাম্	গেলাম্	{ গ্যানু { গ্যাইলাম্	গ্যালাম্	গ্যালাম্	গ্যালাম্	গ্যালাম্	গেলাম্
{ জেতুম্ { জেতেম্	জ্যাথম্	জেতাম্	জেতাম্	জা`তাম্	জাতাম্	জাইতাম্	জাইতাম্	জাইতাম্	জাইতাম্
{ জাচ্ছিনু { জাচ্ছিলুম্	জেছিলাম্	জাছিলাম্	জাচ্ছিলাম্	জা`তেছিলাম্	জাচ্ছিলাম্	{ জাইবার { লাগছিলাম্	{ জাইবার { লাগছিলাম্	{ জাইতে { লাগছিলাম্	গেইলাম্
{ জেয়ে { গিয়ে	জেঁয়ে	গিয়ে	গিয়ে		জা`য়ে	{ জায়া { গিয়া	জাইয়া	গিয়া	জাইয়ারে

বাঙ্গালা আসামী তুলনা।

কর ধাতুর পদ।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা	প্রাচীন বাঙ্গালা	আসামী
করি	করোঁ	করোঁ
কর্, কর	করা, কর	করা, কর
করে	করএ, করে	করে
করিনু, করিলুম্	করিলোঁ	করিলোঁ
করিলে	করিলা	করিলা
করিলি / করিলু		করিলু
করিলেন, করিলে	করিলে	করিলে
করিস্	করিস্	করিম্
করিবা	করিবা	করিবা
করিবি	করিবি	করিবি
করিবেন, করিবে	করিব	করিব
করুন	করঁা	করঁা
করুক	করু	করোক্
করিতেছি		করিছোঁ, করিবলাগিছোঁ
করিছিনু	করিছিলোঁ	করিছিলোঁ
করিতুম্	করিতুম্	করিলোহেঁতেন্
করাইছি		করাইছোঁ
করিয়া	করি	করি
করিলে	করিলে	করিলে
করিতে		করোতে, করিলত্

উল্লিখিত বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ লেখকের বন্ধুগণ দিয়াছেন। ভদ্র-বংশের অশিক্ষিত নারী যেমন উচ্চারণ করেন, বানানে তেমন দেখাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে। সকলে মন দিয়া শব্দ লক্ষ্য করেন না, নিজের নিজের অভ্যাস ছাড়িতে পারেন না। এই কারণে সকল পদ পাঠকের ঠিক বোধ হইবে না। রঙ্গপুরের পদ স্বকর্ণে শুনিবার সুযোগ হয় নাই। নাই হউক, পশ্চিম রাঢ়ের ও রঙ্গপুরের পদে আশ্চর্য্যজনক সমতা পাওয়া যায়। প্রভেদ এই, রাঢ়ে মুই সর্ব্বনামপদ

অজ্ঞাত, রঙ্গপুরে অদ্যাপি প্রচলিত। পূর্বকালে রঙ্গপুর কামরূপ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইদানীং কামরূপের নাম গিয়া পূর্ব-আসামের নামে 'আসামী ভাষা' নাম হইয়াছে। পূর্ব-আসামী ও পশ্চিম-আসামী ভাষার প্রভেদ আছে। তথাপি পূর্ব-আসামী লেখকের ব্যাকরণ হইতে আসামী ক্রিয়াপদের যে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল, তাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা ও আসামীর সাম্য দৃষ্ট হইতেছে। সর্বনাম পদেও বাঙ্গালা আসামীভাষার সাম্য পাওয়া যাইবে। গ্রীয়ার্সন সাহেব ভারতবর্ষের ভাষা ও উপভাষা বিষয়ক যে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গের বহুস্থানের ও বাঙ্গালা আসামী কথিত ভাষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

৭৮। ক্রিয়াপদের বিভক্তি বিচার।

/০ বর্তমানের আলোচনার সময় পুরাতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা যায়। মানব-মনের স্বভাব এই কেবল বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট হয় না। গাছ হইতে পাকা আম পড়িল। মন জিজ্ঞাসা করে, আম পড়িল কেন? কেহ বলে, পাকা আম পড়িয়াই থাকে। কেহ বলে বোঁটা রসহীন হয়, ভারী পাকা আমকে ঝুলাইয়া রাখিতে পারে না। কেহ বলে, তা নয়, বোঁটার মধ্যে এমন এক স্তর জন্মে, যাহার টান থাকে না; এইহেতু আম পাকিলে খসিয়া পড়ে। কেহ বলে তা নয়, আমকে পৃথিবী টানে বলিয়া আম পড়ে। অপরে বলে, শুধু পৃথিবী নয়, আমও পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়। অন্য কেহ বলে, এসব কথা কিছুই নয়, নূতন গাছ হইবে বলিয়া পাকা আম পড়ে। এইরূপ, জ্ঞান মেধা আগ্রহাদি গুণের তারতম্য হেতু লোকে নানাবিধ উত্তর দেয়। কিন্তু ভুলিয়া যায়, সবারই ভাগ্যে অন্ধের হস্তীদর্শন মাত্র।

ক্রিয়ার বিভক্তির মূল।

৴০ মনে হইতেছে, এক পণ্ডিত বলিয়াছেন, ক্রিয়াপদের বিভক্তি আর কিছু নয়, সর্বনাম, আমি তুমি তিনি, কর্তাপদের শেষভাগ মাত্র। এই অনুমান মিথ্যা বলিতে পারা যায় না।* সং ভূ ও কৃ ধাতু লইয়া দেখা যাউক।

* তেলুগু ভাষায় উক্ত অনুমানের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা—

আমি	করি	নেনু	চেস্তানু
আমরা	করি	মেমু	চেস্তামু
তুমি	কর	নিউ	চেস্তাউ
তোমরা	কর	মেরু	চেস্তারু
তিনি	করেন	বড়ু	চেস্তাড়ু
সে	করে	অদি	চেয়ুচুন্নদি
তাহারা	করে	বারু	চেয়ুচুন্নারু

ইত্যাদি। সুতরাং নেনু মেমু প্রভৃতি সর্বনাম পদ প্রয়োগ না করিলেও ক্রিয়াপদ দ্বারা কর্তা অনুমিত হয়। রাঢ়ে একটা গ্রাম্য প্রয়োগ আছে, যাচ্ছু, কচ্ছু, শুনছু ইত্যাদি। এখানে কর্তা তুই না হইয়া তু হওয়া সম্ভব।

সংস্কৃত	অহম্	ভবামি	করোমি
সংপ্রাকৃত	অহম্মি, ম্মি	হোমি	করমি
মরাঠী	মী	হোই	করিতোঁ
হিন্দী	মৈঁ	হূঁ	করূঁ
ওড়িয়া	মুঁ	হুএঁ	করেঁ (কর্+ই)
আসামী	মই	হওঁ	করোঁ।
বাঙ্গালা	আমি	হই	করি (কর্+ই)

সংস্কৃতে 'অহম্ ভবামি' না হইয়া 'অহমি ভবামি' হইলে কর্তা ও ক্রিয়াপদের বিভক্তির ঐক্য হইত। এই ঐক্যের চেষ্টায় সংপ্রাকৃতে অহম্মি কিংবা ম্মি। মরাঠীতে প্রাচীন রূপ করী, বর্তমান করিতো পুংলিঙ্গে। স্থানে স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে করিতী হয়। হিং মৈঁ, বস্তুতঃ মিঁ শব্দের স্বর বিপ্রকর্ষে মই বা মুই। যে যে ভাষায় মুই আছে, সে সে ভাষায় অনেকে মুই স্থানে মুঁ বলে। ওড়িয়াতে এইরূপ। প্রাচীন বাঙ্গালায় হওঁ বা হঙ, এবং করোঁ ছিল। আসামীতে সেইরূপ অদ্যাপি আছে। এইরূপ হয়ত হিন্দীর হূঁ, করূঁ। ওড়িয়া মুই উচ্চারণে মুএঁ হইয়া পড়ে। বাঙ্গালাতে মুই ও আমি দুই-ই ইকারান্ত। বর্তমান ওড়িয়াতে মুঁ, এই একবচনের পদ শিষ্টসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়া বহুবচনের পদ আমে বা আম্ভে চলিত হইতেছে। আমে হউঁ করুঁ। অতএব কর্তায় পরিবর্তন হইলেও ক্রিয়াপদে মুঁ দেখাইয়া দিতেছে।

যে ভাষা সংস্কৃত নামে খ্যাত, সে ভাষা যে বহুকাল ব্যাপিয়া বহুলোকের কথিত ভাষা ছিল তাহা সংস্কৃত-ব্যাকরণের ধাতুর নানাবিধ গণ ও পদ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়। সে ব্যাকরণের এক শত আশী বিভক্তি কদাপি অল্প সময়ে কিংবা অল্প লোকের দ্বারা আসিতে পারে নাই। বহুকাল এবং বহুপ্রদেশ ব্যাপী ভাষা বলিয়া ক্রিয়াপদের এত বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল, এত আদেশ, আগম, লোপ, ব্যতিক্রম আসিয়াছিল। প্রাচীন আর্যগণের ভাষার নাম 'ভাষা' মাত্র ছিল, অর্থাৎ সে কালে সংস্কৃত বিশেষণ যোগ করিবার প্রয়োজন ছিল না। কথিত ভাষার নাম যে ভাষা, তাহা অদ্যাপি হিন্দী বাঙ্গালা ওড়িয়াতে ভাষা শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে পারা যায়। 'ভাষা-টীকা' অর্থে সাধারণের জানা ভাষা। হয়ত সে কালের চলিত ভাষার ব্যাকরণ হইবার পর সে ভাষার বিশেষণ সংস্কৃত অর্থাৎ শোধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, একটা ভাষা না থাকিলে তাহার সংস্কার হইতে পারিত না, এবং সংস্কৃত ভাষা আরম্ভাবধি কেবল লিখিত ভাষা থাকিলে উহার সংস্কার আবশ্যক হইত না, কিংবা সংস্কৃত ভাষা এত জটিল হইতে পারিত না। সংস্কৃত ভাষার তুলনায় বাঙ্গালাভাষা কত সোজা! ধাতুর গণভেদ প্রায় নাই, ক্রিয়াপদের এক বচন বহুবচন ভেদ নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালা আসামী (ও ওড়িয়া ভাষা) হিন্দী ও মরাঠীকে হারাইয়াছে। হিন্দী ও মরাঠীতে ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদও করিতে হয়। কিন্তু, যদি বাঙ্গালা ভাষা কিছুকাল জীবিত থাকে, তাহা হইলে ইহাও ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়িবে। মুদ্রাযন্ত্রের বাহুল্যে ও শিক্ষা বিস্তারে এই কাল দীর্ঘ হইবে বটে, কিন্তু, কথিত

ভাষাই যখন লিখিত ভাষার রস বিধান করে, তখন পরিবর্তনের দ্বার মুক্ত হইয়া আছে। বাঙ্গালা কথিত ভাষার ক্রিয়াপদ কত দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে! বাল্যকালে আমরা যে পদ শুনিয়াছি, পাঠশালায় শিখিয়াছি, সে পদ আজ অপ্রচলিত হইতেছে। নীচে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বর্তমান কাল।

৵৹ আমি করি, তুমি কর্, তুই কর, তিনি করেন, সে করে। অন্য চারি ভাষার সহিত তুলনা করিলে জানা যায়, আমি তুমি তিনি বাস্তবিক বহুবচন পদ, এবং মুইঁ তুই সে একবচন পদ (কারক দেখ)। তুমি মান্যে, তুই অমান্যে। ক্রিয়াপদে কর্ অকারান্ত, কর হলন্ত। স্বর-যোগ ও স্বর-লোপ আদর ও অনাদরের লক্ষণ। তুমি কর্, প্রাচীন বা° করহ, সং কুরুথ (থ স্থানে হ, ৩৭ সূঃ)। তিনি করেন,—তিনি ও করেন, দুই পদই অনুনাসিক। স্বর অনুনাসিক করা সম্ভ্রমের লক্ষণ ছিল। করে—প্রাচীন রূপ করএ, করই—সং করোতি; বা° করই বাস্তবিক করোই; পরে ই থাকাতে পূর্বস্থিত অকার ও উচ্চারিত হয়। বিদ্যাপতিতে, কহই, পূরই ইত্যাদি। তিনি করেন—গৌরবে বহুবচন। শূন্য-পুরাণে বোলেন্ত, কহেন্ত, দিলেন্ত, হইলেন্ত, ইত্যাদি। পূর্বকালে পূর্ববঙ্গেও এই রূপ পদ ছিল। (সন ১৩১৬ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শূন্যপুরাণ আলোচনা দেখ)। প্রাচীন আসামীতেও এইরূপ পান্তি, ভৈলন্ত (হইলন্ত), বোলন্ত, স্মরন্ত ইত্যাদি পদ পাওয়া যায়। ওড়িয়াতে মান্যে এইরূপ করন্তি, বোলন্তি—করেন বলেন। হিন্দীতে (সে) করেগা, (তাহাঁরা) করেঙ্গে। অর্থাৎ মান্যে বহুবচন এবং সানুনাসিক।* ইহার সহিত সংস্কৃত কুর্বন্তি, জানন্তি ইত্যাদি তুলনা করা যাইতে পারে। আশ্চর্য, বর্তমান আসামীভাষায় প্রথম পুরুষে একবচন বহুবচন মান্যে অমান্যে ক্রিয়াপদে প্রভেদ নাই।

ধাতুবিভক্তির শেষ স্বর।

।৹ সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার ক্রিয়ার বিভক্তি স্মরণ করিলে বর্তমান দেশভাষার বিভক্তির কারণ সহজ হইবে। সংস্কৃত-প্রাকৃতে বর্তমান কালের বিভক্তি এই—

	একবচন		বহুবচন
(অহম্মি, অম্হি, অম্মি, ম্মি)	মি, উ	(অম্হে, অম্হো, মো)	মী, মু, মা
(তুমং, তুং, তুহ)	সি, হি	(তুম্হে, তুম্হ)	হ, হু, ইত্থা
(সো)	ই, এ	(তে)	ন্তি, ন্তে, ইরে

দেখা যায়, সংস্কৃত-প্রাকৃতে যাহা বর্তমানের বিভক্তি ছিল, প্রচলিত ভাষায় তাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কালেই প্রযোজ্য হইয়াছে। সংস্কৃত-প্রাকৃত বিভক্তির শেষ স্বর লক্ষ্য করিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। অর্থাৎ

---

* বিদ্যাপতির এক স্থানে, 'ঝম্প ঘন, গরজন্তি সন্ততি, ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া'—বর্ষণ-কারী ঝম্প-মেঘ ভুবন ভরিয়া সতত গর্জিতেছে। এখানে ঘন (মেঘ) বহুবচন মনে করিতে হইবে।

মু, আমি	উ বা উঁ, ই	
তু, তুমি	ই, উ, অ	
সে, তিনি	এ, এন, ইন	

কোন্ ভাষার বিভক্তির সহিত অধিক, কোনটার সহিত অল্প মিল আছে। শেষ স্বরই বিভক্তির প্রধান অঙ্গ।

ভবিষ্যৎ কাল।

।/০ ভবিষ্যৎ কালে, আমি করিব। ওড়িয়াতে আমে করিবুঁ। শূন্যপুরাণে, 'ফেলিআ মারিবু হাথর ধুনাচুর।' মারিবু পদের কর্তা 'আমি' হইতে পারে না, মুঁ মনে করিতে হইবে। পূর্ব বঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে অদ্যাপি করিমু (করিব), যাইমু (যাইব); সংক্ষেপে ও স্বরবিপর্যয়ে করমু—করুম; যাইমু—যাইম। আসামীতে এইরূপ করিম, যাম। মূল দেখিলে মু বিভক্তি শুদ্ধ। বোধ হয় প্রাচীন মুঁ বা মুই স্থানে আমি আসিবার সময় করিবুঁ, বা করিবু স্থানে উ লোপে করিব আসিয়াছে। হিন্দীতে করুঙ্গা—চাটিগাঁয়ের কর্গ্যাম স্মরণ করায়। মরাঠিতে করুঁ। হিন্দীর গা বাদ দিলে করুঁ পাই। এই সকল পদের সহিত সংস্কৃতের মিল নাই। মুঁ করিবুঁ, আমি করিব—সং অহং করিষ্যামি, না, ময়া কর্তব্যং? প্রথমে করিষ্যামি মনে হয়। কিন্তু, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের পদ দেখিলে বোধ হয় সংস্কৃত তব্য স্থানে বাং ইব। প্রাচীন কালে ইব প্রায় ছিল না, তৎস্থানে য়ব পাই। শব্দশাস্ত্রে য় ই সজাতি। বিদ্যাপতিতে ইব স্থানে য়ব, অব। অ স্থানে য় এবং য় স্থানে অ প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচুর পাওয়া যায়। তব্য-অব্য-অয়ব-অব কিংবা য়ব। য় স্থানে ই উচ্চারণ হইতে বিভক্তি ইব হইয়া থাকিবে। বিদ্যাপতি, 'সহি হে কি কহব নাহিক ওর' 'হাম শিখায়ব বচন বিশেষ।' অ স্থানে ও সহজে আসে। 'হাম নাহি যাওব সো পিয়াঠাম'।(৷/০ দেখ)

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শূন্যপুরাণের সর্বত্র ইব। (তুমি) করিব, (সে) করিব; করিবা নহে, করিবেও নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে, 'কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার।' আসামীতে অদ্যাপি এইরূপ। ওড়িয়াতে, (তুমি) করিব, (সে) করিব। হিন্দীতেও (তুমি সে) করেগা। বর্তমান বাঙ্গালাতেও (তুমি) করিবে, (সে) করিবে, উভয় স্থলে ইবে। নদীয়া যশোর বরিশাল প্রভৃতি স্থানে, তুমি যাবা করিবা। আসামীতেও এইরূপ। রাঢ়ের ভাষার এক লক্ষণ এই যে, উপান্ত বর্ণে ই থাকিলে প্রান্ত বর্ণের আ এ-কারে পরিবর্তিত হয় একারের প্রতি অনুরাগে বা স্থানে বে হইয়া, তুমি করিবে। অতএব প্রথমে ব পরে বা, এখন বে। ওড়িয়াতে প্রথম অবস্থা; আসামে ও পূর্ববঙ্গের কথিত ভাষায় দ্বিতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে।

ধাতু বিভক্তির ক।

।৵০ প্রাচীন বাঙ্গালায় করিবাক, হইবাক ছিল। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, করিবেক হইবেক। বঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে এখনও এইরূপ ক প্রয়োগ আছে। এই ক স্বার্থে বসিত, প্রায়ই নিশ্চয়ার্থ প্রকাশ করিত। হিন্দীতে হোয়েগা হোবেগা, করেগা,—অর্থাৎ এগা—বেগা, বাং বেক তুল্য। অতীত কালেও ক্রিয়াপদের শেষে ক বসিত। শূন্যপুরাণে আইলাক, দিলাক। কালক্রমে

আইলেক, দিলেক। এখনও অনেক স্থানে এইরূপ ইলেক আছে। ভারতচন্দ্রে, 'বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কানা।' প্রাচীন আসামীতে করিবেক, ভৈলেক (হইলেক), রাখস্তোক (রাখুন), ইত্যাদি পাওয়া যায়। মৈথিলী ভাষায় লাগলেক, পড়লেক আছে। উত্তর রাঢ়ে দিলেক এবং দক্ষিণ রাঢ়েও অদ্যাপি স্ত্রীলোকের মুখে খেলেক শুনিতে পাওয়া যায়। সভ্য শিষ্ট ভাষাতেও ক আছে। সে নাই—সে নাইক্; সে করিবে না—সে করিবে নাক্। অনুজ্ঞায় ক নইলে চলে না,—তা হউক, সে করুক। শূন্যপুরাণে, 'বিল্প মধু খেঅনাক বোলেন নারায়ন।' বিদ্যাপতি, 'মান রহুক পুন যাউক পরাণ।' কোন কোন পদে ক নাই, 'ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ।' (এইক্ষণে তোমার স্নেহে ধিক্ রহুক্)। কৃত্তিবাসে যাউক স্থানে যাকু। বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবি করে প্রভৃতি স্থানে করু ধরু লিখিয়াছেন। এইরূপ, আসামে মাধবদাস 'করু যাকর পদসেবং', 'তাণ্ডব করু সমবেণুং' ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, বর্তমান কালে লি বিভক্তি হইতে প্রভেদ করিতে অনুজ্ঞায় করুক ধরুক আসিয়াছে। সে করুক, আসামী ও বাঙ্গালাতে ক নইলে চলে না। কিন্তু ওড়িয়াতে ক বসে না, সে করু। অতএব ক্রিয়াপদের শেষের ক স্বার্থে শিষ্টপ্রয়োগে এবং স্থল বিশেষে নিশ্চয়ার্থে আসিয়াছিল। আসামীতে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের বহুবচনে ক্রিয়াপদে বিকল্পে হঁক বসে। অঁক হইতে হঁক বোধ হয় মানার্থে স্বর দীর্ঘ ও অনুনাসিক হইয়া অঁ বা হঁ আসিয়াছে। প্রাচীন আসামীতে মানো অনুজ্ঞায় করিয়োক, করস্তোক, করিয়োক ইত্যাদি পাওয়া যায়। আশ্চর্য এই, প্রথম পুরুষের বহুবচনে ক্রিয়াপদে মান্য প্রকাশের চিহ্ন মাত্র নাই।

।৵০ **অতীত কাল।** অতীত কালে আমি করিলাম, তুমি করিলে, তুই করিলি, তিনি করিলেন, সে করিল। ওড়িয়াতে আমে করিলুঁ। শূন্যপুরাণে দেখিলুঁ। আসামীতে করিলোঁ। বিদ্যাপতিতে, 'অপরূপ পেখলুঁ রামা।' মুঁ করিলুঁ এই প্রকার পদ কবিকঙ্কণের কোন কোন সংস্করণে পাওয়া যায়। এই ইলুঁ হইতে ইনু প্রাচীন পদ্যে এবং রাঢ়ের ভাষায় প্রচুর আছে।* রাঢ়ের স্ত্রীলোকে অদ্যাপি করনু কনু,,

---

* যথা, বিদ্যাপতিতে—

জনম অবধি হম রূপ নিহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥

কৃত্তিবাসে গেনু, ভাবিনু, দেখিনু, শুনিনু। দুই এক স্থানে ইলাম ও আছে। কবিকঙ্কণের ত কথাই নাই। চণ্ডীদাসে—

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা॥

চলনু, গেনু, খেনু, দিনু, মনু (মরনু), ইত্যাদি সর্ব্বদা বলিয়া থাকে। বোধ হয়, কবি নারীজাতির ন্যায় স্থিতিশীল। মধুসূদন হইতে নব্য পদকর্ত্তা প্রাচীন রূপ রক্ষা করিতেছেন। রাঢ়ের বা প্রাচীন কালের নু ওড়িয়া ও তেলুগুতে আছে। ওড়িশার বহু লোকে গনু বলে; শিক্ষিত লোকে গলুঁ, যেন নু অপেক্ষা লুঁ শিষ্টপ্রয়োগ। বিহারীতে হুঁ, মরাঠীতে লোঁ। রাঢ়ে এখন গেনু, গেলুম, গেলেম। কলিকাতায় গেলুম। এখান হইতে পূর্ব্বদিকে লুম ক্রমশঃ লেম লাম ল্যাম হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, নু বগুড়া রঙ্গপুর গোয়ালপাড়া কুচবিহারেও আছে। ভাষার শব্দের ও বিভক্তির প্লুতগতির বহুদৃষ্টান্ত আছে। এবংবিধ গতি সাধারণ নহে। সাধারণ এই যে, বিভক্তি অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া বহুদূরে ভিন্ন আকার ধরে। গেনু গেলুঁ—এক কথা। গেলুঁ—গেলুম—গেলম—গেলাম—গেল্যাম। এই সকল পদে একই অক্ষরে বল প্রযুক্ত হয় না। গেনু গেলুঁ পদে গে উপরে বল। গেলুম পদে সে বল গে ও লু তে প্রায় সমান হইয়াছে। ক্রমশঃ গে হইতে লুতে অধিক হইয়া ল-তে আকার দিয়া গেলাম করিয়া ছাড়িয়াছে।

সে গেল—সংস্কৃতে সঃ গতঃ। সং গতঃ, বাং গেল, আসাং গল, ওং গলা, মং গেলা, অর্থাৎ ত স্থানে ল। বিসর্গ ছিল জানাইতে ল অকারান্ত কিংবা আকারান্ত হইয়াছে। ত লুপ্ত হইয়া হিং গয়া। এইরূপ, সং কৃতঃ বাং করিল, আসাং করিলে, ওং কলা, মং কেলা, হিং কিয়া। সং কৃতঃ—করিত—করিদ—করিড—করিল। সংস্কৃতে তেন কৃতঃ, হিন্দীতে তেন পদের অনুরূপ উস্‌নে (বা ইন্‌নে) কিয়া, মরাঠিতে ত্যানেঁ করিলা। হিন্দী ও মরাঠীতে কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ, বাঙ্গালা আসামী ও ওড়িয়াতে কর্তৃবাচ্যের, ; তা হউক, মূল এক দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালাতে করিলা—এইরূপ আকারান্ত পদ ছিল। ওড়িয়াতে (তিনি) কলে (করিলে), কিন্তু (সে) কলা (করিলা)। অর্থাৎ মান্য (বহুবচনে) লে, অমান্য (একবচনে) লা। আসামীতে তুমি তোমরা করিলা, সে করিলে। কিন্তু প্রাচীন কিংবা নবীন বাঙ্গালায় লা প্রয়োগে এরূপ বিশেষ দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রে, মান্য প্রায়ই লা, অমান্য ও অচেতন পদার্থে ল। মেঘনাদ-বধ কাব্যেও এই রীতি প্রায় দেখা যায় অর্থাৎ লেন স্থানে লা। অনিয়মও আছে, যথা, তারাদল শোভিল গগনে! কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিল কৌতুকে! ছুটিলা সৌরভ, মন্দ সমীর স্বনিলা।' এখন লিখিত ভাষায় করিল, মারিল; কিন্তু রাঢ়ে কোল্লে, মাল্লে অর্থাৎ সে করিলে, মারিলে। রাঢ়ে যাবতীয় সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর লে, অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর ল হয়।* যথা, তা হোলো কিন্তু সে ভাত খেলে। আসামীতে অবিকল এই নিয়ম,—(সে) করিলে খালে; (সে) মরিল, গল। তিনি করিলেন

ভারতচন্দ্রে— পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বান্ধিনু;
নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু।

* রাঢ়ের যেখানকার ভাষা লক্ষ্য করিয়া আলোচনা করিতেছি, সেখানকার ২২০ বৎসরের পূর্ব্বের কবি জয়কৃষ্ণ দাসের রসকদম্বলতার ভাষার দৃষ্টান্ত এই,—(সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১০ সালের ১ম সংখ্যা)

—শেষের ন মান্যে বহুবচনের বিভক্তি। শূন্যপুরাণে ন স্থানে স্ত পাই। এ বিষয় পূর্বে দেখা গিয়াছে। কোন কোন স্থানে লাঞ পাই। যথা, 'ধেআনেত জানিলাঞ পরভু উল্লুক বারতা।' জানিলেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে লাম লেম স্থানে লাঞ। যথা, গেলাঞ (গেলাম), হইলাঞ (হইলেন)। অর্থাৎ শেষ স্বর সানুনাসিক করা উদ্দেশ্য।

লিতুম্ বিভক্তি।

॥০ (আমি) করিতাম—পূর্বকালে করিতুঁ ছিল। যথা, চণ্ডীদাসে, 'আগে যদি জানিতুঁ সতর্কে থাকিতুঁ এমত না করিতুঁ মনে।' বিদ্যাপতি, 'হাম যদি জানিতুঁ কানুক রীত'—আমি যদি কানুর রীত জানিতুম্। ত লুপ্তও হইত। যথা, বিদ্যাপতি, 'পাখী জাতি যদি হঙ পিয়াপাশ উড়ি যাঙ, সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশ'—যদি পক্ষী জাতি হোতুম, প্রিয়পার্শ্বে উড়িয়া যেতুম, এবং তস্য পার্শ্বে সব দুঃখ কইতুম্।

বাঙ্গালা লিতুম্ তুল্য বিভক্তি আর চারি ভাষায় নাই। সে চারি ভাষায় অদ্যাপি দুইটি ক্রিয়াযোগে লিতুমের অর্থ প্রকাশ করিতে হয়। বাং যদি সুবিধা হইত—হিন্দীতে সুভীতা হোতা থা; বাং যদি পড়িত—হিন্দিতে পঢ়তা হোতা। থা হোতা স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ। এইরূপ, যদি সে আসিত—মরাঠীতে আলা (আয়াত) অসতা। অসতা পদ (সং অস্—হওয়া বা থাকা) বাং থাকিত পদের তুল্য। আলা অসতা—আগত থাকিত। একেবারে বাং আসিত ক্রিয়াপদ নহে। ওড়িয়াতে এইরূপ থা ধাতু (বাং থাক) আবশ্যক হয়। বাং যদি সে আসিত—ওং আসি থান্তা। আসামীতে আহিল-হেঁতেন অর্থাৎ আয়াত হইতেন। ভূত ক্রিয়াপদের পরে, হইতেন। হইতেনও ঠিক নহে; কারণ বাং হইতেন আং হল-হেঁতেন। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা লিতুম অন্য ক্রিয়ার প্রয়োজন ত্যাগ করিয়াছে, অন্য চারি ভাষা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে পারে নাই।

কিন্তু পাঁচ ভাষাতেই ত কিংবা তা যোগে সংশয়ার্থ প্রকাশিত হয়। এই ত তা এর উৎপত্তি সংস্কৃতে থাকিবে। সংস্কৃতে চেৎ এবং লৃঙ্ বিভক্তি যোগে এইরূপ সংশয়ার্থ প্রকাশিত হয়। সং স চেৎ আগমিষ্যৎ—সে যদি আসিত (ভবিষ্যৎ কালে)। লৃঙ্ বিভক্তি প্রথম পুরুষের একবচনে স্যাৎ, স্যত; বহুবচনে স্যন্ স্যন্ত। স্যৎ লুপ্ত হইতে পারে। বিদ্যাপতির 'পাখী জাতি

সখি জাতি কুল শীলে, জয়ম ভাঙ্গিয়া দিলে
হেনই ডাকাতিয়া বাঁশী।
বাঁশ ঝাড়ে তার জন্ম, ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ
কুকাধরে খায় সুধারাশি॥
সেই অহঙ্কার ধরে, মোর নাম গান করে
বাউলী করিলা গুরুমাঝে।
কি করিতে কি না করি, ধৈরজ ধরিতে নারি
দূর কৈল যত লোকলাজে॥

এখানে ভাঙ্গিয়া দিলে, বাউলী (বাতুলী) করিলা দ্রষ্টব্য। করিলা, দিলা, মারিলা ইত্যাদি পূর্বরূপ। পরে অদ্যাপি সকর্মকে করিলে দিলে মারিলে বা কোল্লে দিলে মাল্লে ইত্যাদি। সে—এ মাল্লে—এ।

যদি হও'—হও, সংস্কৃতে অভবিষাম্। অ লুপ্ত হইতে পারে, তখন ভবিষ্যম্ হইতে হও আসা আশ্চর্য হয় না। কিন্তু বাঙ্গালাতে প্রাচীন রূপের দৃষ্টান্ত আরও না পাইলে অনুমান দৃঢ় হয় না। হয়ত আসামী ভাষার প্রাচীন পুথী হইতে সাহায্য মিলিবে।

যেমন প্রাচীন লুঁ, পরে লুম লেম লাম হইয়াছে; তেমনই প্রাচীন তুঁ, পরে তুম তেম তাম আকার ধরিয়াছে। যখন ভাষায় মুঁ প্রয়োগ ছিল, তখন মু বা লুঁ, তুঁ, (ভবিষ্যতে) বুঁ বা মু ঠিক ছিল। রাঢ়ে মুঁ স্থানে 'আমি' আসিয়াছে, কিন্তু ক্রিয়াপদে লুঁ বা মু, তুঁ রহিয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে মুঁ আছে, অথচ ক্রিয়াপদে লাম, তাম চলিয়াছে। রাঢ়ে করিবুঁ বা করিমু স্থানে করিব হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে, আসাম ও ওড়িশাতে প্রাচীন রূপ আছে। লুঁ যেমন লুম্ লেম্ লাম্, এবং তুঁ যেমন তুম্ তেম্ তাম্ হইয়াছে, তেমন প্রাচীন বুঁ স্থানে ব না হইয়া বুম্ বেম্ বাম্ হইবার ছিল। বাস্তবিক মৈমনসিংহে করবাম, যাইবাম আছে। লাম তাম বাম বহুবচনের প্রয়োগ বোধ হয়। মুঁ মুই স্থানে যেমন বহুবচনে আমে, আমা, আম হইয়াছে (আমা-কে, আম-রা তুলনা কর, কারক দেখ), লুম তুম বুম স্থানে তেমনই সাধু ভাষায় লাম তাম ব প্রচলিত হইয়াছে। আশ্চর্য এই, বর্তমান সাধু ভাষা করিব হইব রূপ লইয়া মু বুঁ বাম পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্রিয়াপদের শেষে আম উচ্চারণ করিতে মুখ যত বিস্তার করিতে হয় সুতরাং শক্তিব্যয় হয় উম এম উচ্চারণ করিতে তত আবশ্যক হয় না। এই কারণে বোধ হয় উম এম অপ্রচলিত হইতে কাল-বিলম্ব হইবে।

প্রাচীন বিভক্তি।

৷৵০ কোনও প্রাচীন পুস্তকের সর্বত্র এক প্রকার বিভক্তি পাওয়া যায় না। কোথাও লিপিকরের সংশোধনে বিভক্তি পরিবর্তিত হইয়াছে, কোথাও গ্রন্থকারের সময়ের প্রচলিত কথিত ভাষার বিভক্তি এবং লিখিত ভাষার বিভক্তি মিশিয়া গিয়াছে। তথাপি প্রাচীন পুস্তকের পাঠ তুলনা করিলে জানা যায়, সেকালে বিভক্তির একটা বাঁধা নিয়ম ছিল না। ভাষার শৈশবে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। শূন্য পুরাণে দেখি, প্রথম পুরুষে বৈসে বৈসএ; কহে—(কহে, কহেন), কহেন্ত—(কহেন); তুলিলেন, রচিলঁ—(রচিলেন), করিলেন্ত—(করিলেন), রহিলাএ—(রহিলেন); হইলাক—(হইল), হইলেক—(হইলেন), আইলেক—(আইল), বোলিবাক—(বোলিবে)। মধ্যম-পুরুষে সুনু—(শুনুন), দেহু—(দেন), রাখহু—(রাখুন), করু—(করুন); বুলিব, 'বলিবা—(বোলিবে); করিব—(করিবে, বে স্থানে ব সর্বত্র); উত্তম পুরুষে, করিব, করিবু—(করিব); কহিলুঁ—(কহিলাম); আইলাএ—(আইলাম), ইত্যাদি। শূন্য-পুরাণের নানা সংস্করণ হইয়াছিল, লিপিকরেরা নিরক্ষর ছিলেন; সুতরাং সে গ্রন্থে নানাবিধ পদ থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস-কবিরাজ পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে নানাবিধ পদ পাই। 'মুঁই দেখোঁ আকাশ উপরে'—দেখি; এইরূপ, কহোঁ, পড়োঁ, মাগোঁ। পিমু, দিমু, পরিমু পদও আছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য, 'কন্যা আমি দিল, 'আমি স্বপন দেখিল', 'আমি কি কৈল অপরাধ'। 'কে করু প্রকাশ'—কে প্রকাশ করিবে। কবিরাজ-মহাশয়

সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; বোধ হয় এই হেতু তিনি তৎকালের বাঙ্গালা ভাষা লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। হয় ত তাঁহার গ্রন্থের লিপিকরপ্রমাদও প্রচুর ঘটিয়াছে। বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদে ল অনম্বনাসিক হইয়া পড়িয়াছে। তুং আসাং করেঁা, করিলোঁ। সে কালে 'বন্দো মাতা সুরধনী'—বন্দি বা বন্দনা করি অর্থে বন্দো—অনেকের গ্রন্থে পাওয়া যায়। শূন্য পুরাণে (তুমি) করিব, (সে) করিব; করিবা নহে, করিবে নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে 'কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার।' আমি করিব, তুমি করিব, সে করিব—পাইলে বোধ হয় যেন পূর্বকালে ভাষার গতি স্থির হয় নাই। হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া বাঙ্গালা-ভাষায় কথা কহিবার সময় প্রথম প্রথম বলে 'আমি কহিল, আমি করিল। কখন কখন বলে, কহল, করল। বিদ্যাপতিতে এইরূপ পাওয়া যায়। *

প্রয়োজকে আত্ব।

॥৵০ প্রযোজক অর্থে ধাতুর উত্তর আ হয়। কর্ ধাতু হইতে করা। আসামী ওড়িয়াতেও এইরূপ। হিন্দী ও মরাঠীতে ধাতু একবার আন্ত করিয়া আবার আন্ত করিতে পারা যায়। বাং কর্ হিং কর্ মং কর্; বাং করান, হিং করানা, মং করবণেঁ। অতএব এ বিষয়ে হিন্দী ও মরাঠী বাঙ্গালা ও ওড়িয়াকে হারাইয়া দিয়াছে। এ বিষয়ে আসামী ভাষা হিন্দীর তুল্য হইয়াছে। বাং করাইল—আসাং করালেঁা, পুনশ্চ করোয়ালেঁা (করোৱালেঁা); বাং করাইতেছি—আসাং করাইছোঁ, পুনশ্চ করোয়াইছোঁ (করোৱাইছোঁ)। বোধ হয়, এখানে আসামীতে হিন্দীর প্রভাব লাগিয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে কৃ ধাতু হইতে কারয়তি, না ধাতু হইতে নাপয়তি, অর্থাৎ ধাতুর আদ্য স্বরের গুণ বৃদ্ধির পরে অয়, এবং আকারান্ত ধাতুর উত্তর অয় করিবার পর প যোগ হয়। বাঙ্গালাতে অয় স্থানে আ। হিন্দী ও মরাঠী সং প্রাকৃত হইতে ব পাইয়াছে। সে ব সংস্কৃতের প বোধ হয়।

সহচর ক্রিয়ার প্রয়োগ।

॥৶০ পূর্বে সহচর ক্রিয়ার উল্লেখ করা গিয়াছে। এই 'করা গিয়াছে'—'গিয়াছে' পদের অর্থ কি? ক্রিয়ানিষ্পাদক মাত্র। দেখা গিয়াছে, শোনা গিয়াছে, বোঝা গিয়াছে, যাওয়া গিয়াছে ইত্যাদিতে দেখা শোনা ইত্যাদি কর্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে। এইরূপ, দেখা যাবে, শোনা যাবে, যাওয়া যাবে, ইত্যাদিতে ক্রিয়ার

* কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলিতেছি। 'না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ।' 'বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল'—কহে। 'ঐছন সময়ে আওল বনদেবী। কহয়ে চলয়ে ধনী তাতুক সেবি।'—ঐক্ষণ সময়ে বনদেবী আইল এবং কহয়ে ধনী চলয়ে—চল তাহুকে সেবি। 'কত কত অনুনয় করু বরনাহ'—বরনাথ কত অনুনয় করে। হইতেছে, হইতেছিল—এরূপ পদ সেকালে ছিল না। এইরূপ অর্থে অত বিভক্তি ছিল। 'অবহি যে করত পয়াণ'—এখনই প্রাণ যে করিতেছে! 'নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত'—রতিপতি ফুলধনু হাতে করিয়া নাচিতেছিল। 'হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ'—রস তিক্ত কি মিষ্ট, আমি বুঝি না। বুঝিয়ে তুল্য পদ চৈতন্যচরিতামৃতে এবং সে সময়ের অন্য গ্রন্থে আছে। যে কথার মাত্রা, যে, মনে করাও যাইতে পারে। 'হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ'—রস তিক্ত কি মিষ্ট তাহা আমি বুঝি না যে—অর্থাৎ যেহেতু। কিংবা, এ রস তিক্ত কি মিষ্ট আমি বুঝি না। (অব্যয় যে দেখ)।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয়তা বুঝাইতেছে। দেখিব—নিশ্চয়; দেখা যাবে—অনিশ্চয়। ভেঙ্গে যাবে, মরে যাবে, পেকে যাবে, লেগে যাবে ইত্যাদিতে সম্ভাবনা বুঝাইতেছে। হইয়া উঠিল, হইয়া পড়িল; বাড়িয়া উঠিল, বাড়িয়া পড়িল; উঠিয়া পড়িল; হইয়া দাঁড়াইল; ইত্যাদিতে ওঠা পড়া দাঁড়ানা অর্থ গিয়া কেবল ক্রিয়া-নিষ্পত্তি বুঝাইতেছে। ভবিষ্যৎ কালের পদ থাকিলে সম্ভাবনা বুঝাইত।

মার্, মারিয়া ফেল্; খাও, খাইয়া ফেল্; কাট্, কাটিয়া ফেল্; কর্, করিয়া তোল্; (কাপড়) তোল্, তুলিয়া ফেল্; শোন্, শুনাইয়া দেও; ধর্, ধরিয়া লও; শেষ কর্, শেষ করিয়া লও; লইয়া লও; দিয়া দেও; ইত্যাদির ফেল তোল রাখ প্রভৃতি ক্রিয়ার ধাত্বর্থ নাই। এই সকল ক্রিয়া ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদের পরে বসিয়া তাহার ধাত্বর্থ নিশ্চিত করে।

দেখা যায়, যা গা উঠ পড় দাঁড়া প্রভৃতি অকর্মক ধাতুর পদ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের এবং অকর্মক ধাতুর উত্তর ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদের পরে বসে। মার, ফেল, তুল, রাখ প্রভৃতি সকর্মক ধাতুর পদ সকর্মক ধাতুর উত্তর ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদের পরে বসে।* অন্য চারি ভাষাতেও এইরূপ সহচর-ক্রিয়া আছে।

৮৹ শব্দ শোনা যায়, চাঁদ দেখা যায়, প্রভৃতি উদাহরণে যায় ক্রিয়ার কর্তা, শোনা দেখা। শব্দ শোনা যায়—শব্দ-শ্রবণে বিঘ্ন নাই। দুই কারণে বিঘ্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। এক কারণ বাহ্য (যেমন দূরত্ব, বায়ুর প্রতিকূলতা, যন্ত্র দ্বারা হইলে যন্ত্রের দোষ), অন্য কারণ শ্রোতার অসমর্থতা (যেমন বধিরতা)। এই দ্ব্যর্থতা দূর করিতে হইলে বলিতে হয়, শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কিংবা শব্দ শুনিতে পারা যায়। অতএব যায় ক্রিয়ার মুখ্য কর্তা শোনা হইলেও শব্দও কর্তা। এইরূপ, চাঁদ দেখা যায় উদাহরণ হইতে বক্তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। যায় ক্রিয়াপদের ঘটে অর্থ সং য়া ধাতু হইতে আসিয়াছে।

৮/০ শব্দ শুনিয়া থাকি, চাঁদ দেখিয়া থাকি, প্রভৃতি উদাহরণে কর্মের নিত্যতা প্রকাশিত হয়। শুনিয়া থাকিব, শুনিয়া থাকিতাম—দুই বাক্যই অতীত কালের। কিন্তু থাকিব দ্বারা বিস্মৃতি, এবং থাকিতাম দ্বারা নিশ্চয় প্রকাশ পায়।

৮৴০ পরিশেষে বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালা বিভক্তি ও প্রত্যয়ের মূল সংস্কৃত হইলেও তাহাদের আকারের যেমন রূপান্তর হইয়াছে প্রয়োগ ও অর্থেরও অন্তর হইয়াছে। বাঙ্গালা বিভক্তি প্রত্যয়ের মূলনির্ণয়ে সংস্কৃত-প্রাকৃতের বিভক্তি প্রত্যয় স্মরণ রাখিতে হইবে। কারণ এ বিষয়ে বাঙ্গালা সংস্কৃত-প্রাকৃতের প্রাকৃত বলা যাইতে পারে। প্রাকৃতজন ব্যাকরণের ব্যতিক্রম মানে

---

* কাজ সারিয়া তোলা, কাজ সারিয়া ওঠা—এই দুই বাক্যের প্রথমটির অর্থ সম্পূর্ণ করা, দ্বিতীয়টির অর্থ শেষ করিয়া গাত্রোত্থান। কথাটা বোঝা দায়, কথাটা বুঝিয়া ওঠা দায়—প্রথমটি শুদ্ধ। দ্বিতীয়টিও শুদ্ধ; তখন অর্থ যেন কেহ কথাটা বুঝিবার নিমিত্ত বসিয়াছিল কিন্তু বুঝিতে পারিল না, গাত্রোত্থানও করিতে পারিল না। এই মূল অর্থ হইতে 'বুঝিয়া শেষ করা' অর্থেও কেহ কেহ প্রয়োগ করেন। কিন্তু 'বুঝিয়া তোলা' ভাল। কারণ বুঝ ধাতু সকর্মক, এবং সকর্মক ধাতুর পরে সকর্মক ক্রিয়া বসে।

না, সাদৃশ্য ও উচ্চারণ-সৌকর্য মানিয়া চলে। সং করোতি ভবতি—সো করোই হঅই—সে করই হঅই—সে করয় হঅয়—সে করে হএ। এই ই য় এ প্রাকৃতজন যাবতীয় ধাতুতে লাগাইয়া বাঙ্গালা বিভক্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সং শৃণোতি ক্রীণাতি প্রভৃতি কতকগুলি হইতে ণ (পরে ন) পাইয়া শুণোই কিণই, শুনোয় কিনয়, শুনে কিনে, অধুনা শোনে কেনে করিয়াছে। সং গতঃ পতিতঃ ভূতঃ মৃতঃ—সে গলা পড়িলা হেলা মলা বা মরিলা ইত্যাদির সাদৃশ্যে সং দত্তঃ দেলা, কৃতঃ করিলা, কথিতঃ কহিলা, হইয়াছে। দত্তঃ কৃতঃ কথিতঃ যে সকর্মক ধাতু হইতে আসিয়াছে, এবং সংস্কৃতে যে এই সকল ত-প্রত্যয়ান্ত সকর্মক ধাতু পদের কেবল কর্মবাচ্যে প্রয়োগ হয়, তাহা না জানিয়া কিংবা না মানিয়া যাবতীয় ধাতুর উত্তর ইলা বা ইল বিভক্তি চলিয়াছে। যাবতীয় স্থলে এইরূপ এক নিয়ম আসিতে দেখা যায়। বোধ হয় সাদৃশ্য দেখিয়া যাবতীয় ভাষায় বিভক্তি প্রত্যয়ের যোগ ঘটে। *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃৎ প্রত্যয়।

৭৮। আকারান্ত প্রত্যয়।

বানান।

/০ দেখা যায়, বাঙ্গালায় আকারান্ত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ অধিক আছে। সংস্কৃতে যে শব্দ অকারান্ত, বাঙ্গালায় অনুরূপ শব্দ প্রায়ই আকারান্ত। বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষার আদিম অবস্থায় অকারান্ত শব্দের শেষ অক্ষরে বল প্রযুক্ত হইত। তখন শব্দের শেষের অ-উচ্চারণ গ্রস্ত বা লুপ্ত হইত না।† কালে সে অকার দীর্ঘ হইয়া আকারে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালায় প্রায় যাবতীয় বিশেষণ শব্দের শেষের অ উচ্চারিত হয়, বিশেষ্যের

---

* শ্রীশ্রীনাথ-সেন মহাশয় সং আসীৎ পদ হইতে বাং আহীল,—আহিল, সং অকরোৎ পদ হইতে বাং করোল—করিল্—করিল পদ অনুমান করিয়াছেন। সং আসীৎ হইতে আহীল পদ সহজে আসে সত্য, কিন্তু আহিল—এই অকারান্ত পদ আসা সহজ নহে। আকারান্ত পদ প্রাচীন বাং এবং বর্ত্তমান আসাং ও হিং সং ভাষায় পাইতেছি। স্বরলোপ হইতে দীর্ঘ আ-স্বরযোগ অনুমান করিতে হইলে প্রমাণ আবশ্যক। ধ্বনি-সাম্য এবং শব্দশিক্ষার রূপান্তর-সূত্র পাইলেই কার্য-কারণ অনুমান দৃঢ় হয় না। প্রমাণ-অভাবে মনে হয়, সংস্কৃতের জটিল ক্রিয়া-বিভক্তি মূল হয় নাই। হয় ত ক্রিয়া-বিভক্তির সহিত কৃৎপ্রত্যয় মিশিয়া গিয়াছিল। পরে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

† বোধ হয়, শূন্যপুরাণে এই লক্ষণ আছে।

সংস্কৃত শব্দের অন্তস্থিত অনুস্বার ও বিসর্গ লোপের শেষ চিহ্ন বোধ হয়। কিন্তু বিশেষণে শেষের অ রহিল, বিশেষ্যে গেল কেন, তাহার কারণ অনুমান দুষ্কর। হয়ত প্রয়োগ-বাহুল্যে অকারান্ত বিশেষ্য ব্যঞ্জনান্ত হইয়াছে। ওড়িয়া ভাষায় এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

তন প্রায় হসন্ত হয় না। সে অকারে বল দিতে গিয়া আ আসিয়া থাকিবে। মনে রাখিতে হইবে এখন বাঙ্গালায় অ আ দুইটি পৃথক স্বর; অকার দীর্ঘ করিলে আ হয় না, কিংবা আকার হ্রস্ব করিলে অ হয় না। আ ইয়া উয়া আলা আড়া রা ড়া প্রভৃতি প্রত্যয়ের শেষের আকারের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। উচ্চারণ-দোষে আ স্থানে য়া, এবং য়া স্থানে আ আসিয়া পড়ে। সংপ্রাকৃতে সং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্ত্য ব্যঞ্জন স্থানে আ হইত। এই আ কোন কোন শব্দে য়া উচ্চারিত হইত। যথা, সং সরিৎ সংপ্রা° সরিয়া বা সরিআ। সংপ্রাকৃতে শব্দের উত্তর স্বার্থে ক প্রচুর বসিত। সেই ক স্থানেও বাঙ্গালায় আ আসিয়াছে। কেবল সংস্কৃত শব্দের রূপান্তরে আকার হয়, এমন নহে। ইংরেজী শব্দ 'কপি' বাঙ্গালায় কাপি, ইংরেজী 'কলেজ' বাঙ্গালায় কালেজ। ওড়িয়া ভাষায় প্রথম অক্ষরের অকার আ হয় না। বরং সংস্কৃত শব্দের প্রথম অক্ষরের আকার অ হয়। বা° ছাতা রাজা বাসা ওড়িয়াতে ছতা রজা বসা। আসামীতেও এইরূপ। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ওড়িয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে, কিন্তু তদ্ধিত-প্রত্যয়ে বাঙ্গালার ন্যায় আসামী ও ওড়িয়াতেও আ আসিয়াছে। হিন্দীতে চলনেরালা, চলনেহারা, দুগুণা, চৌগুণা ইত্যাদি আকারান্ত শব্দ আছে। অনাদরে মানুষের নামের শেষেও আ আসে। হরি—হরিআ, মধু—মধুআ। এই আকার ওড়িয়ায় আছে; বর্তমান বাঙ্গালায় (রাঢ়ে) ইআ স্থানে এ, উআ স্থানে ও হইয়া হ'রে, ম'ধো হইয়াছে। ইহাতেও অনুমান হয়, শব্দের শেষে আ আনা বর্তমান দেশ-ভাষার এক ধারা। তাকে জানান, শোনান হয়েছে,—জানান ও শোনান পদের শেষের ন সম্পূর্ণ অকারান্ত উচ্চারিত হয়। বর্তমান ছাপাখানার অক্ষর দ্বারা এই অকারান্ত ন জানাইবার উপায় নাই। এই হেতু কেহ কেহ ন পরিবর্তে নো লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার স্রোত পরিবর্তন করিতেছেন। কিন্তু আর এক উপায় আছে। রাঢ়ে অনেকে বলে, তাকে জানানা, শোনানা হয়েছে। বস্তুতঃ জানানা, শোনানা, দেখানা প্রভৃতি শব্দের সহিত জানা-পথ শোনা-কথা দেখা-দেশ, এবং পথ-জানা কথা-শোনা দেশ-দেখা ইত্যাদির আকারান্ত জানা শোনা দেখা শব্দের সাম্য আছে। পা-কামান বাকি আছে, পা কামান হয়েছে; রাত্রে খাওয়ান আছে, তাকে খাওয়ান হইবে; ইত্যাদি বাক্যে কামান খাওয়ান পদ বিশেষ্য কি বিশেষণ তাহা বানান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় না। বঙ্গের কোন কোন স্থানে এইরূপ নান্ত বিশেষণ শব্দও হসন্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। অক্ষরের অভাবে শব্দের উচ্চারণ-বিকার ঘটিতেছে। এই দোষ নিবারণ করিতে হইলে নূতন অক্ষর নির্মাণ আবশ্যক। আমার সামান্য বিবেচনায়, অন-প্রত্যয়ান্ত শব্দ অনা-প্রত্যয়ান্ত মনে করিলে ভাষায় দোষ ঘটিবে না। অনো অপেক্ষা অনা করা বাঙ্গালা ভাষার গতি বোধ হয়। (তদ্ধিত প্রত্যয় আ দেখ।)

৵০ শাঁসাল (ফল), জমকাল (পোষাক), ইত্যাদির উচ্চারণে কেহ কেহ অকারান্ত ল ঈষৎ ওকারান্ত করিয়া ফেলেন। ভাল (মানুষ), কাল (কাপড়) ইত্যাদিতে ও আনিয়া ফেলেন। তথাপি কালা(-পেড়ে) ধুতি, ছিয়ালা মানুষ, দুধালা গাই শুনিতে না পাওয়া যায়, এমন

নহে। ঘোরালা গোছালা ঝাঁজালা তেজালা ছুঁচালা ইত্যাদি আকারান্ত উচ্চারণ সহজে আসিয়া পড়ে। আরও কথা আছে। আমরা বুড়া খুড়া শব্দ বুড়ো খুড়ো (রাঢ়ে) উচ্চারণ করি। কিন্তু, বুড়ো খুড়ো শব্দ এ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার শব্দ বলিয়া গণ্য হয় নাই। তেমনই ছুঁচালা শব্দ উচ্চারণে ছুঁচালো হইতে পারে, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। অতএব বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ জানাইবার নিমিত্ত উপায় আবশ্যক। সে উপায় অকারান্ত অক্ষর উদ্ভাবন কিংবা আকারান্ত প্রত্যয় নির্দেশ। সংস্কৃত শব্দের বেলা প্রত্যয়-পরিবর্তন চলে না। তখন আবশ্যক হইলে বর্ণের নীচে 'মাত্রা' দেওয়া যাইবে। বাঙ্গালা-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দে আ যোগ করিলে মাত্রা আবশ্যক হইবে না। অন-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন অনেক বিশেষ্য শব্দও অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। সেখানে ন কিংবা না লেখা বই অন্য উপায় দেখি না।

৴৹ শিক্ষা-অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে, ই-পরস্থিত আকার এ উচ্চারিত হয়। যথা, পিঠা—পিঠে। উ পরস্থিত আকার ও উচ্চারিত হয়। যথা, খুড়া—খুড়ো। ই-পূর্বস্থিত অকার ঈষৎ ও উচ্চারিত হয়। যথা, চালনী—চালোনী। আ পরে আ, কিংবা আ পরে ইয়া থাকিলে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে উভয় স্থানে এ এ হয়। যথা, গাঁজাল—গেঁজেল, মাটিয়া—মেটে। আকারান্ত শব্দের উপান্ত্য অ ই উ প্রায়ই গ্রস্ত হয়। যথা, পিটনা—পিট্‌না, পানীতা—পান্‌তা, শকুনী—শকুনী। কোন্ কোন্ স্থলে উপান্ত্য আকারও গ্রস্ত হয়। যথা শুকানা (বা শুখানা)—শুক্‌না (বা শুখ্‌না), ছুঁচালা—ছুঁচ্‌লা। এ সকল বিষয় শিক্ষাধ্যায়ে দেখা গিয়াছে। স্মরণার্থে পুনর্বার উল্লেখ করা গেল।

৭৯। দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দ।

৹/৹ কৃৎ-প্রত্যয় আরম্ভে এমন শব্দের উল্লেখ করা যাইতেছে, যাহার ধাতুতে কোন্ প্রত্যয় লাগেনা। প্রত্যয়হীন শব্দ সংস্কৃতেও আছে। যথা, পরি-ষদ্, শাস্ত্র-বিদ্, কর্ম-কৃৎ, অগ্নি-চিৎ। বাঙ্গালায় কন্-কন, কল্-কল, টন্-টন, নড়্-নড় ইত্যাদি দ্বিরুক্ত শব্দে প্রত্যয় নাই। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ধাতু দ্বিরুক্ত হইয়া এই সকল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সং কণ ধাতুর অর্থ আর্তনাদ। এই ধাতু দ্বিরুক্ত করিয়া আমরা কন্-কন শব্দ পাইয়াছি। কৃৎ আ করিয়া কন্‌কনা (শীত), আনি করিয়া কন্-কনানি (ভাবে), এবং তদ্ধিত ইয়া করিয়া কন্‌কনিয়া বা কন্‌কন্তে (কন্‌কন ভাব-বিশিষ্ট) পাইয়াছি। শীতে হাত-পা কন্-কন করে,—অর্থাৎ হাতে পায়ে এত শীত বোধ হয় যে তাহার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে হয়। নদীর জল কল্‌কল শব্দে (সং কল্ ধাতু শব্দে, গতিতে) বহিয়া যায়, ফোড়া ফুলিয়া টন্‌টন (সং তন্ ধাতু বিস্তারে) করে, দাঁত আলগা হইয়া নড়্-নড় (সং নড্ ধাতু ভ্রংশে, পতনে) করে। নদীর কল্‌কলানি, ফোড়ার টন্-টনানি, দাঁতের নড়্-নড়ানি সবাই জানে। এইরূপ বহু ধাতু দ্বিরুক্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় ভাব-প্রকাশের অপূর্ব-ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে।

৸৹ শুধু বাঙ্গালা ভাষার কেন, ওড়িয়া হিন্দী ও মরাঠী ভাষাতেও এইরূপ দ্বিরুক্ত শব্দ আছে; কিন্তু ওড়িয়াতে অত্যল্প, হিন্দীতে তদপেক্ষা অধিক, এবং মরাঠী ও বাঙ্গালায় সমধিক। কতকগুলি দ্বিরুক্ত শব্দ এই চারি ভাষাতে এক; কারণ শব্দ-গুলির মূল সংস্কৃত। অপর কতক-গুলি এক এক ভাষার নিজস্ব বোধ হয়। কিন্তু ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে সংস্কৃত শব্দ চারি ভাষাতে একই ভাবে বিকৃত হয় নাই কিংবা শব্দের অর্থ-সম্প্রসারণ একই দিকে হয় নাই। মরাঠী ভাষায় এক বিশেষ এই, সে ভাষায় বহু দ্বিরুক্ত শব্দ ক্রিয়ার আকার ধারণ করে, বাঙ্গা-লাতে অল্পই করে, অধিকাংশের পরে কর্ ধাতুর পদ বসাইতে হয়। বাঙ্গালাতে কন্‌কনা-ইতেছে, টন্‌টনাইতেছে ইত্যাদি দুই একটা দ্বিরুক্ত-ক্রিয়া-পদ শোনা যায় বটে, কিন্তু অধি-কাংশের পরে কর্ ধাতু আবশ্যক হয়। পদ্যের ভাষা স্বতন্ত্র, ক্রিয়াপদ না থাকিলেও চলে, এবং আবশ্যক হইলে যে ধাতু দ্বিরুক্ত হয় সেই ধাতুর ক্রিয়াপদ বসাইতে পারা যায়। কবিকঙ্কণে, 'সাঁই সাঁই করি বাণ চলে ব্যোমপথে।' 'উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দোলমাল।' এইরূপ দ্বিরুক্ত-শব্দ-প্রয়োগে অনুপ্রাসপ্রিয় ভারতচন্দ্র পটু ছিলেন। নানা গুণ-বিশিষ্ট তাঁহার গ্রন্থে দ্বিরুক্ত শব্দ অনেক পাওয়া যায়।* 'হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥ ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝর-ঝরী। চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥ থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী। ঘুটঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী॥' ভারতচন্দ্রের দ্বিরুক্ত-শব্দ আলোচনা করিলে এইরূপ শব্দের প্রকৃতি পাওয়া যায়। জাহ্নবী ঝরে; তাই, 'ঝর্‌ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়।' মণি দীপ্তি পায়; তাই 'দপ্ দপ্ দপ দীপয়ে মণি।' ফণী গর্জে; তাই, 'গর্ গর্ গর গরজে ফণী।' সং তৄ ধাতু হইতে তারা শব্দ—যাহা দীপ্তি বিকিরণ করে; ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন, 'তর্ তর্ তর চাঁদমণ্ডল।' যিনি অনুপ্রাসের মিষ্টতায় অধিক লুব্ধ হইয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহাকে অনেক দ্বিরুক্ত শব্দ নূতন করিতে হইয়াছিল। ব্যাকরণের তুলাদণ্ডে, সকল শব্দ ঠিক বসে নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 'দল-মল দোলে মুণ্ডের মাল।' কিন্তু মালা কাহাকে দলিত ও মলিত করিতেছিল? মুণ্ড-মালা গুরুভার হইলে দেহ দলিত মলিত হইতে পারে। 'পিষ্টক পর্ব্বত কচমচিয়া'—ফলের মতন কাঁচা দ্রব্য চিবাইলে 'কচ্‌মচ' শুনি, এবং 'ভাজা পিঠা' নইলে 'কচ্‌মচ' করিয়া খাওয়া যায় না। 'সুশোভিত তরুলতা নবদল পাতে। তরতর থরথর ঝরঝর বাতে॥' এখানে নবদল বলিয়া আবার পাতা! এইরূপ দোষ আরও কয়েক স্থলে আছে। কিন্তু নবদল যদি বা তরতর অথবা থরথর করে, ঝরঝর করিতে পারে না। 'টল্‌টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।' ভূমিকম্পে নদী ও পুষ্করিণীর জল টল্‌টল করিতে পারে, কিন্তু মন্দ বাতে করে কি? †

* কবি মধুসূদন অনুপ্রাসের লোভে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিরুক্ত শব্দ-প্রয়োগে কুশলতা দেখান নাই। মেঘনাদবধ-কাব্যে গোটা কয়েক দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঝর ঝর ঝরে অবিরল অশ্রুধারা; 'মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে, 'ঝোলে তাহে অসিবর ঝল ঝল ঝলে। ধক্ ধক্‌ধকি; ঝল-মলি ঝলে; ক্ষিতি টলমলি; কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে; কাঁদে ছট্‌ফটি; ইত্যাদি।

† তিনি বহুস্থলে লিখিয়াছেন, 'কোকিল কুহারে। কিন্তু অজ্ঞাত কবির ভাষায়, কোকিল কুহরে, এবং আমরা

৵০ যাহা হউক, দেখা গেল দ্বিরুক্ত শব্দ আর কিছু নহে, প্রত্যয়-শূন্য ধাতু মাত্র। হর্ষ-শোক-ক্রোধ-বিস্ময়াদির আতিশয্যে মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিবার অবসর থাকে না, কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয়াদি মনে আসে না, কোন্ প্রকারে ধাতু মাত্র উচ্চারণ করিয়া গদ্‌গদ স্বরে বক্তব্য শেষ করিতে হয়। কর্মের পীড়নের সময় বলি আঃ, বিস্ময়ে বলি বাঃ। অন্যের কষ্ট দেখিলে বলি আহা, বিস্ময়ের কিছু হ্রাসে বলি বা-আ-বা (বাহাবা)। যে কারণেই হউক, মনের ভাব-প্রকাশে অসমর্থ হইলে মুখে কথা জোগায় না, দুই একটি যাহা জোগায় তাহা বলিয়াই নিরস্ত হইতে হয়। জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ (সং ধ্মা ধাতু) করে, রৌদ্রে বালি ধূ-ধূ (সং ধূ ধাতু) করে। পিপাসায় প্রাণ ধুক্-ধুক (সং ধুক্ষ ধাতু) করে। বর্ষাকালে পুষ্করিণীর জল থম্-থম (সং স্তম্ভ ধাতু) করে, পথ-ঘাট কাদায় পচ্‌পচ (সং পচ ধাতু) করে, তখন কখনও বৃষ্টি তড়্‌তড় (সং তট ধাতু কিংবা তনড ধাতু) করিয়া, কখনও ঝম্‌ঝম (সং ধম বা ধ্বন ধাতু) করিয়া পড়ে। কে জানে রোদ ঝাঁঝাঁ করে, কি আর কিছু করে। কিন্তু ইহা জানি রোদে কচি গাছ ঝামরিয়া যায়, এবং এই হেতু, বুঝি, রাধিকা বলিয়াছিলেন, 'নীলকমল ঝামরু হইয়াছে মলিন হইয়াছে দেহ' (চণ্ডীদাস)। রোদে বালির ধূ-ধূ করা বুঝি না বুঝি, আগুনে ধুনা পড়িলে ধুয়াঁ কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে উঠে। এইরূপ, যে সকল ধাতু হইতে ভাষার শব্দ পাইয়াছি, সেই সকল ধাতু হইতে দ্বিরুক্ত শব্দও পাইয়াছি। সংস্কৃতে পৌনঃপুন্য ও আতিশয্য অর্থে যঙন্ত ও যঙ্‌লুগন্ত ধাতু আছে। বাঙ্গালা দ্বিরুক্ত শব্দও সেইরূপ অর্থ প্রকাশ করে। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় প্রভেদ এই, সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া শব্দ হয়, বাঙ্গালাতে হলন্ত ধাতুর উত্তর কোন্ প্রত্যয় হয় না। কিংবা অ প্রত্যয় হয়, বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ রীতিতে অকারন্ত শব্দের অ উচ্চারিত হয় না। ইহাই ঠিক বোধ হয়। নতুবা কন্-কনিয়া, নড়্-বড়িয়া, ইত্যাদি শব্দ পাইতাম না। যে কারণ হউক ঝম্-ঝম বন্-বন টন্-টন সর্-সর ইত্যাদি শব্দে প্রত্যয়ের চিহ্ন দেখি না। এই হেতু এইরূপ শব্দকে দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দ বলিতেছি। দ্বিরুক্ত শব্দ বলিলে আরও শব্দ বুঝাইতে পারে। এই হেতু এক নূতন নাম ধাতু-শব্দ করিতে হইল।*

গদ্যের ভাষায় কোকিলের কুহু বলিয়া থাকি। ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন, 'হুঙ্কার ছাড়িয়া অম্বারে ডাকিয়া,'—এখনে ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়িবারই কথা।

* সন ১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাশয় 'বাঙ্গলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ' নামে এখানে বর্ণিত দ্বিরুক্ত ধাতুশব্দ আলোচনা করিয়াছেন। কতকগুলি শব্দ আলোচনার ফলে তিনি বলিয়াছেন যে সকল ধ্বন্যাত্মক শব্দে ধ্বনিমাত্র প্রকাশ হয় না। আমার সামান্য জ্ঞানে বোধ হইয়াছে, পশু পক্ষ্যাদির অনুকার-শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ কেবল ধ্বনি প্রকাশ করে না। হয়ত ভাষা-সৃষ্টির সময় শব্দ ধ্বনি-মাত্র থাকে, কিন্তু পরে তাহা অর্থাত্মক হইয়া পড়ে। কালক্রমে অর্থের বিকার প্রসারণ সংকোচন ঘটে; কিন্তু শব্দের আদিম অর্থ একেবারে লুপ্ত হয় না। যে-কোন শব্দ হউক, মূল অজ্ঞাত থাকিলে তাহা লোকমুখে স্থানভেদে বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কিন্তু মূল ধরিতে পারিলে অর্থ যেমন পরিস্ফুট হয়, শব্দ-বিকারের পথও তেমন রুদ্ধ হয়।

।০ শীতকালে দিবানিদ্রায় গা মাটি-মাটি করে। এই মাটি-মাটি শব্দ সং মৃত্তিকা নহে, সং মৃদু শব্দ। কোমল আর্দ্র তেজহীন পদার্থকে মৃদু বলা যায়। গা মাটি-মাটি করিলে শরীর আর্দ্র নিস্তেজ বোধ হয়। সং মৃদু হইতে মিটু-মিটু; ইহার বিকারে মাটি-মাটি। কিংবা সং মৃদ ধাতু হইতে মাটি-মাটি, এবং দ স্থানে জ করিয়া মেজ্-মেজ আসিয়াছে। বস্তুতঃ মূলে এবং অর্থে মাটি-মাটি এবং মেজ্-মেজ এক। সং মৃদ্ ধাতু হইতে মিট্-মিট শব্দও পাইয়াছি। তেল অল্প হইলে কিংবা শলিতা সরু হইলে দীপ মিট্-মিট করিয়া জ্বলে—অর্থাৎ আলো মৃদু হয়। আলো আরও মৃদু হইলে মিটি-মিটি বলি। মিট্-মিটা লোকও মৃদু-স্বভাব। গ্রাম্যজন তাহাকে মেদা বলে। কিন্তু কাঁসার বাসন দীপ্তিহীন হইলে মাটি-মাটি কিংবা মিট্-মিট করে না, মেঁড়্-মেঁড় করিতে পারে। ভাত খাইবার পর থালায় ভাত শুখাইলে থালা মেঁড়্-মেঁড় করে—যেন মণ্ডলিপ্ত দেখায়। বাস্তবিক ঈষৎ মণ্ডলিপ্ত হইয়া মাঁড়্ মাঁড় করে। এই মাঁড়্-মাঁড় শব্দের রাঢ়ীয় বিকারে ম্যাড়্-ম্যাড় এবং ক্রমে মেঁড়-মেঁড়, মেঁড়-মেঁড়িয়া, মেঁড়-মেঁড়ানি শব্দ আসিয়াছে। কাঁসার বাসন ঈষৎ মণ্ডলিপ্ত হইলে দীপ্তিহীন হয়, বহুকাল অমার্জিত হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিলেও হয়। তখন বলি বাসন মেঁড়্-মেঁড় করিতেছে।*

।/০ অতএব দেখা যাইতেছে, যাবতীয় দ্বিরুক্ত শব্দ এক জাতীয় নহে। দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দ এক জাতীয়, দ্বিরুক্ত সামান্য শব্দ অন্য জাতীয়। দ্বিরুক্ত ধাতুশব্দে ধাতুমাত্র থাকে, দ্বিরুক্ত সামান্য শব্দে প্রত্যয় থাকে। ধাতুশব্দ দ্বিরুক্ত হইলে পৌনঃপুন্য কিংবা অতিশয় অর্থ প্রকাশ করে, সামান্য শব্দ দ্বিরুক্ত হইলে ঈষৎ অর্থও প্রকাশ করে। স্পষ্ট জ্বর না হইলে বলি জ্বর-জ্বর, স্পষ্ট না কাঁদিলে বলি কাঁদ-কাঁদ, স্পষ্ট না ডুবিলে বলি ডুব-ডুব। বিশেষণ শব্দ দ্বিরুক্ত হইলে প্রকর্ষ অর্থ প্রকাশ করে। ভাল ভাল লোক, খাশা খাশা আম, গরম-গরম লুচী ইত্যাদিতে বিশেষণ প্রকর্ষ-বাচক। বহুলতা-বাচকও বটে। ইহা হইতে বোধ হয় দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দ বিশেষণ ও অব্যয় শ্রেণীতে পড়িবার যোগ্য। কাঁদ-কাঁদ, হাসি-হাসি (মুখ) প্রভৃতি শব্দ বিশেষণ।

।৵০ দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দের এক একটিতে ধ্বনি অর্থে অর্, আত্, আক্ আস্, আং প্রভৃতি প্রত্যয় লাগিয়া বহু ধ্বন্যাত্মক শব্দ হইয়াছে। এই সকল প্রত্যয় তদ্ধিতের মধ্যে ফেলায় সুবিধা আছে (১২০—৪)। যাহা হউক, কচ করিয়া কাটা, এবং কচ্‌কচ করিয়া কাটায় প্রভেদ এই প্রথমটি দ্বারা একবার, দ্বিতীয়টি দ্বারা বহুবার, অন্ততঃ দুই বার, কাটা বুঝায়। কচ্-কচ্-কচ বলিলে বহুবারত্ব স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। এ বিষয় নীচে দেখা যাইতেছে।

।৶০ এক একটি ধাতু-শব্দ হইতে অনেক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দেখা যায়, এ আ ও যোগে যাহা বুঝায়, অ যোগে তাহার অল্পতা বা মৃদুতা, ই যোগে তাহার অল্পতা, উ যোগে তাহারও অল্পতা বুঝায়। প্রত্যেক শব্দের যে এত প্রকার প্রয়োগ আছে, তাহা নহে।

---

* দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দের বানানে দ্বিতীয় শব্দের শেষ ব্যঞ্জনে হসন্ত চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ নিয়মে সে ব্যঞ্জন হসন্ত উচ্চারিত হয়। সং মণ্ড হইতে মাড় নহে, মাঁড় শব্দ হইয়াছে।

গজ্‌গজ, গিজ্‌গিজ, গুজ্‌গুজ ; ফস্‌ফস, ফিস্‌ফিস, ফুস্‌ফুস ; সর্‌সর, সির্‌সির, সুর্‌সুর ; কড়্‌কড়, কুড়্‌কুড় ; খল্‌খল, খিল্‌খিল ; চক্‌চক, চিক্‌চিক ; ঝর্‌ঝর, ঝির্‌ঝির, ঝুর্‌ঝুর ; ইত্যাদি। খল্‌খল করিয়া হাসা আর খিল্‌খিল করিয়া হাসার মধ্যে খিল্‌খিল হাসা মৃদু। এইরূপ অন্যান্য শব্দে।

॥০ কোন কোন স্থলে দ্বিরুক্ত শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকের শেষে ই কিংবা উ যোগ করিলে অল্পতা বা মৃদুতা বুঝায়। যথা, কবিকঙ্কণে, 'বক্ষের কাঁচলি করে ঝিলিমিলী, শোভিছে অঙ্গ ছটায়।' 'বিভূতি মাখেন গায় ঝিমিকে ঝিমিকে যায়, ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল।' ঝল্‌মল, ঝিল্‌মিল এবং ঝিলিমিলি—এই তিন শব্দের মূল ভাব এক, কিন্তু অকার ইকার স্বরভেদে ঝলমলের বিস্তার ঝিল্‌মিলে থাকে না, এবং ঝিল্‌মিলের দ্রুততা ঝিলিমিলিতে নাই। স্বরের উচ্চারণ-গতি দ্বারা ক্রিয়ারও গতি প্রকাশিত হয়।

॥/০ একটি শব্দ একবার না বলিয়া তিনবার বলিলে শব্দের উচ্চারণে যেমন একটু একটু বিরাম ঘটে, অর্থেও সেই প্রকার ধীরগতি বা বিরাম বুঝায়। যথা, রামপ্রসাদের শিবসঙ্গীতে, 'শিঙ্গা করিতেছে ভোঁ ভোঁ ভোঁ বমম্‌ বমম্‌॥ আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি নয়নে জ্বলে অনল ধিকি ধিকি ধিকি, প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥ বদনইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল, লহরী উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া॥' ভোঁ ভোঁ ভোঁ, ধিকি ধিকি ধিকি, থাকি থাকি থাকি, ঢল ঢল ঢল ইত্যাদি দ্বারা মৃদুতার সঙ্গে সঙ্গে কালের দীর্ঘতা বুঝাইতেছে। অথবা কালের দীর্ঘতা হেতু মৃদুতা বুঝাইতেছে। ঢল্‌ ঢল্‌ ঢল্‌ না পড়িয়া ঢল ঢল ঢল পড়িলে মৃদুভাব আরও স্পষ্ট হয়। আঁখি ঢল ঢল, আঁখি ঢুল ঢুল, এবং আঁখি ঢুলু ঢুলু—আঁখির বিস্তারের ক্রমশঃ হ্রাস বুঝাইতেছে।

॥৵০ অতএব গতির প্রাবল্যে একটি শব্দ, যেমন পট করিয়া ছেঁড়া, কট করিয়া কামড়ানা; প্রাবল্যের কিঞ্চিৎ হ্রাসে দুইটি শব্দ—পট্‌ পট করিয়া ছেঁড়া, কট্‌ কট করিয়া কামড়ানা ; এবং প্রাবল্যের বিরামে তিনটি শব্দ—পট্‌ পট্‌ পট করিয়া ছেঁড়া, কট্‌ কট্‌ কট করিয়া কামড়ানা। পট্‌ ছেঁড়াতে একবার ছেঁড়া, পট্‌ পট ছেঁড়াতে অন্ততঃ দুই বার, এবং পট্‌ পট্‌ পট ছেঁড়াতে বহুবার ছেঁড়া বুঝাইতেছে। ঘট্‌ করিয়া জল-পান, ঘট্‌ ঘট করিয়া জল-পান, এবং ঘট্‌ ঘট্‌ ঘট করিয়া জল-পান বলিলে কর্মের ক্রমিক কাল-বৃদ্ধি বুঝায়।

॥৶০ কর্মে পৌনঃপুন্য স্পষ্ট বুঝাইতে প্রথম শব্দে আ যুক্ত হয়। আ যোগে পরে কর্‌ ধাতু আবশ্যক হয় না। যথা, গপ্‌গপ করিয়া সন্দেশ গেলা, আর গপাগপ গেলা। যে গপ্‌গপ করিয়া গেলে সে বহুবার গেলে সত্য ; কিন্তু যে গপাগপ গিলিতে থাকে সে যে বহু সন্দেশ উদরসাৎ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। গপাগপ গিলিতে অধিক কাল লাগে, কাজেই বহুত্ব প্রকাশিত হয়। আ যোগে স্বর দীর্ঘ হয়, অর্থও প্রসারিত হয়। এইরূপ, খচ্‌খচ করিয়া লেখা আর খচাখচ লেখা ; খট্‌খট করিয়া চলা আর খটাখট চলা। অবর্ণাদি শব্দে আ যোগ হয়, অন্য স্বরাদি শব্দে হয় না। দুমদুম করিয়া কীল, কিন্তু দমাদম কীল।

৸০ কর্মের ব্যস্ততায় শব্দও ব্যস্ত হয়। টল্‌টল আর টলমল, ছট্‌ছট আর ছট্‌ফট, ধড়-

ড় আর ধড়্ফড়, দড়্দড় আর দড়্বড়, কড়্কড় আর কড়্মড়, কিল্কিল আর কিল্বিল, নড়্নড় আর নড়্বড়, হড়্হড় আর হড়মড়, ইত্যাদির দ্বিতীয়টি দ্বারা গতির সুব্যবস্থা না বুঝাইয়া ব্যস্ততা বুঝায়। মানুষ কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহার আহারাদির বসনেরও যেমন সুব্যবস্থা থাকে না, হর্ষ-ভয়-শোকাদির আতিশয্যে শব্দেরও থাকে না। এইহেতু শব্দের ব্যস্ততা দ্বারা কর্মের বা ভাবেরও ব্যস্ততা প্রকাশিত হয়। ভারতচন্দ্রে, 'লটাপট-জটাজুট-সংঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা।' কিন্তু দেখা যায় এই ব্যস্ততার মধ্যে ব্যবস্থা আছে। কারণ টল্মল, দল্মল, ঝল্মল ইত্যাদির দ্বিতীয় শব্দ অর্থযুক্ত ধাতু-শব্দ। বস্তুতঃ দ্বিরুক্ত ব্যস্ত শব্দ সহচর ও অনুচর শব্দের তুল্য (১৫০ দেখ)। এইহেতু ইচ্ছা করিলেই এরূপ শব্দ গড়িতে পারা যায় না, এবং সাবধান না হইলে প্রয়োগে ভুল ঘটিয়া থাকে।

৬/০ আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অধিকাংশ দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দে গতি বুঝায়। সুতরাং এরূপ শব্দকে গত্যাত্মকও বলিতে পারা যায়। স্থিতির পৌনঃপুন্য ভাব থাকিতে পারে না; কারণ স্থিতি-পরিবর্তনের নাম গতি। এইহেতু এক একটি শব্দ দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থিতি বুঝায় এবং স্থিত্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ অসম্ভব বলিতে পারা যায়।

৮০। অ আ।

/০ সংস্কৃতে অ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ অতিশয় অধিক; বাঙ্গালায় আ-প্রত্যয়ান্ত অতিশয় অধিক, অ-প্রত্যয়ান্ত অল্প। সংস্কৃতে অ-প্রত্যয় করিবার সময় ধাতুর গুণ বৃদ্ধি অভ্যাসাদি নানা পরিবর্তন হয়। ক্রুশ যুগ শুচ প্রভৃতি অত্যল্প শব্দে সেরূপ পরিবর্তন হয় নাই। সংস্কৃতে আ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রায়ই অ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ। স্পৃহা, শঙ্কা, ক্ষুধা প্রভৃতি কতকগুলি আ-প্রত্যয়ান্ত আছে, কিন্তু ধাতুর গুণ বৃদ্ধি নাই।

৵০ বাঙ্গালায় কৃৎ অ আ যোগে ধাতুর ই স্থানে এ, উ স্থানে ও, এবং কদাচিৎ অ স্থানে আ হয়। কোন কোন শব্দে এই নিয়মের বিকল্প দেখা যায়। রাঢ়ের পশ্চিমাংশে (যেমন মেদিনীপুর বাঁকুড়ায়) স্বরের গুণ কম হয়, পূর্বাংশে (যেমন হুগলী জেলায়) বেশী হয়। কেহ বলে, বুঝা শুনা লিখা মিশা; অনেকে বলে, বোঝা শোনা লেখা মেশা। লিখা-পড়া, বুঝা-পড়া, কিনা-বিচা, শুয়া-বসা কিংবা লিখা কাগজ, শুনা কথা, ধুয়া কাপড় কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতের অ প্রত্যয় স্থানে বাঙ্গালা আ প্রত্যয় হইয়াছে। তদনুসারেও স্বরের গুণ করা ভাল বোধ হয়। এখানে এইরূপ করা যাইবে।

৶০ বাঙ্গালায় অ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ-রচনা আবশ্যক হয় না। কারণ জীব মেঘ সর্প বোধ সর্গ ক্রোধ জয় প্রভৃতি সংস্কৃত অ-প্রত্যয়ান্ত অসংখ্য শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিত্য প্রযোজ্য হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর আ-প্রত্যয়-সিদ্ধ শব্দ অল্প নহে। সামান্য ধাতুর উত্তর আ-প্রত্যয় হয়, আত্ম ও নাম ধাতুর উত্তর হয় না। কিন্তু সামান্য ধাতু অল্প নহে।

কি কি বাচ্যে প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এক এক বাচ্য ধরিয়া

৬

উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু এমন নয় যে এক এক ধাতু কেবল একটি বাচ্যে প্রত্যয় পায়, অন্য বাচ্যে পায় না।

।০ ভাববাচ্যে, যথা, চল্—চল, চাল; বাছ্—বাছ, বাছা; লাগ্—লাগ লাগা; আছাড়্—আছাড়; খা—খাআ (খাওয়া); গিল্—গেলা; শু—শোআ (শোওয়া); গুঁজ্—গোঁজা; ঘুর্—ঘোর, ঘোরা; কিন্—কেনা; বিচ—বেচা; উল—ওলা; উঠ্—ওঠা।

।/০ কর্মবাচ্যে, যথা, আঁক্—আঁক (কথা), আঁকা; আজড়্—আজড়া (-কাপড়); গুঁজ—গোঁজ; তুল্—তোলা; টিপ্—টীপ (কপালে); ঝুড়—ঝোড়া (বাঁশের); ভাজ—ভাজা; ইত্যাদি।

।৵০ কর্তৃবাচ্যে, যথা, ঝর্—ঝর (নির্ঝর), ঝরা; ঝড়্—ঝড়া (-ধান); বেড়্—বেড়া (-আগুন); মর্—মরা (-গাছ); পাক্—পাকা (-আম); বহ্—বহা (-জল,-স্রোত); ইত্যাদি।

।৶০ করণবাচ্যে, যথা, ধু—ধোআ (চাল-ধোআ ধুচনী); ধর্—ধরা (মাছ-ধরা কাঁটা); কাট্—কাটা (কলম-কাটা ছুরী); ইত্যাদি।

॥০ অধিকরণবাচ্যে, যথা, কাচ্—কাচা (কাপড়-কাচা পাটা); রাখ্—রাখা (দীপরাখা—দেরখা); পাক্—পাকা (গাছ-পাকা); ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, চাল-ধোআ, মাছ-ধরা, গাছ-পাকা ইত্যাদি শব্দ সমাসসিদ্ধ হইয়াছে।

॥/০ লাগ, গোঁজ আঁক প্রভৃতি শব্দ বাস্তবিক অকারান্ত। কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ নিয়মে হলন্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। অ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর উয়া ইয়া তদ্ধিত প্রত্যয় যত হয়, আ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর তত হয় না। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে।

॥৵০ এক-অক্ষর-জাত ধাতুর উত্তরও আ হয়। লআ হআ শোআ ধোআ দেআ নেআ ইত্যাদি। আমরা লিখিবার সময় আ স্থানে ওয়া লিখিয়া ধোওয়া দেওয়া করি। আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর আ করিলে দুই আ মিলিয়া যায়। এই আশঙ্কায় খাআ গাআ যাআ উচ্চারণও পরিবর্তিত হইয়া খাওয়া গাওয়া যাওয়া হইয়াছে। তথাপি বহুলোকে খাআ গাআ যাআ বলে। ব্যাকরণ অনুসারে আ বানান ও উচ্চারণ শুদ্ধ বোধ হয়। ইবা প্রত্যয়ের ই লোপে বা থাকে। সেই বা ৱা-আকারে আসিয়া আ ও ইবা প্রত্যয়ের প্রভেদ লোপ করিয়াছে। ল ধাতু হইতে লআ এবং লইবা—লৱা—লওয়া; খা—খাআ এবং খাইবা—খাৱা—খাওয়া; ধু—ধোআ এবং ধুইবা—ধোৱা—ধোওয়া; ইত্যাদি। আসামীতে খা ধাতু হইতে খোওয়া, শু হইতে শোওয়া, নি হইতে নিয়া, ইত্যাদি হইয়াছে। (আসামীতে ওয়া না লিখিয়া ৱা লেখা হয়।) বোধ হয়, হিন্দীর প্রভাবে হওয়া, খাওয়া, দেওয়া শোওয়া ইত্যাদি উচ্চারণ ও বানান আসিয়াছে। ওড়িয়াতে দিআ (বাং দেআ), খিআ-পিআ (বাং খাআ ও পান করা)।

॥৶০ নিম্নলিখিত উদাহরণে কর্তৃবাচ্যে অ মনে করা যাইতে পারে। কাঁদ্—কাঁদ মুখ,

নিব্‌-নিব্‌ দীপ, ডুবু-ডুবু কলসী। অকারান্ত উচ্চারিত হয় বলিয়া এ গুলিকে অপ্রত্যয়ান্ত পদ বলা যাইতেছে। নতুবা বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ বলা সঙ্গত। যে মুখ কাঁদি কাঁদি করে, তাহা কাঁদ্‌- কাঁদ্‌; যে দীপ (যেন) বলে—আমি নিবি নিবি—সে দীপ নিব্‌-নিব্‌। এইরূপ ছুঁই-ছুঁই করা, যাই-যাই করা। নৌকা যায়-যায় হয়েছে, বিবাহ হয়-হয় হ'ল না, বৃষ্টি হবে-হবে হ'ল না। অতএব যে-কোন কালের ক্রিয়াপদ দ্বিরুক্ত হইতে পারে এবং হইলে আসন্ন সম্ভাবনা বুঝায়। কাঁদি-কাঁদি নিবি-নিবি হইতে কাঁদ্‌ কাঁদ্‌, নিব্‌-নিব্‌, (শেষের ই লোপে)। ই লোপ করিয়া অ, ই লোপ করিয়া উ বসাইলে ক্রমশঃ অল্পতা বুঝায়। কবিকঙ্কণে, 'ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা'—যেন ডুবিতে অল্প বাকি আছে। ডিঙ্গা ডুবু-ডুবু করিতে পারে, বৃহৎ জাহাজ পারে না। জাহাজের ন্যায় বৃহৎ বস্তু ডুব্‌-ডুব্‌ হইতে পারে। যদি হয়, তখন সে বস্তু ক্ষুদ্র বোধ হয়। চণ্ডীদাসে, 'ডুবু-ডুবু করি ডুবিয়া না মরি, উঠিতে নারি যে কূলে'—এখানে প্রায় সমস্ত শরীর জল-নিমগ্ন, অত্যল্প দেখা যাইতেছে।

৷৹ বাঙ্গালা এই আ প্রত্যয়ের মূল প্রায়ই সংস্কৃত ত প্রত্যয়। যথা, সং মৃত—বাং মরা, ধৃত—বাং ধরা, ধৌত—ধোআ, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই সকল শব্দ বাঙ্গালাতেও বিশেষণ।

৮১। ইবা, বা।

/০ ভাববাচ্যে যাবতীয় ধাতুর উত্তর ইবা প্রত্যয় হয়। আমার করিবার কাজ নাই, তোমার গান শুনিবার জন্য উৎসুক ইত্যাদি উদাহরণে করিবা, শুনিবা বিশেষ্য সম্বন্ধে র বিভক্তি বসিয়াছে। কাজ করার কথা আছে, ছিল; কাজ করিবার কথা আছে ছিল; গান শোনার জন্য উৎসুক, গান শুনিবার জন্য উৎসুক,—ইত্যাদিতে করা শোনা বর্তমান কাল, করিবা শুনিবা ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতেছে। অর্থাৎ কর ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে ভাববাচ্যে আ—করা; ভবিষ্যৎ কালে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদে ভাববাচ্যে আ—করিবা। বর্তমান বাঙ্গালায় কেবল সম্বন্ধ পদ প্রযোগের সময় ইবা, এবং সম্বন্ধ পদ ও কারক-পদ-প্রয়োগের সময় আ লাগে। আকারান্ত ধাতুর উত্তর ইবা বসিলে ই লুপ্ত হইতে পারে। খাইবার খাবার, খাআইবার—খাআবার (বা খাওয়াবার)।* করা শব্দে কারকের তে বিভক্তি-যোগে করাতে, করায়—করা হেতু, করা বিষয়ে। গান করাতে কিংবা গান করায় প্রীত হইলাম—গান হেতু, গান বিষয়ে। তোমার আসাতে, আসার কাজ হইল—আসা হেতু, তোমার আগমনে। অর্থাৎ করিবা, আসিবা—এই ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদে তে বসিয়া হেত্বর্থ-প্রকাশ করে। বঙ্গের কোন কোন স্থানে অদ্যাপি করিবাতে, করিবারে পদ বহু প্রচলিত আছে।† ওড়িয়াতে করিবা আসিবা যিবা বসিবা ইত্যাদি বাং করা আসা যাওয়া বসা ইত্যাদির স্থানীয়। আসামীতে ইবা না হইয়া ইব,

* ইলোপে হবা—হবা—হওয়া, দিবা—দিবা—দিওয়া—দেওয়া। এইরূপ, কোন কোন ধাতুতে আ ওয়া মিশিয়া গিয়াছে।

† করিবাতে করিবারে হুগলী জেলার অশিক্ষিত পত্র-লেখকের পত্রে পাইয়াছি।

এবং স্বরান্ত ধাতুতে ই লোপে কেবল ব বসে। বা॰ বুঝিবার—আ॰ বুজিবর, বা॰ জানিবার—আ॰ জনাবর, ইত্যাদি।

৵৹ বর্তমান বাঙ্গালায় ইবা দ্বারা কেবল ভবিষ্যৎ কালের অর্থ না বুঝাইয়া বর্তমান কালেরও অর্থ বুঝায়। ক্রিয়া-বিভক্তিতেও ভবিষ্যৎ ও বর্তমান মিশিয়া যায় (লকারার্থ দেখ)। কাজ করিবার সময় গল্প করিও না, কাজ করার সময় গল্প করিবে না—দুইই বলা চলে। কিন্তু, যেখানে ভবিষ্যৎ কাল নিশ্চিত আছে, সেখানে আ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ঠিক হয় না। তাহাঁর আসিবার দিনস্থির হয় নাই, আসিবার সময় বলিবে ইত্যাদি উদাহরণে 'আসার' পদ ঠিক হয় না। লিখিত ভাষায় সম্বন্ধ পদ আবশ্যক হইলে ইবা প্রত্যয়ান্ত পদ সর্বদা বসে।

৶৹ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য করিতে হইলে আ ইবা অন প্রভৃতি প্রত্যয় আছে। খাআর (খাওয়ার), দেআর (দেওয়ার), শোআর (শোওয়ার) ; খাবার, দিবার, শুবার ; খাইবার, দি (ই) বার, শুইবার ; করার, করিবার, শোনার, শুনিবার ; করাইবার, পাঠাইবার, বেড়াই-বার ; করানর, পাঠানর, বেড়ানর, প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যাবতীয় ধাতুর উত্তর ইবা (কথিত ভাষায় সংক্ষেপে বা) প্রত্যয় হয়। খাঅন দেঅন শুঅন ইত্যাদি শব্দ পুরানা বাঙ্গালায় পাওয়া যায় এবং বঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অতএব স॰ করণ (কৃ ধাতু+অন)=বা॰ করা করিবা করন ; ও॰ করিবা ; হি॰ করনা ; ম॰ করণেঁ। বাঁচা—বাঁচিবা—বাঁচআ বা বাঁচোয়া ; আগাইবা—আগবা—আগআ বা আগোয়া ; চড়িবা—চড়আ বা চড়োয়া প্রভৃতি দুই চারিটি শব্দ ইবা প্রত্যয়ের ই লোপে ও বা স্থানে য়া আগমে আসিয়া থাকিবে (৯০।৵৹ দেখ)।

২। অন, অনা, অনি।

।৹ সংস্কৃতে অন প্রত্যয়ান্ত শব্দের যেমন বাহুল্য আছে, বাঙ্গালাতেও তেমন আছে। সামান্য, আন্ত, ও নাম ধাতু—এই ত্রিবিধ ধাতুর উত্তর বাঙ্গালাতে ঐ তিন প্রত্যয় হয়। প্রত্যয়ের যোগ-সময়ে ধাতুর পরিবর্তন হয় না। আন্ত ও নাম ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় হইলে অন অকারান্ত উচ্চারিত হয়, কদাচিৎ হলন্ত হয়। বিশেষণ হইলে কদাপি হলন্ত হয় না। তখন অন প্রত্যয় না করিয়া অনা প্রত্যয় করা চলে। এই রীতি এখানে ধরা যাইবে। কোন কোন স্থলে ন্ লিখিয়াও অকারান্ত জানান্ যাইতে পারে (১৪০ পৃঃ)। এখন উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

৵৹ ভাববাচ্যে ; যথা, ফলন বাঁধন বিঁধন ঘুরন সৃজন বেলন, কাটনা ধরনা বাঁধনা ; চলনি গাঁথনি বিননি বুননি ঘুরনি, ইত্যাদি। চণ্ডীদাসের, 'হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি কি দিতে হইবে ভাল।' 'কিবা সে চাহনি ভুবন ভুলনি দোলনি গলে বনমালা।' এখানে ভুলনি যেমন আছে, তেমন পোড়নি ও দোলনি আছে। কিন্তু পুড়নি ও দুলনি শুনি। কি শুনন শুনিয়েছি—'শোনন' বলি না। আন্ত ও নাম ধাতু—করানা লেখানা বদলানা কন্‌কনানা দাষানা

রাঙ্গানি কামড়ানি হাঁপানি, ইত্যাদি। বিশেষ্যে কোন্ কোন্ শব্দে অন প্রত্যয়। যথা, জানান্, জোগান্, খাআন্।

৶০ কর্মবাচ্যে; যথা, পাড়ন পাতন জ্বালন; বাটনা কুটনা ফেলনা ইত্যাদি। পাওনা। দেঅনা—দেনা, এখানে দিঅনা হইতে দেঅনা মনে করা যাইতে পারে। রাখনী (রক্ষিতা স্ত্রী, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ)। আন্ত ও নাম ধাতু,—বাজনা; করানা জানানা দেখানা ইত্যাদি। বিশেষ্যে, চাপান্ কাটান্।

।০ করণবাচ্যে; যথা, ঝাড়ন পিটনা চালনা ছাঁকনা দোলনা ঝুলনা ঠেকনা দাগনি ছাঁকনি কুরনি বেলনা ঢাকনি খেলনা। আন্ত ও নাম ধাতু,—পারানি, নিড়ানি, মুখদেখানি, শয্যাতোলানি।

।/০ কর্তৃবাচ্যে; যথা, রাঁধনী দিঅনী নাচনী (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ)। আন্ত ধাতু,—ঘুমপাড়ানী পাড়া-বেড়ানী (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ)।

।৶০ তিন অক্ষরের শব্দের শেষস্বর আ হইলে পূর্ব অ স্বর প্রায়ই গ্রস্ত হয় (১৯সূঃ)। এই নিয়মে বাজ্না পিট্না দাগ্নি ইত্যাদি উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু, বাজনা পিটনা দাগনি উচ্চারণ করিলে ভাষায় কোন দোষ হয় না। এই হেতু মধ্যব্যঞ্জনে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া ব্যাকরণ-সঙ্গত নহে।

।৷/০ করণবাচ্যে দাগনি ছাঁকনি কুরনি ইত্যাদিতে অনি প্রত্যয় পরিবর্তে দাগন ছাঁকন কুরন শব্দে তদ্ধিত ঈ প্রত্যয় মনে করা চলে। তখন দাগনী, ছাঁকনী, কুরনী। সংস্কৃতে ধরণি ও ধরণী, সরণি ও সরণী ইত্যাদি শব্দের বানানে ই কিংবা ঈ লেখা চলে। সংস্কৃতে ই ঈ কারের উচ্চারণ এক ছিল না। কেহ ধরণি কেহ ধরণী, এইরূপ উচ্চারণ না করিলে বানানের প্রভেদ আসিত না। বাঙ্গালার উচ্চারণ ধরিলে দাগনি ছাঁকনি ইত্যাদি ইকারান্ত লেখা আবশ্যক। কিন্তু অন্য কোন্ শব্দে আমরা ঈ উচ্চারণ করি? অথচ এই ঈ ত্যাগ করিতে পারি না। ঈকারান্ত করিলে সুবিধা আছে। করণার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় ঈ আছে (৯৩৶০)। সেখানে ই লেখা চলে না। শব্দের বানান এক রাখা ভাল। অতএব করণার্থে অনি এবং অনী না রাখিয়া অনী রাখাই যুক্তি-সঙ্গত। আসামীতে অনী বানান চলিত হইতেছে। তুং সং লেখনী, চালনী, ধারণী, ইত্যাদি।

॥০ ওড়িয়াতে অনি ইনি উনি প্রত্যয় হয়। যথা ছাঅনি, বাজিণি (বাং বাজনা), সাজিণি (বাং সাজন), কান্দুণি (বাং কাঁদনি), রান্ধুণি, দেখুণি। ওড়িয়া ভাষা উনি ইণির অনুরাগী। আসামীতে অকারান্ত ধাতুর উত্তর উনি হয়। যথা, খাউনি, পাউনি ছাউনি। আসামী ভাষা উ ও কারের পক্ষপাতী। বাঙ্গালাতেও কেহ কেহ অনি কে উনি করিয়া ফেলেন। সং চালনী, তাঁহারা লেখেন চালুনী। এইরূপ, তাঁহারা লেখেন চিরুণী, বকুনী। তাঁহারা ভুলিয়া যান শেষে ই থাকাতে অকার ঈষৎ ওকার উচ্চারিত হয়। কিন্তু তা বলিয়া উকার উচ্চারণ কিংবা বানান শুদ্ধ বলিতে পারা যায় না।

৷৴০ উচ্চারণ-নিয়মে ধরনা—ধর্না—ধন্না, ঘরকরনা—ঘরকর্না—ঘরকন্না, রাঁধনা—রান্না, বাড়না—বান্না (যেমন রান্না-বান্না), কাঁদনা—কান্না ইত্যাদি হইয়াছে। কিন্তু দাগনী—দাগ্‌নী উচ্চারিত হইলেও দা-ন্নী নহে। পিটনা রাঢ়ীয় উচ্চারণে পিট্‌নে (যেমন পিঠা—পিঠে)। কিন্তু তা বলিয়া পিট্‌নে লেখা অশুদ্ধ।

৷৵০ বাঙ্গালায় ণকারের উচ্চারণ নকারের তুল্য। সুতরাং বাঙ্গালা শব্দে সংস্কৃত-ব্যাকরণের ণত্ববিধান হাস্যজনক পাণ্ডিত্য-প্রকাশ।

৮৩। ই।

/০ সংস্কৃতে ইপ্রত্যয়ান্ত শব্দ অনেক আছে। বাঙ্গালায় অল্প। অনেক শব্দ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। যথা, রুচি, কৃষি, রাশি, পাণি। বাঙ্গালায়,

৵০ ভাববাচ্যে, যথা, কচ্‌কচি, মড়্‌মড়ি, দড়্‌বড়ি, টিটকারি, বোলি বা বুলি। কবিকং, 'গর্ত্তের ভিতরে থাকি লুকি ভাল জানি।' কিন্তু লুকি আজকাল শুনি না। মারা-মারি, ধরা-ধরি, লাঠা-লাঠি প্রভৃতি শব্দের শেষের ই, মার, ধর, লাঠা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর বসিয়াছে। (তদ্ধিত প্রত্যয় ই দেখ)।

৶০ কর্ম্মবাচ্যে, যথা চুষি (-কাঠি, ছেলেদের), ঘষি (ঘষিয়া দেওয়া হয় যে গোবর)।

।০ কর্ত্তৃবাচ্যে, যথা, চষি-পোকা (খস), ঝুলি, ঝুরি, মুড়ি, চড়্‌চড়ি, পিচকারি ঝুমঝুমি। (সং হাস্য হইতে হাসি (য় স্থানে ই), যেমন সং চৌর্য হইতে চোরি—চুরি।)

৮৪। অত, ইত।

/০ সংস্কৃতে দত্ত গত জীবিত পতিত প্রভৃতি ত ইত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বহুপ্রসিদ্ধ। লোহিত দুঃখিত কুসুমিত প্রভৃতি তদ্ধিত ইত-প্রত্যয়ান্ত শব্দও আছে। বাঙ্গালায় ইত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ অত্যল্প আছে। ইত-প্রত্যয়ের রূপান্তর অত। অত-প্রত্যয়ান্ত শব্দও অল্প আছে। কারণ আ-প্রত্যয় দ্বারা সং ত ইত প্রত্যয়ের কাজ হয়। সং মৃত বাং মরা মড়া ওং মলা; সং গত বাং গেল ওং গলা (যেমন গত কল্য—বাং গেল কাল, ওং গলা কালি)। বাঙ্গালায় জানিত মানিত (লোক)। কবিকঙ্কনে 'অর্দ্ধ কেশ আঁচড়িত লঘুগতি ধায়'। কিন্তু আঁচড়িত কিংবা তৎতুল্য শব্দ চলিত নাই। সং একত্রীকৃত হইতে বাং একত্রিত।

৵০ বাং কহত প্রমাণ সং কথিত প্রমাণ। বোধ হয় বাং কহিত হইতে কহত। এই-রূপ ফেরত, কালত,—কিরিত, কেলিত মনে করা যাইতে পারে। চষত (জমি), যে জমি চষা হইয়াছে কিংবা চষা হইয়া থাকে। বসত বাড়ী—বসিত অপেক্ষা বসতি শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়। উচ্চারণে কহৎ চষৎ বসৎ হইয়া গিয়াছে। তু· সং চলিত্‌ বাং উচ্চারণে চলিৎ।

এই সকল শব্দ ত দিয়া লেখা উচিত। সং অজ্ঞানতঃ শব্দের বিকারে বাং অজানত, অজান্তো (উং অজান্তে) এবং জ্ঞানতঃ জান্তা (উং জান্তে যেমন জান্তে পাপ করা) হইয়াছে।

৮৫। তা, তি।

৵৹ সংস্কৃতে স্থিতি মতি শান্তি জ্ঞাতি পতি প্রভৃতি তি-প্রত্যয়ান্ত শব্দ যেমন আছে, বাঙ্গালাতেও ভাববাচ্যে ভর্‌তি বন্‌তি শুক্‌তি গন্‌তি কম্‌তি পড়্‌তি বাড়্‌তি, এবং কর্তৃবাচ্যে চল্‌তি (কারবার), উঠ্‌তি (বয়স), বাড়্‌তি (টাকা) ইত্যাদি আছে। বাঙ্গালায় তা প্রত্যয়ও হয়। যথা, ভাববাচ্যে, দেখ্‌তা, পড়্‌তা কর্‌তা (যেমন গুড় তৈলাদির ওজন সময়ে পাত্রের ওজন—কর্‌তা বাদ দিতে হয়, অনেকে কড়্‌তা বলে)। কর্তৃবাচ্যে, সবজান্তা, ফের্‌তা (নৌকা)। ফেরত ডাকে, ফের্‌তা ডাকে, ফির্‌তি নৌকায়—তিন প্রকার পদ চলিত আছে।

৶৹ আসামীতে কর্তা পুংলিঙ্গ হইলে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর ওঁতা হয়। যথা, যে করে সে করোঁতা; যে খায় সে খাওঁতা; যে দেয় সে দিওঁতা; যে শোয় সে শোঁতা, ইত্যাদি। ওঁতা প্রত্যয়ের মূল সং অৎ বহুবচনের অন্ত বোধ হয়। সং করন্ত—আং করোঁতা। এই দাদৃশ্যে অন্ত ধাতুতে ওঁতা আসিয়াছে। বাঙ্গালাতেও জানতা, ফেরতা, বহতা প্রভৃতি শব্দ এইরূপ।

৷৹ ওড়িয়াতে গণতি উঠতি চলতি, অর্থাৎ অতি প্রত্যয়। 'লোক গন্‌তি (কলিকাতার ভাষায়, গুন্‌তি) করা,'-'সেখানে অগন্‌তি-লোক' ইত্যাদির গন্‌তি অগন্‌তি বাস্তবিক গণিত অগণিত। তুং চলিত কথা—চল্‌তি কথা (নদীয়ায়)। গণা-গণ্‌তি লোক—গণা লোক এবং গণিত লোক, অর্থাৎ গণা-গণ্‌তি সহচর শব্দ। ইহা হইতেও বুঝিতেছি গণ্‌তি—সং গণিত। অতএব বাঙ্গালা শব্দের তি ও তা প্রত্যয় সং ইত, তি এবং অৎ হইতে আসিয়াছে। (অন্ত ঈয়া প্রত্যয় দেখ)।

৮৬। অন্ত।

৵৹ সংস্কৃতের চলৎ ফলৎ স্বপৎ প্রভৃতির অৎ প্রত্যয় স্থানে বাঙ্গালায় অন্ত প্রত্যয় হয়। অৎ প্রত্যয়ের বহুবচনের রূপ অন্ত। (মহৎ শব্দের বহুবচনে মহন্ত। এই মহন্ত শব্দ (মঠের মহন্ত) দেশ ভাষায় চলিত হইয়াছে। মহৎ ব্যক্তিকে বহুজ্ঞানে মান্য করা সঙ্গত। এইরূপ আসামী ও ওড়িয়ায় সন্ত শব্দ সং সৎ শব্দের বহুবচনের রূপ।)

৶৹ কর্তৃবাচ্যে বর্তমান কালে অন্ত হয়। যথা, ঘুমন্ত ছেলে, জীঅন্ত মাছ, চলন্ত বিষ্ণু, ফলন্ত গাছ, ফুটন্ত ফুল। কিন্তু যাবতীয় সামান্য ধাতুর উত্তর অন্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগ নাই। সাজন্ত করিয়া গহনা পরা—এখানে সাজন্ত যেন সং সজ্জিতবান্। এইরূপ মানন্ত শব্দেও সং তবৎ প্রত্যয়ের বিকারে অন্ত প্রত্যয় বোধ হয়। মানন্ত শব্দের বিকারে মানান বোধ হয়। বোধ হয় পূর্বকালে অন্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ অধিক ছিল। আসামী ও ওড়িয়াতে অন্ত-প্রত্যয় বহু প্রচলিত আছে।

৶০ খাইতে দক্ষ যে—সে খাঅন্ত, স্ত্রীলিঙ্গে খাঅন্তী। যে খাইতে পারে না—নি-খাঅন্ত, নি-খায়ন্তী। আসামীতে খাওঁতা, নিখাওঁতা, স্ত্রীলিঙ্গে খাঁতী, নি-খাঁতী (?)। বিদ্যাপতিতে 'বরিখন্তিয়া'—বরিষন্তিয়া—যে বর্ষণ করিতেছে। বর্ষন্তি ক্রিয়াপদের উত্তর ইয়া (৯২।৶০ দেখ)। এইরূপ কবিকঙ্কণে, 'কৃষাণ ধরয়ে যেন উজানিয়া মাছ'—যে মাছ উজাইয়া যায়। এ সকল স্থলে অন্ত ইয়া তদ্ধিত প্রত্যয়।

।০ বর্ত্তমান কাল বুঝাইতে অন্ত। ভূতকাল বুঝাইতে আ প্রত্যয়। যেমন, মরা গাছ, পরা কাপড়। কিংবা কোন কোন স্থলে ক্রিয়াপদের ইল বিভক্তি। যেমন, গেল বছর। কবিকঙ্কণে, 'মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি।'—পিছিলা (অবিকল বর্ত্তমান ওড়িয়া)। ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে ক্রিয়াপদের ইতেছে বিভক্তি। যেমন, আস্‌ছে (আসিতেছে) বছর। ওড়িয়ায় আসন্তা বছর, ফার্সী আএন্দা সন। গেল কাল—গত কল্য, আস্‌ছে কাল—আগামী কল্য। ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে ইব, ইবু (আদরে উ) বিভক্তিও হয়। যথা, হব,—হবু-শ্বশুর—যিনি পরে শ্বশুর হইবেন। ইহার সহিত ডুবু ডুবু—যাহা ডুবিবে—আনা যাইতে পারে (৮০)। এইরূপ, বর্ত্তমান কালে কাঁদি-কাঁদি মুখ—কাঁদ-কাঁদমুখ—যে মুখ প্রায় কাঁদিতেছে।

৮৭। ঈয়া, ঈয়ে।

/০ কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর ঈয়া, (রাঢ়ে) ঈয়ে হয়। যে করে—সে করীয়া, করীয়ে; যে করায়—সে করাঈয়া, করাঈয়ে; যে চলে—সে চলীয়া, চলীয়ে; যে চালায়—সে চালাঈয়া, চালীয়ে (তু° পাঠাইয়া—পাঠিয়ে)। এইরূপ, খাঈয়ে, বাজীয়ে, গাঈয়ে, নাচীয়ে, ধরীয়ে, বলীয়ে, ইত্যাদি।

৶০ এই ঈয়া প্রত্যয়ের মূল সংস্কৃতের তৃ হইতে তা মনে হয়। স° চলিতা জনয়িতা কারয়িতা, এবং কর্ত্তা বেত্তা বোদ্ধা গন্তা, ইত্যাদি। অর্থাৎ কতক ধাতুর উত্তর ই আগম হয়, কতক ধাতুর উত্তর হয় না। স° চলিতা—ত লোপে চলিয়া, স° কারয়িতা—করাইয়া। এই সাদৃশ্যে বাঙ্গালাতে সকল ধাতুর উত্তর একই ঈয়া প্রত্যয় হয়। উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে ইয়া স্থানে ঈয়া, ঈয়ে শুনিতে পাওয়া যায়। মরীয়া লোক—মরিয়া নহে। তৃ উচ্চারণে ত্রু হইয়া ত লোপে উ থাকে। এইরূপ, হিন্দীতে উ প্রত্যয় আসিয়াছে। যথা, হি° খিলাউ—বা° খাওয়াঈয়ে। এই উ সহিত ও° র খাউঅছি, যাউঅছি বা° খাইতেছে যাইতেছে, তুলনা করা যাইতে পারে। আসামীতে কর্ত্তৃবাচ্যে ওঁতা, ওয়া হয়। আ° করোঁতা=বা° করীয়া, আ° করাওঁতা করোয়া=বা° করাঈয়া। ইহার সহিত বা° অৎ, অত প্রত্যয় আনা যাইতে পারে। স° বহৎ হইতে বা° বহতা (জল)। অর্থাৎ বাঙ্গালা আসামীতে সংস্কৃতের প্রত্যয়-ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রাকৃত লোকের মুখে এই প্রকার হয়। গাঙ্গীয় বাজীয়া প্রভৃতি শব্দের ঈয়া দক্ষতা অর্থে তদ্ধিত ইয়া-প্রত্যয়ের তুল্য। ওড়িয়াতে করিঃ

খাইবা, চলিবা লোক বলিলে বা°-তে করীয়া, খাঈয়া, চলীয়া বুঝায়। অর্থাৎ বা° য়া স্থানে ও°-তে বা আছে। (সূ° ৮৩।৵০)

৮৮। অক, অকা, উক।

সংস্কৃতে কর্তৃবাচ্যে অক উক প্রত্যয়-যোগে পাঠক কারক শোষক ভাবুক কামুক প্রভৃতি শব্দ হইয়াছে। বাঙ্গালাতে অক উক প্রত্যয়ান্ত শব্দ অল্প আছে। যথা, ভাববাচ্যে, বলক, ধমক, দমক, টনক (?)। কর্তৃবাচ্যে, মিশক (কেহ কেহ মিশুক বলে), আটক (আঁট ধাতু)। অধিকরণ-বাচ্যে, বসাইবার আধার—হিন্দী বৈঠক (স° বাটিকা)। শব্দের শেষে অক উক দেখিলেই অক উক প্রত্যয় বলিতে পারা যায় না। স° মরক হইতে বা° মড়ক, স° মোটক বা° মোড়ক, স° চক্র হইতে বা° চড়ক। টনক শব্দ অক প্রত্যয়ান্ত কিনা সন্দেহ। কারণ টন ধাতু বাঙ্গালায় চলিত নাই। স° কৃত বা° করা শব্দের সংক্ষেপে এবং অর্থে কতকগুলি শব্দে অক প্রত্যয় আসিয়াছে। কটূকৃত—কড়্কা (ধাতু), স্তম্ভীকৃত—থম্কা (ধাতু), চলীকৃত—চল্কা (ধাতু), ইত্যাদি। শেষে আ আছে বলিয়া পূর্ব অকারান্ত ব্যঞ্জন হলন্ত উচ্চারিত হয় (১৯ সূঃ)।

৮৯। ই, ইয়া।

৴০ অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ই ইয়া প্রত্যয় হয়। এখন পদ্যে ই, গদ্যে ইয়া; স্মরি—স্মরিয়া, পশি—পশিয়া। প্রাচীন পদ্যেও ই পাই। বিদ্যাপতিতে ই, কদাচিৎ ইয়া। প্রাচীন আসামীতে ই, ইয়া পাই। যথা, 'হরির চরণ হৃদয়ে ধরিয়া কহয় মাধবদাসে।' বর্তমান আসামীতে প্রায়ই ই, ওড়িয়াতেও ই। প্রাচীন হিন্দীতে ই হইত। বর্তমান হিন্দীতে ই লুপ্ত হয়। বা° করিয়া আসা° ও° করি, হি° কর্। এই কর্ সহিত আবার কর্ জুটিয়া হি° কর্ কর্ বা কর্কে; বা° চলিয়া হি° চল্, চল্কে, চল্কর, কখন কখন চল্ কর্কর। গ্রাম্য ওড়িয়াতেও এইরূপ যাই-করি বা° যাইয়া, খাই-করি বা° খাইয়া। মরাঠীতে ঊন যোগে করূন বা° করিয়া। এই ঊন, স°প্রা° তূণ বা ঊন, স° ত্বা প্রত্যয়। প্রাকৃত ভাষা কখনও সর্বত্র এক হয় না। স° কৃত্বা=স°প্রা° কদুঅ, স° শ্রুত্বা=স°প্রা° শুণিঅ, স° উপবিশ্য=স°প্রা° উপবিসিঅ, স° প্রেক্ষ্য=স°প্রা° পেক্খিঅ। অর্থাৎ সংস্কৃতের ত্বা ও য় প্রত্যয় স্থানে ইঅ। কোন কোন ধাতুর উত্তর ত্বা প্রত্যয়ের সময় সংস্কৃতেও ই আসে। যথা, মিল্ ধাতু হইতে মিলিত্বা, স্ফুট্ ধাতু হইতে স্ফুটিত্বা। স°-প্রাকৃতের ইঅ প্রত্যয়ের অ লোপে কিংবা সংস্কৃতের য় স্থানে আসামী ওড়িয়া বাঙ্গালায় ই; ইঅ স্থানে ইআ করিয়া কিংবা সংস্কৃতের ইত্বা স্থানে বাঙ্গালায় ইআ। করিআ, এইরূপ বানান প্রাচীন বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। অতএব করিয়াছি =করি-আছি, কিংবা করিআ-আছি—স° কৃত্বা অস্মি।

৵০ দুই ক্রিয়ার কর্তা এক হইলে পূর্বকালিক ক্রিয়া-বোধক ধাতুর উত্তর ইয়া হয়। সে

আসিয়া কহিল—সে আসিল পরে কহিল। সে শুনিয়া হাসিল—শ্রবণান্তর হাসিল। কথা শুনিয়া করা হইল—এখানে শুনিয়া পদের কর্তা যে শুনিয়াছে, কিন্তু সে যে কে তাহা জানা নাই। জলে ভিজিয়া জ্বর হইয়াছে—কেহ-না-কেহ জলে ভিজিয়াছে নতুবা জ্বরের কথা উঠিত না। কিন্তু সে কে, প্রকাশ নাই। অতএব ভিজিয়া পদের কর্তা থাকিয়াও নাই। বস্তুতঃ এখানে ভিজিয়া পদ অর্থে ভেজা হেতু। এই কারণে বলিতে পারি, জলে ভেজায় বা ভেজাতে জ্বর।

৵০ গান শুনিয়া কাঁদিল—গান শোনার পর কিংবা গান শোনা হেতু। কি করিয়া যাইবে, নৌকা করিয়া, করিয়া—করণে। সে জাগিয়া ঘুমায়—তার ঘুম সজাগ নহে, সে জাগ্রত থাকে কিন্তু দেখায় যেন ঘুমাইতেছে। তুমি থাকিয়া কাজ করাইবে—তোমার বিদ্যমানতায়। তেমন করিয়া বল নাই—তেমন ভাবে। ভাল করিয়া বলিবে—ভালভাবে। সে রাগিয়া উঠিল, মরিয়া গেল—ক্রুদ্ধ, মরা বা মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সে বেড়াইয়া থাকে—ভ্রমণ অবস্থায়। এই সকল উদাহরণে বোঝা যাইতেছে, ইয়া-প্রত্যয়ের মূলভাব অনন্তর হইলেও অল্পে অল্পে সে ভাব করণ ও অধিকরণে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বকিয়া বকিয়া মাথা ধরিল—পুনঃপুনঃ বকাতে; করণ কিংবা অধিকরণ। হাসিয়া হাসিয়া দম আটকাইল—হাসিয়া করণ। হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল—হাসিয়া অধিকরণ। 'কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া'—বিনিয়া অধিকরণ। অতএব যখন ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদ দ্বিরুক্ত হয়, তখন তদ্দ্বারা করণ কিংবা অধিকরণ দুইই বুঝায়। কারক-প্রকরণে দেখা যাইবে বহুস্থলে করণ ও অধিকরণ কারক মিশিয়া যায়। ইয়া প্রত্যয় সং অৎ প্রত্যয় তুল্য হইয়া পড়িতেছে। (ঈয়া দেখ)

।০ অতএব ইয়া প্রত্যয় দ্বারা অনন্তর, করণ কিংবা অধিকরণ বুঝায়। ইয়া প্রত্যয় পরে বিভক্তি লাগে না। এই হেতু ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদ অব্যয় বলা চলে। এই অব্যয়দ্বারা কর্তা বিশেষিত হয়। বাঙ্গালা-ব্যাকরণকার ইয়া-কে ক্রিয়ার বিভক্তি মনে করিয়া ইয়া-যুক্ত পদকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া থাকেন। কিন্তু ক্রিয়ার বিভক্তি দ্বারা ক্রিয়ার বচন পুরুষ কাল বুঝায়। ইয়া দ্বারা সে সব কিছুই বুঝায় না। ইয়া দ্বারা পরবর্তী ক্রিয়ার পূর্বকাল বুঝায় বটে, কিন্তু সকল স্থলে সে অর্থ স্পষ্ট থাকে না। যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ পূর্ণ করে, তাহার নাম সমাপিকা; এবং যে ক্রিয়া করে না তাহার নাম অসমাপিকা। কিন্তু যখন ক্রিয়াতেই সন্দেহ, তখন অসমাপিকা ভাগ-কল্পনা নিরর্থক। কাটিয়া ফেল, হইয়া উঠিল ইত্যাদি স্থলে ফেল, উঠিল সহযোগী-ক্রিয়া বলা গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দেখা গেল, ফেল উঠিল বাস্তবিক সমাপিকা ক্রিয়া এবং ইহাদের পূর্ববর্তী ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষণ-বাচক অব্যয়। বলা বাহুল্য, কৃদন্ত শব্দের কর্ম থাকিতে পারে।

।৵০ পুঁথিতী বাঙ্গালায় করতঃ পাওয়া যায়। গমন করতঃ দেখিলেন—গমন করিয়া। বাং কর ক্রিয়ার উত্তর হেতু অর্থে সং তস্ প্রত্যয়। * সুতরাং এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এইরূপ হওতঃ শব্দও পাওয়া যায়। ইয়া প্রত্যয় যোগে যে হেতু বুঝাইতে পারে, তাহা এই করতঃ

* কিংবা করণবৎ—সং বত্তৃৎ। কিন্তু অর্থান্তর হয়, বিশেষ প্রয়োগেরও কারণ থাকে না।

হওতঃ শব্দ হইতে বোঝা যাইতেছে। করণতঃ হওনতঃ কিংবা করিতঃ হইতঃ, বোধ হয়, শুদ্ধ হইত। বাঙ্গালাতে ক্রিয়াপদে কারকের বিভক্তি লাগে না, এমন নহে।

৯০। ইতে।

৴০ নিমিত্তাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ইতে প্রত্যয় হয়। গাইতে আসিয়াছে—গান নিমিত্ত। গাইতে বাজনা চাই—গান নিমিত্ত। গাইতে হাসি আসে—গানে হাসির উৎপত্তি। গাইতে মন নাই—গানের প্রতি। গাইতেছে—গাইতে আছে—গান-ব্যাপারে নিযুক্ত আছে। গাইতে লাগিল—গান-ব্যাপারে লগ্ন হইল। তোমাকে গাইতে শুনিয়াছি—তোমার গাওনা। তোমাকে গাইতে হইবে—আমি চাই তোমার গানকর্ম। আমাকে গাইতে নাই—আমার গানকর্ম নিষিদ্ধ। গাইতে জানেন, পারেন—গানকর্ম। গাইতে গাইতে গায়ন—পুনঃ পুনঃ গানকর্ম দ্বারা। গাইতে গাইতে গলা শুখাইল—পুনঃ পুনঃ গান-হেতু। গাইতে গাইতে বাজাও—গান-কর্ম-সময়ে। তুমি গাইতে বুঝিলাম তোমার শিক্ষা হইয়াছে—তোমার গান-কর্ম হইতে।

অতএব ইতে প্রত্যয়ান্ত শব্দ দ্বারা কারকের অর্থ প্রকাশিত হয়। নিমিত্ত অর্থ বলিলে ইতে প্রত্যয়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। বিভক্তি ও শব্দ যোগে কারক যাহা পারে, ইতে-যুক্ত ধাতু তাহা পারে।

৵০ সং তুম্ প্রত্যয়ও এইরূপ। হঠাৎ মনে হয়, সং তুম্ হইতে বাং ইতে আসিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ভাষার অনুরূপ প্রত্যয়, এবং পুরাতন এবং বর্তমান বাঙ্গালার কারকের তে বিভক্তি স্মরণ করিলে সং তুম্ পরিত্যাগ করিতে হয়। বাঙ্গালা করিতে, মৈথিলী করিবাক্, ওড়িয়া করিবাকু, হিন্দী করনে বা করনেকো, মরাঠী করণ্যাস। মরাঠী করণ্যাস—করণে (বাং করা) শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে কারকের স বিভক্তি। হিন্দী করনেকো—করনা (বাং করা) শব্দের উত্তর কারকের কো বিভক্তি। ওড়িয়া করিবাকু—করিবা (বাং করিবা, করা) শব্দের উত্তর কারকের কু বিভক্তি। মৈথিলী করিবাক্ এইরূপ ক বিভক্তি। প্রাচীন আসামীতেও এইরূপ, 'এহি বুলি বৈদ্যবর উঠিবাক চাই' (চায়)। শূন্যপুরাণে, 'জাই জুই তুলেন্ত পুজিবাক নিরঞ্জন'—নিরঞ্জন (ঠাকুর) পূজিতে জাই জুই তোলেন—পূজিবা শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে ক বিভক্তি। কারকের কে বিভক্তি স্থানে রে হইতে পারে (যেমন, আমারে আমাকে, কারক দেখ)। শূন্যপুরাণে, 'জনমিআ বাসুকী পুন খাইবারে ধাএ'—খাইবা-কে ধায়—খাইতে। মেঘনাদবধে, 'পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি ইচ্ছা তব'; 'হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে'। অতএব করিতে—কর ধাতু ভাববাচ্যে ই করি; করি শব্দে নিমিত্তার্থে কারকের তে বিভক্তি। কিংবা করি বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে কারকের তে বিভক্তি। হয়ত সং তুম্ এবং অৎ প্রত্যয়ও বাঙ্গালাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে ই.ত প্রত্যয়ের সহিত মিলিয়াছে। কারকের তে বিভক্তি দ্বারা কর্তা, করণ, অপাদান, সম্প্রদান, অধিকরণ কারক বুঝাইয়া থাকে। ইতে প্রত্যয় দ্বারাও সেই সব কারকার্থ প্রকাশিত হয়।

৶৹ কর্ ধাতুর উত্তর আ (ভাববাচ্যে)—করা, ইবা (ভাববাচ্যে)—করিবা, অন (ভাববাচ্যে)—করণ। করা হেতু—করা-তে, করা শব্দে হেত্বর্থে কারকের তে বিভক্তি। তে অধিকরণ ও করণ কারকও বুঝায়। কাজ করাতে (বিষয়ে) বাহাদুরি আছে; কাজ করাতে (দ্বারা), কাজ করায় জ্ঞান হয়। কারকের তে বিভক্তি স্থানে য় বিভক্তিও হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার করিবাতে, এবং পণ্ডিতী বাঙ্গালায় করণতে পদ হইত।

।৹ করাতে, হওয়াতে প্রভৃতি আতে-প্রত্যয়ান্ত পদ অধিক কালের পুরানা বোধ হয় না। বিদ্যাপতি, 'মৃদু বীজইতে ঘুমলু হাম'—মৃদু ব্যজন করিতে বা করাতে আমি ঘুমলু; 'বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস'—নিরীক্ষণ করিতে বা করাতে। তিনি আসিতে এবং তুমি বলিতে বুঝিলাম—তাঁহার আসা এবং তোমার বলা হেতু। এইরূপ প্রয়োগ রাঢ়ে আছে, নদীয়াতেও আছে। কিন্তু অল্পে অল্পে উঠিয়া গিয়া আসাতে বলাতে কিংবা আসায় বলায় পদ প্রচলিত হইতেছে। অর্থাৎ করণ ও সম্প্রদান কারক বুঝাইতে আতে আয়, অধিকরণ বুঝাইতে ইতে হইতেছে। গান গাইতে গাইতে চল, কাজ করিতে করিতে উঠিও না—গান ও কর্ম কালে। যাইতে বিলম্ব আছে—গমনরূপ কর্মে। শূন্য পুরাণে, 'চন্দন ঘুরিতে জেবা করেন্তি সম্বর ধ্বনি'—চন্দন ঘর্ষণ কালে যাহারা শঙ্খ ধ্বনি করে। তুমি থাকিতে কাজটা হইল না! —(প্রায়ই) তোমার বর্তমানতায়। আমা হইতে তুমি বড়—হওয়া=উৎপাদন কিংবা আদি বিবেচ্য হইলে তুমি বড় (১৪৭।৶৹ দেখ)।

।/৹ কর ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ই মনে করা ঠিক নহে। করি ক্রিয়াপদে তে মনে করা ভাল। বিদ্যাপতি, 'কি কহব রে সখি কহইতে হাস'—কহই ক্রিয়াপদে তে। এইরূপ, হেরইতে চলইতে গণইতে, ইত্যাদি। বিদ্যাপতি, 'আছইতে আছল কাঞ্চন পুতুলা'—কাঞ্চন পুত্তলী (-প্রায়) থাকিতে-ছিল—অর্থাৎ ছিল। চণ্ডীদাসে 'খাইতে খেয়েছি শুইতে শুয়েছি, আছিতে আছিয়ে ঘরে'—আছিতে পদ দ্রষ্টব্য—খাইতে হয় বলিয়া খেয়েছি নতুবা খাইতাম না ইত্যাদি (বিরহে রাধিকার উক্তি)।

।৶৹ হইতে করিতে—বর্তমান কাল বুঝায়। হইয়া করিয়া—ভূতকাল। করিতে-আছি বা করিতেছি—ক্রিয়া শেষ হয় নাই; করিয়া-আছি বা করিয়াছি—ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। করিতেছিলাম—ছিলাম ভূতকাল বলিয়া ভূতকালে ক্রিয়া শেষ হয় নাই; করিয়াছিলাম—ভূতকালের পূর্বে ক্রিয়া শেষ হইয়াছিল। (লকারার্থ দেখ)।

৯১। ইলে।

/৹ 'ক্রিয়াদ্বয়ের কার্য্যকারণ ভাব বোধ হইলে' পূর্ববর্তী কারণ-বোধক ক্রিয়াতে ইলে প্রত্যয় হয়। সে করিলে তুমি করিবে—তোমার করার পূর্বে তাহার করা চাই। ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি বুঝাইলেও পূর্ববর্তী ক্রিয়াতে ইলে হয়। সে আসিলে আমি যাইতাম, অর্থাৎ সে আইসে নাই এজন্য আমি যাই নাই। অতএব 'যদি' 'যদ্যপি' শব্দের পরে বর্তমান ভবিষ্যৎ ভূত ক্রিয়াপদ

থাকিলে বাক্যের যে অর্থ হয়, ইলে প্রত্যয় দ্বারাও সে অর্থ হয়। যদি তুমি কর, তবে আমি করি—তুমি করিলে আমি করি। সংস্কৃতের 'ভাবে সপ্তমী' যেমন, বাঙ্গালার ইলে প্রত্যয় যোগে তেমন অর্থ হয়। যথা, চন্দ্র উদয় হইলে অন্ধকার দূর হইল—অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার দূর হইল। (সং চন্দ্রে উদিতে—উদিলে ; ত স্থানে ল।)

৵০ তোমাকে বুঝাইতে হইলে, আমাকে করিতে হইলে, প্রভৃতি উদাহরণে 'হইলে' দ্বারা 'যদি হয়' 'যদি হইত' অর্থ প্রকাশিত হয়। তোমাকে বুঝাইতে বলিব, তোমাকে বুঝাইতে হইলে বলিব—অর্থে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

৶০ এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে ভূতকালের ইল-বিভক্তির উত্তর কারকের এ-বিভক্তি যোগে ইলে প্রত্যয়। সংস্কৃতে গতে প্রাপ্তে উদিতে প্রভৃতি পদও এই প্রকার। সে করিলে আমি করিব—আমার কর্মের পূর্বে তাহার কর্ম আবশ্যক। রাম মারিলেও মৃত্যু, রাবণ মারিলেও মৃত্যু—মৃত্যুর পূর্বে মারা, তা রাম মারুন কি রাবণ মারুন। ওড়িয়াতেও এইরূপ ইলে প্রত্যয় আছে।

৷০ এখানে ইয়া, ইতে, ইলে প্রত্যয় বলা গেল। অসমাপিকা ক্রিয়া বলিলে বিশেষ কিছু সুবিধা দেখা যায় না। মূল যাহা হউক, ইয়া ইতে ইলে এই তিনকে প্রত্যয়ের মধ্যে ধরিলে ব্যাকরণে দোষ স্পর্শে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তদ্ধিত-প্রত্যয়।

যাবতীয় প্রত্যয় প্রথমে অর্থযুক্ত শব্দ থাকে। শব্দে যুক্ত হইতে হইতে লোকমুখে তাহা সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত হইয়া প্রত্যয়ের আকার ধরে। কিন্তু যে শব্দের অর্থ স্পষ্ট আছে এবং পৃথক প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাকে প্রত্যয় বলা চলে না। সে শব্দের স্থান ব্যাকরণ নহে, কোষ। কেহ কেহ ব্যাকরণকে ভাষার কোষের সূচি মনে করেন। ব্যাকরণের এমন অর্থ ধরিলে কোষের অনেক শব্দ ব্যাকরণে প্রবেশ করাইতে পারা যায়। যাহা হউক, এখানে ব্যাকরণের সীমার বিচার না করিয়া কয়েকটা প্রধান বিষয় লেখা যাইতেছে।

তদ্ধিত-প্রত্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করাও সহজ নহে। অকারাদি বর্ণানুক্রমে কোষের শব্দ বিভক্ত হয়। নতুবা আবশ্যক শব্দ খুঁজিতে গোল হয়। ব্যাকরণে সেই কৃত্রিম বিভাগ আনিলে ব্যাকরণের একটা উদ্দেশ্য বৃথা হয়। অথচ একই প্রত্যয়ের নানা অর্থ থাকাতে সকল স্থলে স্বাভাবিক বিভাগও সহজ হয় না। এখানে মিশ্রিত বিভাগ অবলম্বন করা গেল।

বলা আবশ্যক, শব্দের শেষবর্ণ চ ড র ইত্যাদি হইলেই যে তাহা প্রত্যয় হইবে, এমন কথা নাই। মূল শব্দ না পাইলে তাহার চ ড র ইত্যাদি প্রত্যয় কি না তাহা বলিতে

পারা যায় না। গ্রাম্য উচ্চারণ বিকারে একই প্রত্যয়ের রূপান্তর হইতে পারে। একথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।

৯২। আ।

/০ বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা রূপান্তরে শেষে আ পাইয়াছে। কোথাও সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপে, কোথাও শেষের ক য় স্থানে, কোথাও বাঙ্গালায় আ করিবার টানে, পাইয়াছে। কোন্ শব্দ কি কারণে পাইয়াছে, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ সহজ নহে। সং-প্রাকৃত ভাষায় যে-সে শব্দের পরে স্বার্থে ক বসিতে পারিত। হয়ত সেই ক লুপ্ত হইয়া বাঙ্গালায় আ আসিয়াছে। সাবধান না হইলে, এই আ প্রত্যয় মনে হইতে পারে। নিম্নলিখিত উদাহরণে বাঙ্গালা শব্দের আকারের কারণ পাওয়া যাইবে।

সং খুল্ল—খুড়া; সং খণ্ড—খানা (বা খান); সং অগচ্ছ (গাছ)—আগাছা; সং কুক্কুট—কুকুড়া; সং কোট্ট—কোটা; সং শুষ্ক—শুখা (য স্থানে খ); সং নেত্রিক—(কাজল-) নেতা; সং মট্টক—মটকা; সং মামক—মামা; সং মল্ল—মালা (যেমন নারিকেল-মালা); সং ভেলক—ভেলা; সং পল্লব—পালা; সং স্ফোটক—ফোড়া (বা ফোঁড়া); সং রূপক, রূপ্য—রূপা; সং পাদক—পায়া; সং কুল্য—কুলা; সং কাংস্য—কাঁসা; সং লৌহক, লোহ—লোহা; সং মেণ্ড, মেণ্ডক—মেঁঢ়া (বা মেড়া বা ভেঁড়া); সং কটোর—কটোরা; সং মোচক—মোচা; সং হুড়ুক—হুড়ুকা (বা হুড়্কা); সং বরণ্ড—বারাণ্ডা (বারান্দা বাঙ্গালা নহে); সং সীমন্—সীমানা; সং কুপ—কুপা (বা কুঁপা), কুআ; সং একল—একলা; সং কাতল—কাতলা (-মাছ); সং একতল—একতলা; সং মল—মলা; সং ক্ষেপ—খেআ; সং বায়ন, বায়নক—বায়না; সং বর্কর—বকরা (ছাগ); সং স্থাল—থালা; সং কাণ—কাণা; সং ধূম—ধুআঁ; সং অচ্ছ—আচ্ছা; সং চঙ্গ—চাঙ্গা; সং ভ্রমর—ভমরা (বা ভোমরা); সং ফণ—ফণা; সং উচ্চ—উঁচা (বা উচা); সং গৌর—গোরা; সং আম—আমা (-ইঁট); সং কাল—কালা; ইত্যাদি।

এখন বাঙ্গালা আ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

/০ স্বার্থে এবং প্রায়ই অবজ্ঞায়। যথা, চোর—চোরা (চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী)। পাগল—পাগ্‌লা; মাতাল—মাত্‌লা; ছাগল—ছাগ্‌লা (এখন প্রায় অপ্রচলিত); বামুন—বাম্‌না; বাঘ—বাঘা। (তিন অক্ষরের আকারান্ত শব্দের উপান্ত্য অ ই উ লুপ্ত হয় (১৯, ৬১ সূঃ)। এই নিয়মে বামুন—বাম্‌না, ইত্যাদি। মানুষের ডাক-নামের শেষে আ বসিয়া অনাদর প্রকাশ করে (৬১ সূঃ)। যথা, রামা শ্যামা। হরি—হরিআ; ইআ রাঢ়ের উচ্চারণে ে ্য হয়। সেই সূত্রানুসারে হরিআ—হর্যে বা হ'রে (হরে কদাপি নহে)। এইরূপ, মধু—মধুআ—ম'ধো। অবজ্ঞার্থে ক আসিয়া প্রথমে রামক শ্যামক, পরে রামা শ্যামা হইয়া থাকিবে। ওড়িয়াতেও এইরূপ আ হয় এবং বানানে আ লেখা হয়।

৶০ স্বার্থে ও বৃহৎ অর্থে। যথা, থাল—থালা ; হাতী—হাতা ; চরকী—চরকা (হ্রস্বার্থে ঈ দেখ) ; পাত—পাতা ; পাট—পাটা ; চোঙ্গ—চোঙ্গা।

।০ সদৃশ বস্তু অর্থে (৶০ দেখ)। যথা, হাতের সদৃশ—হাতা ; ঠেঙ্গ—ঠেঙ্গা। বাঘের সদৃশ বলবান বা হিংস্র—বাঘা (কুকুর, তেঁতুল)।

।/০ জাত, সম্বন্ধীয়, বিশিষ্ট অর্থে। যথা, মহিষ হইতে প্রাপ্ত—মহিষা—মইষা (-দুধ) ; কাংস্তে নির্মিত—কাঁসা (কাঁসার থালী বাটী) ; বাসের যোগ্য—বাসা ; তাপের যোগ্য—তাপআ-তাঅআ (তাওয়া) ; লবণ সম্বন্ধী বা লবণ জলে জাত—লোণা ; তিনকাঠে নির্মিত—তেকাটা ; তিন পাদ বিশিষ্ট—তেপাআ (তেপায়া) ; পাকবিশিষ্ট—পাকা ; খদির বর্ণবিশিষ্ট—খদিরা-খইরা-খয়রা ; রঙ্গ (লাল রঙ্গ প্রধান)—রঙ্গা—রাঁগা (রাঙ্গা)। এইরূপ, রোগা, জলা, তেলা, হলুদা, বেগুনা, হাঁসা, সফেদা (সফেদ বলিয়া), ইত্যাদি। ঘর সম্বন্ধী—ঘরআ (-কথা)। এই শব্দটি ঘরুআ হইতে আসিয়া থাকিবে। হিন্দীতেও ঘরউ ঘরুআ—ঘর-সম্বন্ধী। হিং ঘরানা মং ঘরাণা (পরিবার ; সং গৃহিনী হইতে) শব্দও বাঙ্গালাতে ঘরআ অর্থে শোনা যায়।

৯৩। ই।

/০ কোন কোন সংস্কৃত শব্দের ক কি য় স্থানে বাঙ্গালায় ই আসিয়াছে। য় স্থানে ই সহজে হয়। যথা, সং সাক্ষ্য—সাক্ষি ; সং হাস্য—হাসি ; সং বাবয়—বাবই (তুলসী) ; সং বিদায়—বিদাই (গ্রাম্য)। কি কী প্রত্যয়ের ক লুপ্ত হইলে ই থাকে। যথা, সং নর্তকী—নাটাই, সং চটকী, চটকা—চড়ই (-পাখী)। ক লোপে অ এবং অ উচ্চারণে য়, এবং য় ক্রমে ই-তে দাঁড়াইয়াছে। যথা, সং বাপক—বাবই (-পাখী) ; সং ক্ষারক—খালই (মাছ-রাখা) ; সং জালক—জালি (যেমন পটোলের)। সং কটাহ—কড়াই। য় যেমন আগম হয়, তেমন লোপও হয়। লোপে, সং মরার—মরায়—মরাই (ধান-রাখা)। অন্য শব্দে, সং বালিকা (বা বালুকা)—বালি (বা বালু) ; সং লিক্ষা—লিকী (বা নিকী)। সং কেদার—কেআরি (যেমন ফুল গাছের) ; সং বুস—ভুসি ; সং ফাল—ফালি ; সং তাল—তালি (হাততালি) ; সং পাশ—ফাঁশি।

৶০ স্বার্থে ই প্রত্যয়ের উদাহরণ দুই একটা পাওয়া যায়। যথা, সং কাণ্ড হইতে কাঁড়ি বা কাঁড়ী (তাল গাছের)। ফাঁশ—ফাঁশী, লাথ—লাথী, হ্রস্বার্থে ঈ হইতে পারে।

৵০ ভাব ও কর্ম বুঝাইতে ই প্রত্যয় বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত। যথা, পণ্ডিতি, ডাক্তারি, মাষ্টারি, হাকিমি, চাকরি, সাহেবি, নবাবি, চালাকি, ইত্যাদি। যে শব্দের অন্ত্য অ প্রত, তাহাতে ই যুক্ত হয়। শব্দ আকারান্ত হইলে ই পরে বসে। যথা, চিকনা—চিকনাই, বামনা—বামনাই, ভাল—ভালা—ভালাই—বালাই, বড়—বড়া—বড়াই। এইরূপ, সং পুষ্ট হইতে পুষ্টাই, গ্রাং পোটাই। আকারান্ত চালা মাড়া ঝাড়া ধোদা বাঁধা প্রভৃতি শব্দের উত্তর ই হয়। এই ই প্রত্যয় দ্বারা হিন্দী ও মরাঠীতে বেতনও বুঝায়। চালাই—চালাইবার বেতন।

বাঙ্গালাতেও চালাই (খরচ) বলা যায়। শহরে হিন্দীভাষীর নিকট হইতে খাড়াই, লম্বাই, ধোলাই, চোলাই ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতেছে। ধোআ—ধোয়া—ধোলা; ধোলা+ই—ধোলাই; তেমনই চোআ—চোলা হইতে চোলাই। বাঙ্গালাতে ধোআন্, চোআন্। যাচা হইতে যাচাই এবং লড়া হইতে লড়াই এখন পুরা বাঙ্গালা হইয়াছে।

।৹ সংস্কৃত য়-প্রত্যয় বাঙ্গালায় ই হইয়াছে। বাঙ্গালায় তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে স্বরের গুণবৃদ্ধি হয় না। এইহেতু সং পণ্ডিত হইতে পণ্ডিতি হইয়াছে, পাণ্ডিত্য হইতে পাণ্ডিতি হয় নাই। চালাকের ভাব, সংস্কৃত হইলে চালাক্য হইত, বাঙ্গালায় চালাকি। য় বর্ণের ই টুকু রহিয়াছে। য় স্থানে ই হইবার বহু দৃষ্টান্ত সংস্কৃতেও আছে। যজ্ ধাতু হইতে ইষ্ট, ব্যাধ্ ধাতু হইতে বিদ্ধ হইয়াছে। সত্য বাঙ্গালায় সত্তি, দিব্য—দিব্বি, বাচ্য—বাচ্চি ইত্যাদি। যজ্ঞ শব্দ উচ্চারণে যগ্‌গ্যাঁ; এইহেতু গ্রাম্যশব্দ যগ্‌গি হইয়াছে। (শেষে সংযুক্ত য় থাকিলে গ্রাম্য উচ্চারণে ই আসে, কিন্তু সকল স্থলে আসে না; ৪৬ সূঃ)। য় স্থানে ই, ব স্থানে উ, ঋ স্থানে অর্ ইত্যাদি হওয়ার কারণ শিক্ষাধ্যায়ে দেখা গিয়াছে। সং ব্রাহ্মণ্য—বামনাই, সং চৌর্য—চোরি—চুরি, সং মানুষ্য—মানুষি (যেমন ছেলে-মানুষি)। ওড়িয়া হিন্দী মরাঠীতেও ই প্রত্যয় আছে। ফার্সীতেও 'ইয়া' দিয়া বদমাশী আমীরী ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে।

।/৹ অন্যোন্যতা প্রকাশ করিতে শব্দ দ্বিরুক্ত এবং প্রথম শব্দে আ এবং দ্বিতীয় শব্দে ই হয়। যথা, আড়া-আড়ি, আধা-আধি, আপনা-আপনি, কোলা-কোলি (বা কুলি), কানা-কানি, কোনা-কোনি (বা কুনি), ঘরা-ঘরি, গোড়া-গোড়ি (বা গুড়ি), ইত্যাদি। ঠেলা, মারা, কাটা, ধরা, লড়া, হাঁকা প্রভৃতি কৃৎ আ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তরও ই প্রত্যয় হয়। যথা, ঠেলা-ঠেলি, মারা-মারি, কাটা-কাটি ইত্যাদি। কৃৎ আ-প্রত্যয় হইলে ধাতুর ই স্থানে এ, উ স্থানে ও হয় (৮০৵৹ সূঃ)। প্রথম শব্দে এই নিয়ম; দ্বিতীয় শব্দের শেষে ই থাকাতে ধাতুর ই উকারের গুণ আবশ্যক হয় না। যথা, ছেঁড়া-ছিঁড়ি, টেপা-টিপি, ওঠা-উঠি ছোঁআ-ছুঁই।

।৵৹ পরস্পর কর্ম, স্থানান্তর প্রাপণ, বিরোধ প্রভৃতি দুইএর ক্রিয়া থাকিলেই ই প্রত্যয় হয়। যথা, কবিকঙ্কণে, 'দুই দলে ঠেলা-ঠেলি চুলা-চুলি গলা-গালি, বরাতি দেউটি নাহি ছাড়ে।' মেঘনাদবধে, 'ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে অবরোধে।' কোণা-কোণি—এ-কোণ হইতে ও-কোণ; গোড়া-গোড়ি—গোড়ায় (আরম্ভে) এবং এখন; মোটা-মোটি—ছোট বড় মোট একত্র বিচার করিলে; দৌড়া-দৌড়ি—একের পশ্চাতে অন্যের দৌড়ন; নাড়া-নাড়ি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন। বিছানায় গড়া-গড়ি দিবার সময় শরীর যেমন গড়ায়, বিছানাও তেমন গড়ায়। মাটিতে গড়াগড়ি দিলে শরীরে মাটিও জড়াইয়া যায়। কেহ অপর জনকে পীড়ন করিতে, গালি দিতে, সাধ্যসাধনা করিতে পারে; কিন্তু, পীড়াপীড়ি, গালাগালি, সাধাসাধি করিতে পারে না।

৸/০ এরূপ অর্থে ও বিশেষণ শব্দ দ্বিরুক্ত হইলে প্রথম শব্দে আ, দ্বিতীয় শব্দে ই হয়। যথা, মিথ্যা-মিথ্যি, মিছা-মিছি, জড়া-জড়ি, ভাঙ্গা-ভাঙ্গি, ঝাড়া-ঝাড়ি, পাঁচা-পাঁচি। নড়ানড়ি ও হইয়া নড়িয়-নড়িয়া হয়।

চুলাচুলি, মুখামুখি, দুধা-দুধি প্রভৃতি শব্দের চুল, মুখ, দুধ শব্দের উচ্চারণে ওকারান্ত হয়। কিন্তু ও-কার দিয়া বানান করিবার সময় আসে নাই। মুকো, মুকো, মুকো ইত্যাদি বানান দিয়া উচ্চারণ এখনও প্রায় বলিতে হইবে।

৯৪। ইয়া।

১/০ বাঙ্গালা অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ আ ইয়া উয়া যোগে নিষ্পন্ন। ইয়া পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক উচ্চারণে এ, এবং উয়া পরিবর্তিত হইয়া ও হইয়া থাকে। সংক্ষিপ্ত কথিত ভাষার রূপ যাহাই হউক, প্রকৃত প্রত্যয় নিরূপণে বিঘ্ন নাই। কারণ এ ও থাকিলেও ইয়া উয়া একেবারে লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন পুস্তকে ইয়া উয়া প্রত্যয়ের ভূরি প্রয়োগ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসে, 'অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে না পূরয়ে সব সাধ।' কবিকঙ্কণে, 'গ্রাসগুলা তোলে যেন তে-আঁটিয়া তাল।' এইরূপ, কৃত্তিবাসে, 'দুহাতিয়া বাড়ি,' 'হাঁড়িয়া মেঘ,' ইত্যাদি ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদ আছে। ওড়িয়া ভাষাতেও ইআ উআ প্রচুর আছে, এখনও সংক্ষিপ্ত রূপ পায় নাই। যে ধানের ঘর রাখে সে ওড়িয়াতে ধান-ঘরিআ, যে রাঁধে সে রাঁধনিআ। আসামীতে, বড় যে সে বড়ুয়া—বরুয়া, মাটির সদৃশ—মাটিয়া। হিন্দীতে জটিয়া (জটিল), কালিয়া, ইত্যাদি আছে। মরাঠীতে য়া প্রত্যয় আছে। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে শব্দ-বিশেষে ইয়া স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। আসামীতেও এইরূপ।

২/০ এই ইয়া প্রত্যয় যে সংস্কৃত য় ইয় ঈয় এয় ইক প্রত্যয়ের স্থানীয়, তাহা বানানে উচ্চারণে এবং অর্থে প্রকাশ পাইতেছে।* বেদে নাকি অনেক শব্দ আছে, যেখানে য় বর্ণ ইঅ পড়িতে হয়। অর্থাৎ বেদের পরবর্তী সংস্কৃতে যেখানে য় একটি অক্ষর, বৈদিক কোন কোন শব্দে সেখানে ইঅ—দুইটি অক্ষর ছিল।

৩/০ সংস্কৃত য় প্রত্যয় করিতে গেলে অনেক শব্দের স্বরের গুণবৃদ্ধি হয়, কোন কোন শব্দের হয় না। বাঙ্গালায় কোন শব্দেরই হয় না। সংস্কৃতে বৈদ্য আদিত্য যেমন আছে, অজ্ঞ্য কণ্ঠ্য তেমন আছে। সংস্কৃত দেশীয় রাঢীয় ক্ষত্রিয় শব্দ বাঙ্গালায় দেশী রাঢ়ী ক্ষত্রী (বা ছত্রী বা খেত্রী) হইয়া একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

৪/০ সম্বন্ধীয় জাত বিশিষ্ট শীল দক্ষ প্রভৃতি অর্থে ইয়া প্রত্যয় হয়। ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ; কিন্তু কোন কোন শব্দ বিশেষ্য-রূপেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি শব্দ

* সংস্কৃত য় প্রত্যয়—যেমন কার্য দূষ্য পাত্য; ইয়—যেমন, ক্ষত্রিয় ইন্দ্রিয় অর্চিয়; ঈয়—যেমন, পার্বতীয় পার্থিবীয় পার্থিবদেশীয়; এয়—যেমন, পৌরুষেয় পাথেয় বাহ্নেয়; ইক—যেমন, মানিক মার্তিক দৈনিক উষানীক। ইহার অনেক স্থলে ইক স্থানে বা-ও ইয়া অনায়াসে হইতে পারে।

অর্থেও হয়। যথা, বারমাস-সম্বন্ধী—বার-মাসিয়া—বার-মাস্যা—বার-মেস্তে ; পণ বা পণক সম্বন্ধী—পণকিয়া ; পূর্ব-(দিক) সম্বন্ধী—পূর্বিয়া—পুব্যে (বাতাস) ; পাহাড়ে জাত—পাহাড়িয়া—পাহাড্যা—পাহাড্যে ; ওড্রদেশে জাত—ওড়িয়া—ওড্যা—উড্যে ; পাড়াগাঁয়ে জাত—পাড়াগাঁইয়া—পাড়াগেঁয়ে ; নাগপুরে জাত—নাগপুরিয়া—নাগপুর্যে ; বালি-বিশিষ্ট—বালিয়া—বাল্যা—বেল্যে ; অহঙ্কার-বিশিষ্ট—অহঙ্কারিয়া—অহঙ্কের্যে ; চক্‌চক করে যাহা—চক্‌চকিয়া—চক্‌চক্যে ; কট্‌মট করে যাহা—কট্‌মটিয়া—কট্‌মট্যে ; রোগার ভাব—রোগাটা, রোগাটা-বিশিষ্ট—রোগাটিয়া—রোগাট্যে ; জাঙ্গ পর্য্যন্ত আবরণ করে যে বস্ত্র—জাঙ্গিয়া ; উলুর বেড়া বিশিষ্ট গ্রাম—উলুবেড়িয়া ; উজানে চলে যাহা—উজানিয়া (যথা, কবিকঙ্কণে, 'ক্রুবাণ ধরয়ে যেন উজানিয়া মাছ') ; কামান পাতিতে দক্ষ যে—কামানিয়া (যথা, কবি-কঙ্কণে, 'কামানিয়া কামান পাতিল থরে থর') ; মোট-বহনে দক্ষ—মোটিয়া—মুটিয়া—মুট্যে ; বাজাইতে বা বাজনাতে দক্ষ যে—বাজাইয়া—বাজীয়ে (কৃৎ ঈয়া দেখ) ; খাআতে দক্ষ যে—খাআইয়া—খাঈয়ে ; করাতে দক্ষ যে—করাইয়া—করীয়ে ; মানের যোগ্য—মানিয়া—মান্যা—মেন্তে (যথা, ভারতচন্দ্রে, 'হোক মেনে জানা গেল বিবেচনা শূন্ত') ; খাজনে দক্ষ—খাজনিয়া—খাজন্তে ; কাঁদনে দক্ষ—কাঁদনিয়া—কাঁদন্তে ; যাহা নাই তাহা আঁকড়াইয়া ধরে যে—নাইআঁকড়িয়া—নাইআঁকড্যে বা নেইআঁকড্যে। (ন্যায়-কে আঁকড়াইয়া থাকে যে—সেও নেই-আঁকড়িয়া বটে, কিন্তু অর্থান্তর হইয়া পড়ে)। জ্ঞানদাসে, রঙ্গিয়া রাখাল, বিনোদিয়া কান (কানু), ইত্যাদি।

গাঈয়ে বাজীয়ে করীয়ে খাঈয়ে প্রভৃতি শব্দ কৃৎ প্রত্যয়ান্ত বলা গিয়াছে। এরূপ শব্দ তদ্ধিত ঈয়া প্রত্যয়ান্তও মনে করা চলে। কারণ, গাহা বাজা করা খাআ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য শব্দ আছে। কিন্তু করা পাঠা চালা প্রভৃতি প্রয়োজক ধাতু হইতে করাআ পাঠাআ চালাআ বিশেষ্য শব্দ নাই। অবশ্য করাইবা, পাঠাইবা, চালাইবা শব্দ আছে। কিন্তু সিদ্ধ শব্দে যখন ইবা-এর চিহ্ন নাই, তখন কৃৎ প্রত্যয়ান্ত ঈয়া মনে করিলে সকল দিক রক্ষা পায়।

৸৹ আ কি ইয়া, তাহা কোন কোন স্থলে বুঝিতে পারা যায় না। আকারান্ত শব্দের রাঢ়ে কিংবা আদিতে ই ঈ থাকিলে রাঢ়ের উচ্চারণ বিকারে আকার এ হইয়া পড়ে। চিক্‌চিকা, চিক্‌চিকিয়া—উভয় স্থলে চিক্‌চিকে উচ্চারিত হইবার কথা। কাল্‌টা, জল্‌টা শব্দে স্পষ্ট আ। বেগুনা, পাঁশুটা, হলুদা, এবং বেগুনিয়া, পাঁশুটিয়া, হলুদিয়া—দুই প্রকারই আছে। সং লবণ হইতে লোণ, লোণ+আ—লোণা ; এবং নুন+ইয়া—নুনিয়া—নুন্তে দুই-ই আছে। নেই-আঁকড়া এবং নেই-আঁকড্যে, গোবরা এবং গোবরিয়া, ছুটলা (উং ছুটলো) এবং ছুটল্যে,—দুই-ই হয়। সংস্কৃতে উত্তরা পশ্চিমা আছে ; বাঙ্গালায় উত্তরা পোনা আছে, পশ্চিমা (হাওয়া), পশ্চিম্যে (মেঘ) আছে। দক্ষিণা রাঢ়ের গ্রাম্য ভাষায় দখ্‌নো হইয়াছে, কিন্তু সাধুভাষায় দক্ষিণিয়া—দক্ষিণ্যে চলিয়াছে। উত্তরিয়া—উত্তর্যে বা উত্তুর্যে (উ পরে অ উচ্চারণে

উ) হইয়াছে। কোটের উপর দেখা যায়, ইয়া আদিক, আ অন্তর। কোন কোন সং শব্দের শেষের ক স্থানে বাঙ্গালাতে আ—য়া হইয়াছে। সং জালিক হইতে জালিয়া—জালিয়া—জাল্যা—জেলে। এইরূপ, সং মাটিক—মাটিয়া, হালিক—হালিয়া। সং বণিক্ হইতে ক বণিআ, হিং বনিয়া, আসা° বণিয়া, বাং বাণিয়া—বাণ্যা বা বেণিয়া বা বেণ্যা।* এইরূপ, মানুষের নামের শেষে অবজ্ঞায় ক বসিয়া হরি-হরিক—হরিয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। [illegible] ইকারান্ত ব্যতীত অন্য স্বরান্ত নামে ইয়া আসিয়াছে। যথা, পরাণ—পরাণিয়া—পরাণ্যে (৯২ সূঃ দেখ)।

তিনে, অঘ্রুণে প্রভৃতি মাসের দিন-সংখ্যা-বাচক শব্দের এ পরে দেখা যাইবে (১০০ সূঃ)।

।৶০ যে সকল শব্দের উত্তর উয়া হয়, তদ্ব্যতীত অন্য শব্দে ইয়া হয়। ইয়া হইলে ইয়া স্থানে সংক্ষেপে ে য, এবং দুই ব্যঞ্জন-জাত শব্দের আদ্য আকার এ হয়। এইরূপ, বালিয়া—বেল্যে, মাটিয়া—মেটো, জালিয়া—জেল্যে, ইত্যাদি। (তু° হাসিয়া—হেসে, কাঁদিয়া—কেঁদ্যে)।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দের সংক্ষিপ্ত আকারের বানান কি করা যাইবে। পাথরিয়া, কাঠরিয়া, শান্তিপুরিয়া, প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত রূপ পাথরে কাঠরে শান্তিপুরে করিলে অধিকরণ কারক বুঝাইতে পারে; উচ্চারণও ঠিক আসে না। কেহ কেহ পাথুরিয়া কাঠুরিয়া করিয়া পরে পাথুরে কাঠুরে লেখেন। কিন্তু ইহা 'চালনী'কে চালুনী, 'চাকরি'কে চাকুরি লেখার তুল্য। অ পরে ই থাকাতে অকারের উচ্চারণ ঈষৎ ও হয়। কিন্তু ঈষৎ ওকার উচ্চারণ করিতে করিতে একেবারে উকারে নামিলে তাহাকে জোরে [illegible] দিতে হয়।

মেটে (মাটিয়া), বেলে (বালিয়া) ইত্যাদি লিখিলে ক্রিয়াপদ মনে হইতে পারে, এবং ঠিক উচ্চারণও [illegible] হয় না। মোট + ইয়া—মোটিয়া—মুটিয়া শব্দ মুটে বানান করিয়া পড়িলে শেষের এ দীর্ঘ কিংবা ঈষৎ [illegible] হয় না। কবিকঙ্কণে, 'মাথ্যাতে পড়িল শিলা বিদারিয়া চাল।' [illegible] মেথে, না মেথ্যে? কোন্ উচ্চারণ ঠিক? ব্যুৎপত্তি ধরিলেও মথ্য হইতে মাথ্যা; এবং মাথ্যা উচ্চারণ-সৌকর্যে মেথ্যো পাই। ওড়িয়াতে বাণ্ড্যা পো—[illegible] পুত্র। হিন্দীতে ইয়া দিয়া লেখা ও বলা রীতি। আসামী ও ওড়িয়াতেও শব্দ সংক্ষিপ্ত হয় নাই। আমরা সংস্কৃত [illegible] স্ব প্রত্যয় শব্দ বাঙ্গালায় ধরে ও ধরিয়া—উভয় প্রকারই লিখিয়া থাকি। [illegible] অবশ্য ধরে কিংবা ধরে [illegible] ([illegible]) অবশ্য করে কিংবা করে না। জাগিলেম—জাগিলে—জাগলে লিখিলে চলে বটে, কিন্তু [illegible] [illegible]। করে—ক'রে, হতো (হত্যা)-হ'তো লেখা চলে বটে, কিন্তু বেল্যে—বে'লে, মেটো—মে'টে লেখায় [illegible] পাইনে পাথ'রে লেখায় শব্দের উচ্চারণ ঠিক আসে না। ধ্বনি-সংবাদী বানান করিতে হইলে মেটো মুটো [illegible] ইত্যাদি বানান না আনিলে চলে না। তবে, মেটো পড়িবার সময় মেটটে, মুটো পড়িবার সময় মুটে পড়িবার [illegible] আছে। দু-কথার প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গালায় না থাকাতে ধ্বনি-সংবাদী বানান দুষ্কর হইতেছে।

---

* কবিকঙ্কণে বাণ্যা, বেণিয়া, বেণ্যা ইত্যাদি রূপ পাওয়া যায়। অতএব এখনে বানিয়া শব্দে [illegible]। [illegible] শব্দ [illegible] হইলে [illegible] বাণিয়া আসে। আশ্চর্যের বিষয়, [illegible] লোকে [illegible] [illegible], [illegible]। [illegible] শব্দ না পাইলে [illegible] হইতে পারিত না। কবিকঙ্কণে এক স্থানে '[illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] না যায়।' [illegible] [illegible] (সং [illegible]—[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপত্তি [illegible]।

৯৫। উয়া।

/০ উয়া প্রত্যয় ইয়া প্রত্যয়ের তুল্য নানা শব্দে বসে। সংস্কৃত বৎ প্রত্যয় হইতে উয়া প্রত্যয় উৎপন্ন। সংস্কৃতে সাদৃশ্য বুঝাইতে, এবং 'ইহাতে কিংবা ইহার আছে' বুঝাইতে বৎ হয়। বৎ-এর ৎ লুপ্ত হইয়া তৎস্থানে আ হয়। ফলে বআ—উআ, এবং লিখনে উয়া। জল-সদৃশ—সং জলবৎ—বাং জলুআ, ওং জলুআ, হিং পনিহাঁ (পানি+বা হইতে; জল শব্দ হইতে জলবা হইতে পারিত)। সংস্কৃতে যেমন অংশু আছে বলিয়া অংশুমান (ব স্থানে ম), বাঙ্গালায় তেমন আঁশ আছে বলিয়া আঁশুআ। ওড়িয়াতেও আঁশুআ—অংশু-বিশিষ্ট। হিন্দীতেও এইরূপ আছে। সংস্কৃতে ব প্রত্যয় প্রায়ই যুক্ত অর্থে আছে। যথা, রাজী—রেখা আছে বলিয়া রাজীব, অর্ণব—ঊর্মি-যুক্ত, ইত্যাদি। প্রচলিত ভাষায় এই সকল সংস্কৃত প্রত্যয় এক আকার ধরিয়া জাত, বিশিষ্ট, সম্বন্ধীয়, তুল্য প্রভৃতি নানা অর্থ পাইয়াছে। যথা, জলবৎ বা জল-বিশিষ্ট—জলুয়া, মদ-তুল্য বা মদ-সম্বন্ধীয় বা মদে আসক্ত—মদুয়া, ঘর-সম্বন্ধী বা ঘরে জাত—ঘরুয়া, পড়া—পঠনে শীল যার—পড়ুয়া, ধানে জাত—ধানুয়া, ভাতে অনুরাগী—ভাতুয়া ইত্যাদি। স্বার্থে, বাঁকুয়া, গুরুয়া, সরুয়া (জ্ঞানদাস)।

৵০ দুই-ব্যঞ্জন-জাত অকারান্ত (উচ্চারণে অকার গ্রস্ত) শব্দের প্রথম বর্ণে অ কিংবা আ থাকিলে উল্লিখিত অর্থে উয়া হয়। প্রথম বর্ণে অ থাকিলে উয়া প্রত্যয় যোগের পর অকার ঈষৎ ও এবং আ থাকিলে তাহার স্থানে এ উচ্চারিত হয়। উয়া সংক্ষেপে প্রায় ও হয়। জলুয়া—জলো, বাতুয়া—বেতো, পাঁকুয়া—পেঁকো, হাটুয়া—হেটো, টাকুয়া—টেকো, বানুয়া (বন্যাজ)—বেনো, ইত্যাদি।

৶০ উকারান্ত কোন কোন সংস্কৃত শব্দের পরে ক বসিয়া, সেই ক স্থানে আ বা য়া হইয়াছে। যথা, বন্ধু—বন্ধুক—বঁধুয়া। এইরূপ, মানুষের নাম যদু—যদুক, মধু—মধুক হইতে যদুয়া, মধুয়া, এবং সংক্ষেপে যদো, মধো। প্রথমে মনে হয়, চাঁদ আঁকা থাকে বলিয়া চাঁদুয়া বা চাঁদোয়া। কিন্তু, চাঁদ+উয়া—চাঁদুয়া হইতে সংক্ষেপে চেঁদো হইত। (চেঁদো শব্দ আছে, অর্থ মাথার চন্দ্রাকার টাক আছে যার, চন্দ্র নামও অনাদরে চেঁদো হয়।) বাস্তবিক, সং চন্দ্রাতপ শব্দের ত প স্থানে অ অ বা আ হইয়াছে। চন্দ্র—চাঁদ; চন্দ্রাতপ—চাঁদুআ। ইহাই শুদ্ধ। এইরূপ, জাল শব্দ হইতে জালুয়া—জেলো হইত, জেল্যে হইত না। বিশেষণ শব্দের শেষে এ ও পাইলে অনেক স্থলে মূল শব্দ অনুমান করিতে পারা যায়। কেটে এবং কেঠো (প্রাং কেঠো)—দুইটি শব্দ আছে। মনে হয়, কোন শব্দে ইয়া করিয়া কেটে, এবং অন্য কোন শব্দে উয়া করিয়া কেঠো হইয়াছে। বস্তুতঃ তাই। কাটা তসরে নির্মিত—কাটিয়া—কেটো, এবং কাঠে নির্মিত কাঠুয়া—কেঠো।*

* কবিকঙ্কণে কালকেতুর গুজরাটবন কাটা প্রসঙ্গে বেরুণিয়া ও বেরুনে শব্দ আছে। ইহারা বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মূল শব্দ কি? বোধ হয়, সং ভরণ (বেতন বা ভৃতি) শব্দে ইয়া করিয়া ভরণিয়া,

৯৬। ঈ।

৴০ হ্রস্বার্থে অ-আকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। ঈ হইলে অ আ লুপ্ত হয়, এবং ঈ পূর্বস্থিত ও স্থানে উ হয় (সূঃ)। যথা, বড়া—বড়ী ; হাঁড়া—হাঁড়ী ; থালা—থালী ; লোড়া (বা নোড়া)—লুড়ী (বা নুড়ী) ; বোচকা—বুচকী ; পোটলা—পুটলী ; কাঠ—কাঠী ; জাঁতা—জাঁতী ; ছোরা—ছুরী ; চোঙ্গা—চুঙ্গী ; নল—নলী ; কোশা—কুশী ; চিঠা—চিঠী ; পেঁড়া—পেঁড়ী ; তাড়া—তাড়ী ; ডোর—ডুরী ; দোলা—দুলী (বা ডুলী) ; মোচা—মুচী (যেমন নারিকেলের) ; বেঙ্গের ছা—বেঙ্গাছী ; কড়া (আংটা)—কড়ী ; ইত্যাদি। ঘট—ঘটী ; কিন্তু তা বলিয়া পূজার ঘট যে ঘটী অপেক্ষা ছোট হইতে পারে না, এমন নহে। কলশ—কলশী। মন্দিরের চূড়ায় কলশ নির্মিত হয়, কলশী হয় না। বোধ হয় কক্ষে কলশ লইয়া নারী জল বহে না, কলশী লইয়া বহে। হিন্দীতেও আ ঈ দ্বারা ছোট ও বড় বুঝায়। যথা, বাং হাতড়া, হিং হথৌড়া—বাং হাতুড়ী, হিং হথৌড়ী। মরাঠীতেও হতোড়া—হতোড়ী। ওড়িয়াতেও এইরূপ। ডিঙ্গা বড়, ডিঙ্গী ছোট। কিন্তু ডোঙ্গা অপেক্ষা ছোট ডুঙ্গী বাঙ্গালার প্রচলিত নাই। মরাঠীতে ডঙ্গী অর্থে ছোট ডোঙ্গা। সংস্কৃতে দ্রোণ (ডোঙ্গা) ও দ্রোণীর মধ্যে প্রভেদ আছে কি ? বাঙ্গালায় ডোঙ্গা অপেক্ষা দোণী বা দুণী (জল-সেচনের) ছোট।

বাঙ্গালা ওড়িয়া হিন্দী মরাঠীর এই যে হ্রস্বার্থে ঈ, তাহা সংস্কৃতের স্ত্রীলিঙ্গের ঈ। এইহেতু ঈ দিয়া সংস্কৃতের সহিত সাদৃশ্য রাখা যাইতে পারে। যদি ঈকার দিলে ক্ষুদ্রতা বুঝায়, সে সুবিধা ছাড়ি কেন ?

৵০ করণার্থে ঈ হয়। কৃৎ অনি প্রত্যয়ের পরিবর্তে প্রথমে অন করিয়া পরে করণার্থে ঈ করা যাইতে পারে। যথা, চালন—চালনী ; কুরন—কুরনী ; সেচন—সেচনী ; ছেদন—ছেদনী (ছেঅনী বা ছেনী) ; ধুঅন—ধুচনী (চ আগম কেন হয় ? ধোত হইতে ত স্থানে চ ; তুং ধৌতি—ধুতি) ; ছাঁকন—ছাঁকনী ; ঘূরণ—ঘূরনী—ঘুণী (মাছ-ধরা যন্ত্র-বিশেষ) ; ঘোল-মন্থন—ঘোল-মহনী ; চিরন—চিরনী ; গলান—গলানী ; (গলবন্ধন রজ্জু)। অন পরে ঈ করিলে হ্রস্বার্থে ঈ প্রত্যয়ের সহিত সাদৃশ্য থাকে। যথা, চালন হইতে চালনা—চালনী ; ছাঁকন হইতে ছাঁকনা—ছাঁকনী ; তুং সং বন্ধনী, চালনী, বেধনী, নখ-রঞ্জনী, ইত্যাদি শব্দ ঈকারান্ত।

৶০ অন প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দেও করণার্থে ঈ হয়। যথা, মাছ গাঁথা যায় যে জালে—গাঁথী—গাঁতী (জাল)। এইরূপ, চাপা হইতে চাপী—চাবী (যেমন তালার এবং মাছ-ধরা যন্ত্র) ; ঘান (হনন) করা যায় যে কলে—ঘাণী (হ স্থানে ঘ ; তুং সং অংহ্রি অংঘ্রি একই শব্দ) ; চুমক দেওয়া যায় যে পাত্রে—চুমকী। এ সকল স্থলে ধাতুর উত্তর কর্তৃ ও করণ বাচ্যে ই করা যাইতেও পারে। তখন, গাঁতি, চাবি, ঘাণি, চুমকি। এইরূপ, চকমকি বা চকমকী, ছিপি বা ছিপী। সাদৃশ্য-রক্ষার্থে ঈকারান্ত করা ভাল বোধ হয়।

অপভ্রংশে বেতুনিয়া (বেতন লইয়া কাজ করে যে) হইয়াছে। এখনও এই শব্দ মানভূমে চলিত আছে। [illegible] বলিবার শব্দের অর্থও নাই।

।০ বিশিষ্ট সম্বন্ধীয় জাত দক্ষ ইত্যাদি অর্থে ঈ হয়। যথা, বিশিষ্ট অর্থে দামী, দাগী, বদ্‌মেজাজী, গোলাপী, বেগুনী। চালান সম্বন্ধীয়—চালানী (-কারবার)। এইরূপ, পোশাকী (-কাপড়), জ্বালানী (-কাঠ), উকীলী (-বুদ্ধি), মহাজনী (-হিসাব), তেজারতী (-পেশা), জমিদারী (-সেরেস্তা), আবাদী (-জমি), সূতী (-চাদর), পার্বণী (-তত্ত্ব), ভাগলপুরী (-গাই), কাশ্মীরী (-শাল), ইত্যাদি। হিসাবে দক্ষ—হিসাবী; আলাপে দক্ষ—আলাপী, এবং আলাপ আছে যার সঙ্গে—আলাপী। এইরূপ, কারবারী, করাতী, সেতারী, ঢাকী, ঢোলী (বা ঢুলী), ইত্যাদি। চণ্ডীদাসে, 'মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা।' কবিকঙ্কণে, 'কালি রাঙ্গি পাশা সারি লইয়া পার্ব্বতী।' কালী রাঙ্গী বানান ঠিক হইত। কারণ বাঙ্গালা শব্দের অনুরূপ সং ধনী, হস্তী, পক্ষী, শিখী, কর্মী, ব্যাপারী প্রভৃতির ঈকার বাঙ্গালাতে নিশ্চয় রাখিতে হইবে। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দ প্রত্যয়ে এক রাখিতে পারিলে নানা সুবিধা আছে।

।/০ বিশিষ্ট অর্থে ঈ সংস্কৃতে ইন্ প্রত্যয়ের ঈ মনে করা যাইতে পারে। প্রথমা বিভক্তির একবচনে ইন্ ভাগান্ত শব্দ ঈকারান্ত হয়। বাঙ্গালায় এই আকার আসিয়াছে। তথাপি বাঙ্গালায় রঙ্গিন্ গুণিন্ শব্দও চলিত আছে। কেবল-অন্ত বন্ত মন্ত প্রত্যয় সংস্কৃত প্রত্যয়ের বহুবচনের রূপ। অন্য সমুদয় প্রত্যয়ান্ত শব্দে (যেমন রাজা, পিতা, নদী) প্রথমা বিভক্তির একবচনের রূপ বাঙ্গালায় চলিয়া আসিয়াছে। অতএব যেমন গুণী ধনী শব্দ বাঙ্গালায় আছে, তেমনই সাদৃশ্যে দাগী, দামী এবং রাগী, ভারী প্রভৃতি শব্দ হইয়াছে। রাগী ও ভারী সংস্কৃত শব্দ। তেজস্বী যশস্বী স্বামী প্রভৃতি শব্দের বিন্ ও মিন্ প্রত্যয়ের স্থানেও বাঙ্গালা ঈ মনে করা যাইতে পারে। সং ঈয় প্রত্যয়ের সাদৃশ্যে সম্বন্ধীয় ও জাত অর্থে বাং ঈ প্রত্যয় আসিয়াছে। দেশীয়—দেশী, রাঢ়ীয়—রাঢ়ী যেমন, সরকারী মহাজনী নবাবী প্রভৃতি ঈকারান্ত বাং শব্দও তেমন। নবাবী (কায়দা)—নবাবের যোগ্য বা নবাব-সম্বন্ধীয়; নবাবি—নবাবের বৃত্তি, ধর্ম। নবাবী বিশেষণ, নবাবি বিশেষ্য। তিনি হাকিমি করেন, তাঁহার হাকিমী হুকুম; তিনি ডাক্তারি করেন, তাঁহার ডাক্তারী দোকান আছে; ইত্যাদি ই ঈ দ্বারা দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ করা যায়। উভয় অর্থে ঈ কিংবা ই লিখিলে বানানে অর্থের প্রভেদ থাকে না।

।৴০ শান্তিপুরী, কটকী, বৃন্দাবনী প্রভৃতি শব্দ ঈকারান্ত। শান্তিপুর্+ঈ=শান্তিপুরী। কিন্তু ঢাকাই, কলিকাতাই, খাগড়াই প্রভৃতি আকারান্ত শব্দের পরে ই। দেখা যায়, ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে ঈ, যুক্ত না হইয়া শব্দের পরে বসিলে ই। (এইরূপ, কাটাই মাড়াই খরচ।) মিঠা দ্রব্যে জাত—মিঠাই (সং মিষ্টান্ন শব্দ হইতে মিঠাই হইবার সূত্র পাই না)। এইরূপ, পাঁকে জাত পাঁকই (পাঁকে জাত ঘা); নখকোণে জাত (ঘা)—নখকোণই (কোন কোন স্থানে নখকোনি)। পাঁক ও কোণ আকারান্ত না হইলেও ই যুক্ত হয় নাই।

।৶০ স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় ঈ পরে দেখা যাইবে।

৯৭। ট ড র ল, টা ড়া রা লা, ইত্যাদি।

/০ অনেক বাঙ্গালা শব্দের শেষে ট ড র ল আছে। কিন্তু শেষে আছে বলিয়া এই এই বর্ণ প্রত্যয়ের অংশ, এমন বলিতে পারা যায় না। শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় বসে। কিন্তু সে মূল শব্দ পৃথক্ পাওয়া না গেলে শেষের বর্ণগুলি প্রত্যয় কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা রূপান্তরেও সে সকল বর্ণের উৎপত্তি হইতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

সং চক্র শব্দ হইতে অনেক বাঙ্গালা শব্দ হইয়াছে। চক্র শব্দের র লোপে চাক (কুমারের), চাকা (গাড়ীর); র স্থানে ল হইয়া চাকলা (গ্রামসমূহ), চাকলী (চক্রাকার পাতলা—যেমন সরুচাকলী পিঠা—সং শষ্কুলী)। চক (উং চক্কর) শব্দের র বিপ্রকর্ষে চকর, চক্কর; র স্থানে ল হইয়া চকলা (কেহ কেহ চোকলা—যেমন আমের—খণ্ড); বর্ণ বিপর্যয়ে চড়ক, চরকা, চরকী—(হ্রস্বার্থে ঈ)।

সং চর্ম শব্দ হইতে চাম। রেফ বিপ্রকর্ষে চমর—চমরা—চামরা বা চামড়া (কিংবা চাম শব্দে স্বার্থে ড়া), ড় স্থানে ট হইয়া চামাটি (নাপিতের খুরের ধার করিবার চর্ম, কিংবা পত্র অর্থে তি স্থানে টি)। সং চর্মন্ হইতে মং চামট বাং চিমট—চিমড়; চিমড়+আ (স্বার্থে)—চিমড়া (মং চিম্বট)।

সং পত্র হইতে পাত, পাতা, পাতী। র বিপ্রকর্ষে—পাতলা (কিংবা পাত+লা সাদৃশ্যার্থে), পাতড়া বা পাতাড়ী (কিংবা পাতা শব্দে স্বার্থে ড়া ড়ী)। সং অন্ত্র হইতে আঁত, আঁতী, আঁতড়ী। অগ্রবর্তী হইতে আগাড়ী। সং দর্প হইতে দাপর—দাপট, দাবড়ি। সং সর্ব হইতে সব, সারা, (সাবার বা) সাবাড়; সং অর্ধ—আধরা—আধলা, আধলী। সং মিশ্র বা মিশ্রণ হইতে মিশাল। সং গর্ভ হইতে গাবা, গাবাল (যেমন পুকুরের)। সং চপেট বা চর্পট হইতে চাপড়, চাপড়া বা চাবড়া। সং একল হইতে একলা—একটা, ইত্যাদি।

' কোন কোন সং শব্দের ন ণকার স্থানে ট ড র ল হইয়াছে। সং চিক্কণ—চিকটা (-মাটি)। সং তীক্ষ্ণ—তিখড়, তোখড়। চোহাণ (পার্বত্য জাতি বা দস্যু বিশেষ—চোহাণ রাজপুত)-হইতে চোআড় (হিং চোআড়, চোহাড়)। সং বিঘ্ন হইতে বাগড়া। সং নগ্ন বা নগ্নক হইতে নাঙ্গাটা—নেঙ্গাটা। এইরূপ সং চর্মন্ হইতে চামড়া; চর্বণ (কিংবা চর্বিত) হইতে চাবড়া—ছাবড়া—ছিবড়া; কৃষ্ণ হইতে কিষ্টা (কাল-কিষ্টা বা কিষ্টী); সং কৃপণ হইতে কিপটা; ইত্যাদি। (১৩১৮ সালের প্রবাসী দেখ)

সংপ্রাকৃতে শব্দের উত্তর স্বার্থে ল র প্রত্যয় হইত। যথা, সং বিদ্যুৎ+ল—সং প্রাং বিজ্জুলা—বাং বিজলী বা বিজুলী; সং দীর্ঘ+ল—দীঘল; সং পত্র+ল—পাতলা; ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল স্থলে পৃথক ল র প্রত্যয় স্বীকার না করিলেও চলে। কারণ, বিদ্যুৎ শব্দের ৎ স্থানে ল, দীর্ঘ হইতে দীঘল, পত্র হইতে পতর—পাতলা অনায়াসে আসিতে পারে। অনেক গ্রামের

নাম দিঘল, অপভ্রংশে দিগল আছে। ল স্থানে ড় হইয়া দিঘড়—দিঘড়া, অপভ্রংশে দিগড়া নাম হইয়াছে। বঙ্কেরাজ হইতে বাঁকা-রায় এবং বাঁকরা—বাঁকড়া—বাঁকুড়া নাম (বাঁকুড়া নগরের এক্তেশ্বর (একতা+ঈশ্বর ?) শিব বাঁকা; বাঁকা-রায় নাম ধর্মঠাকুরের আছে।)

৵০ সংস্কৃতে শব্দের শেষের ক লোপের পর বাঙ্গালায় ক স্থানে র ড ল বসিয়াছে। র ড ল একেরই বিভিন্ন রূপ। যথা, সং পেটক—পেটরা; সং ইল্লাক—ইচঁলা (মাছ); সং শাবক—ছাওয়াল; সং হিংসক—হিংসটা; সং বিটক—বিটল; সং ভাটক—ভাড়া, ভাড়াটা (+ইয়া—ভাড়াটিয়া)। এইরূপ, সং (গো-) রক্ষক—রাখাল (কিংবা রাখা+আল প্রত্যয়)।

৶০ বাঙ্গালাতেও স্বার্থে ড র ল, টা ড়া রা লা, আড়, আর, আল প্রত্যয় হইয়াছে। যথা, সং ছায়া—ছায়ারা—ছায়রা—ছাঅরা; সং স্তোক—টোকরা—টুকরা (হিং থোড়া); সং স্তোক কিংবা তোক—ছোকরা (ওং টোকা); সং ছিন্না—ছিনার, ছিনাল; সং বিট—বিটল; সং পেট—পেটরা; সং ভুক—ফোকর, ফোকলা (-দাঁত); সং যোগ—যোগাড় (কিংবা সং আ-যোজন—যোজন হইতে); সং যুগ—জুআল; বাং থাবা—থাবড়া, থাবড় (কিংবা সং স্থাপন শব্দের ন স্থানে ড়); বাং ফাঁপা—কোঁপরা; বাং ফাট—ফাটল; বাং লাগ—লাগাল; বাং হাট—হাটর (+ইয়া—হাটরিয়া); বাং কাঠ—কাঠর (+ইয়া—কাঠরিয়া); ইত্যাদি। কোন্ শব্দের ট ড র ল সংস্কৃত বর্ণের বিকারে আসিয়াছে, কোন্ শব্দে বাঙ্গালা প্রত্যয়, তাহা সকল স্থলে নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। সং কবল হইতে কঅল—কল (গোরুর গ্রাস), কামড়, খাবল, খামল—এই চারি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে (ব স্থানে ম; যেমন সং বিনতি বাং মিনতি)।

।০ সদৃশ অর্থে টা ড়া ল আল প্রত্যয় হয়। সং বৎ প্রত্যয়ের বিকারে বাং প্রত্যয়ের উৎপত্তি। যথা সং তাম্রবৎ—তামাটা; ধূম্রবৎ—ধুআঁটা; শুক্রবৎ—শুকটা; আমিষবৎ—আঁইষটা; পাংশুবৎ—পাশুটা; ইত্যাদি। এই সকল শব্দ (রাঢ়ে) এমন উচ্চারিত হয় যেন শেষে ইয়া আছে। যথা, তামাটিয়া—তামাট্যে, ধুআঁটিয়া—ধুআঁট্যে, শুকটিয়া—শুকট্যে, ইত্যাদি। অতএব বোধ হইতেছে, সং তা ত্ব প্রত্যয় (যেমন বন্ধুতা, বন্ধুত্ব) স্থানেও বাঙ্গালাতে টা প্রত্যয় আসিয়াছে। সং তাম্রতা—তামাটা; তামাটা+ইয়া—তামাটিয়া; শুক্তা—শুকটা; শুকটা+ইয়া—শুকটিয়া (অপভ্রংশে বর্ণ বিপর্যয়ে শুটকিয়া—শুটক্যে কিংবা শুটকী)। কিন্তু তামাটা ধুআঁটা শব্দও অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। ওড়িয়াতেও টা, টিআ আছে। যথা, রোগাটা, ধুআঁটিআ। বাং তামাটিয়া—ওং তম্বাল্লিআ; বাং আঁইষটিয়া—ওং আঁইষিঞ্চিআ। (ল, ণ—ড, ট)। ঘোর সদৃশ—ঘোরাল, প্রায় গোল—গোলাল। এইরূপ, মোটাল, রোখাল চোখাল (উগ্র), প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ আছে। ঘোরালা, মোটালা, চোখালা প্রভৃতি লা প্রত্যয়ান্ত শব্দও শোনা যায়। ঈষৎ অর্থ স্পষ্ট করিতে মোটালী—অর্থাৎ মোটাল+ঈ শব্দও আছে।

৷৵০ সম্বন্ধীয় ও জাত অর্থে র রা রী ড়া টা টী ল আল আলি আলী প্রত্যয় হয়।

যথা, বাঁশে জাত—বাঁশরী (স্বার্থে ঈ), কাংস্যে নির্মিত—কাঁসর (-বাদ্য) ; কাঠ সম্বন্ধীয় বা কাঠে নির্মিত—কাঠরা, (যেমন কাঠ-কাঠরা, কাঠরা—কাঠের জিনিষ) ; গাছ সম্বন্ধীয় বা গাছে জাত—গাছড়া (গাছ-গাছড়া—গাছ এবং গাছের অংশ, যেমন শিকড়, বাকল), রাজার তুল্য বা রাজ-সম্বন্ধীয় লোক—রাজাড়া—রাজড়া (হিং ম° রজবাড়া, হিং-তে অর্থ রাজ্য, ম°-তে রাজ-প্রাসাদ ; অতএব রাজবাটী হইতে ম° রাজবাড়া। স° রাজন্য শব্দের বিকারেও বা° রাজড়া আসিতে পারে) ; (প্রায়ই শীষের) অগ্রে জাত—আগড়া (ধানের) ; ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় কর্ম—খেতড়া ; কন্থা—কাঁথমাটি—হইতে জাত—কাঁথড়া ; বাহু সম্বন্ধী—বাহুটী, বাউটী (ভূষণ ; যথা বিদ্যাপতি, 'অঙ্গুলক আঙ্গুটি সো ভেল বাহুটি') ; পাঁকে জাত—পাঁকাল (-মাছ, স° পঙ্কাল) ; মরু—মারর দেশে জাত—মাররাড়ী। হাতে ধরিবার যোগ্য—হাতল ; গাঁ সম্বন্ধী—গাঁআলী (-কাজ) ; মাইয়া (মেয়ে) সম্বন্ধী—মায়ালী—মেয়েলী (তু° গাঁআলী অপভ্রংশে গেঁয়েলী) ; গৃহস্থ সম্বন্ধী—গৃহস্থালী (-কাজ)। এইরূপ, ঠাকুরের যোগ্য—ঠাকুরালী ; চতুরালী, নাগরালী। বিশেষণ শব্দ বিশেষ্য রূপেও প্রযুক্ত হয়। বোধ হয়, বিশেষণ হইলে ঈ, এবং বিশেষ্য হইলে ইকারান্ত করায় সুবিধা আছে।

।৶৹ বিশিষ্ট, শীল, দক্ষ অর্থেও ঐ সকল প্রত্যয় হয়। যথা, সোনা বিশিষ্ট বা সোনায় আবৃত—সোনালি বা সোনালী। এইরূপ, রুপালি বা রুপালী। দুধ বিশিষ্ট—দুধাল (-গাই) ; দোহা শীল যার—দোহাল ; মাতা (মত্ততা) শীল যার—মাতাল। এইরূপ, বিশিষ্ট অর্থে, মাঁসাল (স° মাংসল), শাঁসাল, দাঁতাল, ছিআল (স° শ্রীল), আঁটাল, আঠাল, তেজাল, গোছাল, ধারাল। শীল বা দক্ষ অর্থে সিঁধাল, গাঁজাল, লাঠিআল, ঘাটীআল, ঘড়ীআল (ঘড়ী বাজান কাজ যার, কিংবা মাথায় ঘটী আছে যে কুমীরের)। আল উচ্চারণে বিশেষ্য বুঝায়, যেমন দোহাল। আলা প্রত্যয়ের যোগেও বিশেষ্য বুঝায়। যেমন ঘড়ী রাখে বা বিক্রি করে যে—ঘড়ীআলা। এইরূপ, ফেরি-আলা, গাড়ী-আলা। বিশেষণও হয়। যেমন, পয়সা-আলা লোক, মাথা-আলা মানুষ। অনেকে, বিশেষতঃ শহরের লোকে, আলা না বলিয়া হিন্দী-ভাষীর অনুকরণে বালা-ওয়ালা বলেন। কিন্তু হিন্দী বালা—বা° আলা, এবং স° আল, আলু প্রত্যয়। তু° স° বাচাল বা বাচাট, দয়ালু। এইরূপ, বা° লাঠী-আল, লাঠী-আড়া। হয়ত স° বল প্রত্যয়ও মিশিয়াছে। স° রজস্বলা—রজঃযুক্তা ; স° শাদ্বল—নবতৃণযুক্ত। সেইরূপ, মাথাযুক্ত—মাথা-আলা বা মাথাওয়ালা। ওড়িয়াতে ওয়ালা না হইয়া বালা। যথা, ফেরি-বালা, গাড়ী-বালা। স° পাল (রক্ষক) শব্দের প লোপে আল থাকে। যথা, ঘট্টপাল—ঘাটিআল, কোট্টপাল—কোত-আল, রক্ষকপাল (রক্ষক+রক্ষক)—রাখাল, ব্যাঘ্র হইতে রক্ষক—বাগাল, ইত্যাদি। ঝোপ বিশিষ্ট—ঝোপরী বা ঝুপরী (-বন) ; ভাঙ্গ-পানে দক্ষ—ভাঙ্গাড় ; ঘাস বৃত্তি যার—ঘাসাড়া (অপভ্রংশে ঘসাড়া, ঘেসেড়া) ; নৌ বৃত্তি যার—নৌ-আড়া—নাউ-আড়া—নাউড়া (অপভ্রংশে নাউড়ে)। এরূপ, খেল-আড়া, কাঁসী-আড়া, লাঠী-আড়া,—অপভ্রংশে খেলেড়া-খেলুড়ে, কেঁশেড়া-কেঁশুড়ে, ল্যাঠেড়া-লেঠুড়ে, ইত্যাদি। বাসায় থাকে যে—বাসাড়া ; বাসাড়া জনের ধর্ম বিশিষ্ট—

বাসাড়িয়া—বাসাড়ে—অপভ্রংশে বেসেড়া (কবিকঃ-তে বাসাড়ে)। ডুবিতে বা ডুবায় দক্ষ—ডুবায়ু বা ডুবারী (চণ্ডীদাসে, 'কেমন ডুবায়ু ডুবেছে তাহাতে না জানি কি লাগি ডুবে', কবিকঙ্কণে, 'ডুবরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে')। ডুব ধাতু হইতে ডুবা (ডোবা) ; ডুবা+আয়ু আরী বা য়ু রী—ডুবায়ু, ডুবারী,সংক্ষেপে ডুবয়ু, ডুবরী। এইরূপ ধুনিতে দক্ষ যে—ধুনায়ু ধুনারী বা ধুনরী (ধনু শব্দ হইতে ধনুয়ু হইত)।* পদ বিশিষ্ট—পদার—পআর—পয়ার (পদ্য) ; জান (জীবন) বিশিষ্ট—জানআর, জানোয়ার। গ্রাম্য ভাব—গাঁঅ—গোঁ ; গোঁ আছে যার—গোঁআর (হিং গঁৱার, অতএব গোঁআর শব্দের আদিম অর্থ গ্রাম্য। কোষ দেখ)।

।৵০ কোন কোন শব্দের শেষের আর আরি অংশকে প্রত্যয় বলা যাইবে কিনা, সন্দেহ। ভিক্ষা বৃত্তি যার—ভিক্ষাকারী—ভিখাআরী—ভিখারী। এইরূপ কাঁসারী, শাঁখারী, চুনারী। কাচ-কার—কাচরা ; স্বর্ণকার—হিং সোনার, বাং সাকার—সাকরা—সেকরা (স্বর্ণ শব্দের ণ লুপ্ত) ; খেলাকার—খেলা-আড়—খেল-আড়। ভাগ গ্রহণ করে যে—ভাগহারী—ভাগআরী—ভাগারী। এইরূপ, সং স্কন্ধহার—কাহার (পালকী-বাহক) ; সং সর্পহার—সাপার—সাপড়া হইবার কথা। বোধ হয়, সর্প হইতে সাপর—সাপড়,+ইয়া—সাপড়িয়া—সাপড়্যে।

৯৮। চ, চি।

সম্বন্ধীয় অর্থে কয়েকটি শব্দে চ, চি হয়। যথা, ঘরের কোন সম্বন্ধী (কাঠ)—কোনাচ ; কানা (কেনারা) সম্বন্ধী (কাঠ)—কানাচ। দোড়াতে পাক অধিক হইলে, মুড়িয়া ঘুরচি বা ঘুড়চি পড়ে। বাকৃষ পাল্‌কীর আবরণ বস্ত্রের নাম কোন কোন স্থানে ঘোড়চি, ঘোড়াঞ্চি আছে। রাঢ়ে সং ঘটা-টোপ অপভ্রংশে ঘেটাটোপ বা ঘেরাটোপ (কোষ দেখ)। চ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অল্প আছে। এই চ মূলে প্রাচীন সংস্কৃত ক প্রত্যয়ের তুল্য, যেমন বহ্লিহ সম্বন্ধী—বহ্লিহক। (কারক দেখ)

বেজোর ছা—বেজাছা, ক্ষুদ্রার্থে ঈ হইয়া বেজাছী। সং তির্যচ্‌ হইতে তেড়চা। আল্‌গচা শব্দের চা এর মূল ভিন্ন (কোষ দেখ)।

৯৯। ইত।

যুক্ত, প্রাপ্ত, ভক্ত অর্থে ইত প্রত্যয় হয়। সংস্কৃতেও কুসুমিত—কুসুম-যুক্ত, দুঃখিত—দুঃখ-প্রাপ্ত, ইত্যাদি। এই ইত প্রত্যয় কৃৎ ত ইত প্রত্যয়ের তুল্য। বাংতে ইত প্রত্যয়ান্ত শব্দ অল্প আছে। সং লবণাক্ত হইতে লোনতা, কিংবা লোণ+ইত—লোনিত—লোনতা। পানি

---

* কবিকঙ্কণে, 'ঘায়ে জয় করি যায় তুলায়ু ঘোড়ায়ু। উতকান করি যায় যতেক পশায়ু।' তুলায়ু ঘোড়ার পশায়ু নামে কি অর্থ বুঝাইত, তাহা না জানিলে কেবল আয়ু য়ু দ্বারা কিছুই বলিতে পারা যায় না। ঘোড়ার বোধ হয় হিং ঘোড়বাদ, সং ঘোটক—বড় গর্ত এবং ঘোড়ার মতন একখুরী। ইহা হইতে ঘোড়াখুরী—ঘোড়ার হওয়া আশ্চর্য নহে। পশায়ু হয়ত পেশায় (কোষ দেখ)।

(জল) যুক্ত বা প্রাপ্ত পানীতা—পান্‌তা। ডাক—চীৎকার আছে যার—ডাকাইত্ (তু° ডাকা-বুকা), সেবা করে যে—সেবাইত্। এইরূপ শিবভক্ত—শিবাইত, লিঙ্গভক্ত—লিঙ্গাইত, ইত্যাদি। ডাকাইত্ ও সেবাইত্ শব্দে ইত মনে করা যাইতে পারে। ওড়িয়াতে, রাজটিকা পাইয়াছে যে—টিকাইত্, খণ্ডা (খাঁড়া, খড়্গ) ধরে যে—খণ্ডাইত্ শব্দ তুলনা করা যাইতে পারে। জজিয়তি শব্দ হয়ত জজিয়ৎ শব্দে ই যোগে নিষ্পন্ন। জজ-কর্মে নিযুক্ত—জজিয়ৎ; জজিয়তের কর্ম জজিয়তি। ইত প্রত্যয় স্থলবিশেষে য়ৎ মনে হয়। কৃৎ প্রত্যয় অৎ স্থানে য়ৎ কি অন্ত কোন প্রত্যয়ের বিকারে য়ৎ, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন।

১০০। উ, উক।

ঢাল বিশিষ্ট—ঢালু, গুড় বিশিষ্ট—গুড়ুক (তামুক)। ঘাট সম্বন্ধী—ঘাটু—ঘেটু (ঠাকুর), ঘেটু-ফুল। লজ্জাশীল—লাজুক। এইরূপ মিথ্যুক, পেটুক। বাং'তে উ উক প্রত্যয়ান্ত শব্দ অত্যল্প। হিন্দীতে উ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অনেক আছে। নীচু গাড়ু আগু পিছু প্রভৃতি শব্দের উ প্রত্যয় নহে (কোষ দেখ)। উচুঁ শব্দের সাদৃশ্যে নীচু, আগু সাদৃশ্যে পিছু। সং গড়ু হইতে গাড়ু।

১০১। বন্ত, মন্ত।

বিশিষ্ট অর্থে বন্ত মন্ত হয়। জ্ঞান বিশিষ্ট—জ্ঞানমন্ত। এইরূপ বুদ্ধিমন্ত, ধনবন্ত, পয়মন্ত, মূর্তিমন্ত, শ্রীমন্ত। ব ও ম স্থান পরিবর্তন করিতে পারে (সূ:); এই হেতু কেহ মন্ত, কেহ বন্ত বলে। বিদ্যাপতি, 'সকল পুরুখনারী নহে গুণবন্ত'। সংস্কৃতে বৎ মৎ প্রত্যয়ের বহুবচনে বন্ত মন্ত হয়। সেই বহুবচনের রূপ দেশভাষায় চলিত হইয়াছে। সং-প্রাকৃতে বন্ত মন্ত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃতে বন্ত মন্ত প্রত্যয় ছিল। যেমন কেশবন্ত্, শক্তিবন্ত্, বিভবমন্ত্, বসুমন্ত্। বিশিষ্ট-অর্থ ব্যতীত তুল্যার্থেও বন্ত প্রত্যয় হইত (মৎ মন প্রত্যয় দেখ)। সং মন্ত্, ফা° মন্দ। ফা° আক্কল-মন্দ, দৌলতমন্দ, জোরমন্দ, ইত্যাদি। আসামী ও ওড়িয়াতে মন্ত বন্ত প্রত্যয় বহু প্রচলিত।

১০২। ক কা।

/০ সংস্কৃতে ক প্রত্যয় বহুপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালাতে ক প্রত্যয়ান্ত শব্দ অল্প আছে। স্বার্থে, বড়কী (বড় বউ), মেজকী (মেঝ বউ), ছোটকী (ছোট বউ), ইত্যাদি কএকটি আছে। মৈথিলীতে 'ছোটকা'—ছোটটি। ঝলক, হল্‌কা, দমক, ধমক প্রভৃতি কএকটি শব্দ এস্থলে আনা যাইতে পারে। করিয়া অর্থে এবং করিয়া পদের ক লইয়া অনেক শব্দের শেষের ক হইয়াছে। পরে এ বিষয় দেখা যাইবে (আক্ প্রত্যয় দেখ)। সংস্কৃতে হ্রস্বার্থে ক প্রত্যয়ান্ত শব্দ অল্প নাই। বাঙ্গালায় দুই একটা পাওয়া যায়। যেমন বোঝা হইতে বোঝকা—বোচকা (হ্রস্বে বুচকী)।

৶০ করে যে—এই অর্থে কা হয়। হোঁৎ হোঁৎ করে যে—হোঁৎকা, পট করে—পট্‌কা। করায় যে বা যাহা এই অর্থেও কা হয়। কোঁৎ করায়—কোঁৎকা। কোষ দেখ)

১০৩। কর, গর।

কর এই সংস্কৃত শব্দটি বাঙ্গালা ও যাবনিক শব্দের পরে যুক্ত হইয়া যে করে এই অর্থ প্রকাশ করে। যথা, বাজিকর, হালইকর (আর্বী হল্‌ব্রা—মিষ্টান্ন)। সং কর=ফার্সী গর। সং কারিকর=ফাং কারিগর। সৌদা-গর।

২০৪। কার।

/০ সংস্কৃতে যেমন অ-কার ক-কার হুঙ্কার, তেমনই জয়জয়কার অর্থাৎ জয়-জয়, এই ধ্বনি মাত্র। বাংতে তুই-তো-কার হইতে তুইতোকারি—তুই তোরা বলা। হাঁ-হাঁ করিলে হাঁকার (সং হুঙ্কার)। গ্রাম্য লোকেরও শকার-বকার জ্ঞান আছে।

৶০ চর্মকার কর্মকার কুম্ভকার প্রভৃতি শব্দের কার উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। কার শব্দের আর যোগে চামার, কামার, কুমার ইত্যাদি।

১০৫। আম, আমি।

সংস্কৃত পাকিম—বাং পাকাম্‌। বাঙ্গালাতে জেঠাম, বুড়াম, ঠকাম, বাঁদরাম, ফচ্‌কাম ইত্যাদি শব্দ যে সং পাকিম তুল্য বিশেষণ, তাহা ঐ শব্দের অকারান্ত উচ্চারণে ও অর্থে বুঝিতে পারা যায়। বাঁদরাম কাজ, ঠকাম বুদ্‌ধি ইত্যাদি শোনা যায়। এই সকল বিশেষণ শব্দে ভাবার্থে ই যুক্ত হইয়া জেঠামি, বুড়ামি ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে। আম ও আমি দ্বারা নিন্দার্থ প্রকাশ হয়। ওড়িয়া গারিমা বড়িমা বঙ্কিমা প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃত ইম প্রত্যয় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

১০৬। আন, আনা, আনি।

/০ গুণ আছে যার—সং গুণবান্‌। এইরূপ, দ্বারের স্বামী (বা রক্ষক)—দ্বারবান্‌—দারো-আন বা দারআন। ফার্সীতে বান (ৱান নহে) প্রত্যয়েরও অর্থ এই। ফাং দর=সং দ্বার ; ফাং দরবান—সং দ্বারবান বাং দারআন। দারআনের কর্ম দারআনি (ই প্রত্যয়)। এইরূপ, কোচআন, গাড়ী-আন (হিং গাড়ীৱান)—গাড়আন (ঈ লুপ্ত)। ফাং বাগ্‌বান (উদ্যান-রক্ষক)—বাগান হইয়া বাংতে ভুলে উদ্যান অর্থ পাইয়াছে।

৶০ সংস্কৃতে তুল্যার্থেও বৎ প্রত্যয় হয়, এবং বৎ হইতে বান, মন্ত হয়। সং বান হইতে বাংতে আন হইয়াছে, হিন্দীতে বান আছে। ফার্সীতেও আনা প্রত্যয়ের অর্থ, তুল্য। মুন্‌শী-আনা—মুন্‌শীর তুল্য। বাংতে আনা আনি প্রত্যয় দ্বারা তুল্য কর্ম বা ব্যবহার বুঝায়। যথা, মুন্‌শী-আনা—মুন্‌শীর তুল্য কর্ম, বাবু-আনা—বাবুর তুল্য কর্ম বা ব্যবহার। এইরূপ,

হিঁদু-আনি, বিবী-আনি। নবাবের যোগ্য ব্যবহার—বাং নবাবি, ফাং নবাবী। ই প্রত্যয়ের যে অর্থ, আনা আনি প্রত্যয়েরও সেই অর্থ। অ আকারান্ত শব্দের উত্তর ই, ইউ-কারান্ত শব্দের উত্তর আনা আনি এবং অন্যান্য প্রত্যয় হয়। সাহেবি—সাহেবের তুল্য ব্যবহার। কেহ কেহ ভুল করিয়া সাহেবি-আনা বলে (তুং গোঁআরতামি)। বাস্তবিক, হয় সাহেবি, না হয় সাহেব-আনা বলা ঠিক।

৵০ ফার্সী আনা বাংতে (প্রায়ই) ইয়ানা প্রত্যয় সম্বন্ধীয় অর্থে হয়। যথা, ফাং মালিকানা—মালিক সম্বন্ধীয় (প্রাপ্য); ফাং মাহানা বাং মাহিয়ানা, ফাং সালানা বাং সালিয়ানা। ফাং শামানা বাং শামিয়ানা, ফাং শাম বাং সন্ধ্যার সময় যাহা টাঙ্গানা হইত (তুং সং চন্দ্রাতপ বাং চাঁদুআ)।

১০৭। তা, তি।

/০ শুক্রের ভাব—সংস্কৃতে শুক্লতা। বাঙ্গালায় এই তা প্রত্যয় স্থানে কোথাও টা এবং তি হইয়াছে। সং তাম্রতা—তামাটা; তামাটা বিশিষ্ট—তামাটিয়া। কমের ভাব—কমতি। এইরূপ,—বাড়তি, শুকতি, ঘাঁকতি প্রভৃতি শব্দে তদ্ধিত তি প্রত্যয় মনে করা যাইতে পারে। বাড়ার ভাব—বাড়াতি—বাড়তি, মরার ভাব—মরাতা—মরতা, খোলার ভাব—খোলাতা—খোলতা, ইত্যাদি শব্দের মাঝের আ লুপ্ত হইবার কারণ পাই না। গোঁআর হইতে গোঁআরি হইবার কথা। যথা, চণ্ডীদাসে, 'কে করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী।' কিন্তু গোঁআরতি এবং ভুলে গোঁআরাতমিও শোনা যায়।

৵০ পত্র অর্থে, এবং, বোধ হয়, পত্র শব্দের বিকারে তা তি (বা তী) প্রত্যয় হয়। যথা, নাম-পত্র—নামতা, রঙ্গা-পত্র—রাঙ্গাতা, চক্রাকার পত্র—চাকতি, চুণ রাখিবার পাত্রী (ছোট বাটী)—চুনাতী। তী স্থানে চী হইয়া ধূনাচী—ধূনার পাত্র (রাঢ়ে ধূনাচুর; কোষ দেখ)।

১০৮। না।

ক্ষুদ্রার্থে না প্রত্যয় হয়। যথা, পাখা—পাখনা (ছোট পাখা যেমন মাছের); ফতা—ফতনা; থোপ—থোপনা (যেমন স্বর্ণাদি অলঙ্কারের); থোপ হইতে থুপী শব্দও আছে। বাছা—বাছনি শব্দ পদ্যে পাওয়া যায়। সং ছা+বাং না=ছানা (ছোট শাবক)। সং ঝর ঝরী; কিন্তু বাঙ্গালায় ঝর বড়, ঝরণা ছোট।

১০৯। পনা।

সং পণ—ব্যবহার। ওং পণা—যেমন গুণী-পণা; হিং পণ—বালকপণ; সং পণ পণা—মনুষ্যপণ, ভলেপণা। বিদ্যাপতিতে চতুরপণ, চণ্ডীদাসে চতুরপনা, কবিকঙ্কণে ঠৈঁটাপনা। 'রাঘবের হেরি বীরপণা' (মধুসূদন)। এইরূপ—ধূর্ত-পনা, নেকা-পনা, বেহায়া-পনা, গিন্নী-পনা,

ইত্যাদি। গুণীপনা শব্দের ঈ লোপে (প্রায়ই) গুণ্‌পনা। বা°তে পনা দ্বারা প্রায়ই অনুকরণ বুঝায়। (তু° আমি)

১১০। পারা, পানা।

/০ স° প্রায় (তুল্য) শব্দের বিকারে বা° পারা, (ও° পরি)। যথা, জল-পারা—জল-প্রায়—জল-তুল্য ; চাঁদপারা—চন্দ্রপ্রায়। এইরূপ, তেল-পারা, এবং কখন কখন সরু-পারা, মোটা-পারা, কাল-পারা ইত্যাদি। চণ্ডীদাসে 'বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী-পারা।' কৃত্তিবাসে (আদ্যে), 'অন্য মুনির পারা।' কবিকঙ্কণে, 'কোন দেশে দুঃখি নাই সই মোর পারা'।

৵০ 'বোধ হয়'—এই অর্থে প্রায় স্থানে পারা (ও° পরা) হইয়াছে। যথা, কৃত্তিবাসে (লং), 'বাদ বিসম্বাদ পারা হইল কার সনে।' ভারতচন্দ্রে, 'অভাগারে একদিন না ছাড়িবে পারা।' কবিকঙ্কণে, 'তোর আমি চেড়ী বটি হেন বুঝ পারা।' উত্তর পশ্চিম রাঢ়ে এবং ওড়িয়াতে পারা (বোধ হয়) অর্থে এখনও প্রচলিত আছে। 'সে পারা আজি যাবে', 'আমি, পারা, পারি না' ?—পারা—বুঝি, অনুমান করি। ও° 'সে পরা আজি যিবে'—সে বুঝি আজি যাবে।

৶০ পারা প্রত্যয়ের রা স্থানে না হইয়া স্থান-বিশেষে পানা প্রত্যয় হইয়াছে। যেমন, চাঁদ-পানা মুখ, কুলা-পানা চক্রু। (তু° 'রাম' শব্দ, শিশু বলে 'নাম')। স° প্রতি শব্দের অপভ্রংশে (হয়ত পারে হইতে) পানে হইয়াছে। যেমন, আমার পানে তাকাও।

১১১। সা, চা।

/০ সদৃশ অর্থে সা প্রত্যয় হয়। যথা, রুপার সদৃশ—রুপসা (-সোনা) ; পানির সদৃশ—পানিসা—পাঁনসা (+ইয়া—পাঁনসিয়া) ; বাষ্পের অর্থাৎ ভাপের সদৃশ—ভাপসা। এইরূপ, ঘোপসা, ঝাপসা, ঢেপসা, চোপসা, গুমসা, ফাঁকাসা—ফেকাসা, আলিসা—আঁলসা (ছাদের উপরে আলি-সদৃশ), ইত্যাদি। ইহাদের সহিত স° ঈদৃশঃ স°-প্রা° অইসো, স° তাদৃশঃ স°-প্রা° তইসো, স° যাদৃশঃ স°প্রা° জইসো, স° কীদৃশঃ হি° কৈসা ম° কসা প্রভৃতি তুলনা করা যাইতে পারে। ফা° দেহসা—দেহ-সদৃশ। এইরূপ সা প্রত্যয়ান্ত শব্দ ফার্সীতে অনেক আছে।

৵০ সা স্থানে চা হইয়া বা° পানিসা ও° পানিচা। এইরূপ, বা° লালচা (লালসদৃশ), কালচা (কাল সদৃশ), খামচা—(স° কবল বা° খামল সদৃশ), মলিচা—মড়িচা (লৌহমল সদৃশ, লৌহমল)।

৶০ কোন কোন সংস্কৃত শব্দের শেষের ক স্থানে চা ও সা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই এই চা ও সা প্রত্যয় নহে। যথা, স° নলিকা—নলিচা (যেমন হুঁকার) ; স° মর্কটক—মাকড়সা ; স° খোলক—খোলস (কিংবা খোল সদৃশ—খোলস) ; স° কুহেলিকা—কুআসা। কিংবা স° কুহা হইতে কুআ। কিন্তু কুআ সদৃশ—কুআসা মনে করিলে অর্থ ভাল হয় না। স°

কুহেলিকা ও° কুয়ড়ি হি° কোহিরা। এই হেতু মনে হয় সং কুহেলিকা হইতে বাং কুয়াশা। সং স স্থানে দেশ ভাষায় চ, চ হইতে ক, এবং ক স্থানে র (আগম) হইবার দৃষ্টান্ত আরও আছে (কারক দেখ)।

১১২। আট, আটি।

/০ মৃত্তিকা অর্থে, এবং বোধ হয় মাটি শব্দের সংক্ষেপে আট আটি আসিয়াছে। যথা, ধোআ মাটি—ধোআট (ধোআট পড়িলে জমির তেজ বাড়ে); ধার—প্রান্তের মাটি—ধারাটি। পাট মিশ্রিত মাটি—পাটাটি—পেটোটি; এইরূপ—উলুটি, তুষটি, খড়টি কর্ম মাটির কাঁথে করা হইয়া থাকে। কর্ম অর্থ হইতে বোধ হয় সম্বন্ধীয় অর্থে ট টি প্রত্যয়। কিন্তু শব্দগুলিতে মাটি অর্থও স্পষ্ট আছে, এবং ট টি প্রত্যয় নিশ্চয় প্রথমে শব্দ ছিল।

৵০ মাটি দিয়া ভরা বা পূর্ণ—ভরাট, যেমন ভরাট জমি, পুকুর ভরাট করা। কেহ কেহ বলে মাটি-ভরাট, বালি-ভরাট, করা। তখন বোধ হয় যেন ভরিত শব্দের রূপান্তরে ভরাট। জমা + মাটি—মাটি জমিয়া পিণ্ডাকার হইলে জমাট; কিংবা জমিত হইতে জমাট (হি° জমা-বট—যেন জমাবৎ)। ধরাতি (ধরা ভাবে তি) হইতে ধরাটি। (ধরাট শব্দের মূল অজ্ঞ; ধরা-কাট শব্দের কা লোপে ধরাট।)

১১৩। আনি।

সং পানীয় হইতে পানী পানি, এবং প লোপে আনি প্রত্যয়-সরূপ হইয়াছে। যথা, চা'ল চোঁআনি—চাউল-চোঁআ পানি অর্থাৎ যে জলে চোঁআনা চাউল ভেজানা হইয়াছে। আমানি —অম্ল-পানি (কাঁজি)। ধোআ-পানি—ধোআনি। সং সুতিক্ত—সুইক্ত—সুক্ত; সুক্ত + পানি—সুক্তানি,—তিক্তরস যোগে পক্ব ব্যঞ্জন। লোকে আনি প্রত্যয়ের মূল ভুলিয়া 'জল' শব্দও যোগ করে। যেমন চা'ল-ধোআনি জল। সংতে পানীয় অর্থে রণী প্রত্যয় হয়। যথা, চিঞ্চরণী—চিঞ্চা-(তেঁতুল-) পানী।

১১৪। আই।

মানুষের নামের পরে চন্দ্র নন্দ নাথ ইত্যাদির স্থানে প্রাচীন ও নবীন বাঙ্গালায় আই হয়। যথা, (ময়নামতীর গানের) গোবিন্দচন্দ্র—গোবিন্দাই। রামচন্দ্র—রামাই, রমানাথ—রমাই, নিত্যানন্দ—নিতাই, বলরাম বা বলভদ্র—বলাই, কৃষ্ণচন্দ্র—কানাই। আই আদর-সূচক। আই প্রত্যয় বলা যাইতে পারে।

১১৫। জা, পো।

সং জা, জাত (পুত্র) হইতে ঘোষজা—ঘোষের পুত্র। মুখোর পুত্র—মুখুজা—মুখুজ্যা। সং পোত (পুত্র) হইতে পো। এই শব্দটি এখনও প্রত্যয়-সরূপ হয় নাই। কারণ পো শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে। মাকে পোয়ে, রাজার তিন পো ইত্যাদি বলা যায়। ঠাকুর-পো,

দেওর-পো শব্দের শেষে র থাকাতে ঠাকুরের পো, দেওরের পো বলা আবশ্যক হয় না। রায়ের পো—রায়বংশে জাত। (এইরূপ, ঝী। ঘোষের ঝী—ঘোষবংশে জাতা।)

১১৬। করা।

প্রতি অর্থে করা প্রত্যয় হয়। 'করিয়া' হইতে করা বোধ হয়। যেমন, শতকরা এক টাকা সুদ—টাকা শতে শতে ভাগ করিয়া এক এক ভাগ প্রতি এক টাকা সুদ।

১১৭। জাত।

সংস্কৃত জাত শব্দের অর্থ রক্ষিত, আনীত হইয়া গোলা-জাত—গোলাতে রক্ষিত, খামার-জাত—খামারে আনীত, বাক্স-জাত—বাক্সে রক্ষিত ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে।

১১৮। ভর।

ভরা—পূর্ণ—হইতে ভর দ্বারা ব্যাপ্তি বুঝায়। যেমন, জনম-ভর খাটা, কোমর-ভর জল। হিং মংতেও ভর শব্দ বহুপ্রচলিত।

১১৯। ময়।

ময় প্রত্যয় বাঙ্গালাতে কেবল ব্যাপ্ত অর্থে বসে। জলে ব্যাপ্ত—জলময়; আশ্চর্যে, জলময়। ঘরে ব্যাপ্ত—ঘরময়। এইরূপ, রাস্তাময়, পথময়, দেশময় ইত্যাদি।

১২০। হারা।

গুণিত অর্থে হারা হয়। সং হর, হার অর্থে হরণ। দোহারা—দো+হার+আ - দুই হার—ভাগ-যুক্ত। দোহারা দোড়ী—এক গাছা দোড়ী ভাগ করিয়া দুই খণ্ড একত্রে, কিংবা দুই গাছা দোড়ী একত্রে মিলানা। (এই হার শব্দ মণি-মুক্তাদির মালা নহে)। এইরূপ, তেহারা চৌহারা, একহারা। একহারা দোড়ীতে ভাগ থাকে না বটে, কিন্তু ভাগ করার ভাব থাকে। না থাকিলে একগাছা দোড়ী বলা হয়। (তুং সং কৃত্বস্ প্রত্যয়)

১২১। অন্দাজ।

ফার্সী অন্দাজ—নিক্ষেপক। ইহা হইতে তীরন্দাজ—যে তীর (শর) নিক্ষেপ করে। গোলান্দাজ—যে গোলা নিক্ষেপ করে। বরকন্দাজ—আর্বী বর্ক—বিজুলী, ফার্সী অন্দাজ; হাতের দণ্ড হয়ত বজ্র বা বিজুলীর তুল্য মনে করা হইত। বরকন্দাজ শব্দের মূল অর্থ তবে বজ্রদণ্ডধর।

১২২। ইন্দা।

ফার্সীতে ন্দা কৃৎ-প্রত্যয় যাবতীয় ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে বসে। বাঙ্গালার তদ্ধিত প্রত্যয় মধ্যে ধরা যাইতে পারে। ফা° বাস (থাক)+ইন্দা—বাসন্দা বা° বাসিন্দা (বাসকারী); ফা° গো (কহ)+ন্দা গোইন্দা বা° গোয়েন্দা; নবীস (লেখ)+ন্দা—নবীসিন্দা (লেখক)।

১২৩। খানা।

ফার্সী খানা—সং গৃহম্। বৈঠকখানা—বসিবার ঘর, কারখানা—কারু-গৃহ। এইরূপ, মাল-খানা, তোষা-খানা, মুদী-খানা, পায়-খানা, ডাক্তর-খানা ইত্যাদি।

১২৪। খোর।

ফার্সী খোর—যে খায়। ইহা হইতে গুড়ুক-খোর—যে তামুকে আসক্ত। এইরূপ, গাঁজা-খোর, মদ-খোর, নেশা-খোর, গুলী-খোর ইত্যাদি। খোর হইতে খোরাক (ফার্সীতে খাবার জিনিষ, খোর+আক্)।

১২৫। গীর, গীরি, গিরি।

ফাং গীর—যে আক্রমণ করে—সুতরাং কর্তা। এই অর্থে ফাং জাহাগীর—জাহা পৃথিবী, গীর স্বামী, ভূপতি। আলম্‌গীর—আর্বী আলম্—পৃথিবী, অতএব পৃথিবী-পতি। কুস্তী-গীর—যে কুস্তী করে।

গীর শব্দে ই (ফাং ঈ) প্রত্যয় যোগে গীরি—কর্ম বুঝায়। যথা, কেরাণী-গীরি—কেরাণীর কর্ম। এইরূপ, বাবু-গীরি, মুচী-গীরি, মুটো-গীরি। অকারান্ত (অ গ্রস্ত) শব্দের উত্তর সহজে ই বসে। যেমন ডাক্তারি, কামারি। অ ভিন্ন অন্য স্বরান্ত শব্দের উত্তর গীরি বসে। সেকরা-গীরি, ডেপুটি-গীরি। কিন্তু, মাষ্টার-গীরি, মুন্‌সফ-গীরি ভাল শোনায় না। নিন্দা-প্রকাশের সময় সেকরা-গীরি, ছুতার-গীরি, কামার-গীরি ইত্যাদি বলা যায়। নতুবা সেকরার কাজ, ছুতারের কাজ কিংবা ছুতারি, কামারের কাজ কিংবা কামারি বলা রীতি।

গীরি প্রত্যয় সং কর হইতে করি শব্দের বিকারেও আসিয়া থাকিতে পারে। সং কারি-কর হইতে কারিকরি ফাং কারিগরী। পরে ই থাকাতে প্রথম অক্ষর ক স্থানে কি আসিতে পারে। তখন কিরি হইতে গিরি মনে করা চলে, এবং গীরি না লিখিয়া গিরি লেখা অশুদ্ধ হয় না।

১২৬। চা।

ফার্সীতে অল্পার্থে চহ্ প্রত্যয় হয়। চহ্ স্থানে বাংতে চা। যেমন, বাগ-বাগচহ্—বাং বাগিচা (ছোট উদ্যান)। এইরূপ, গালিচা (তুর্কী)। ফাং খাঞ্চা ছোট খান বা পাত্র; ইহা হইতে বাং খুঞ্চী।

১২৭। চী।

ফাং চী স্বামী বা কর্তা। খাজাঞ্চী—যে খাজনা রাখে। এইরূপ, মশাল-চী—মশাল বা আলো ধরে যে। বাবরচী—হাণ্ডী-শালার কর্তা; খাতাঞ্চী—খাতা রাখে বা লেখে যে।

১২৮। তর।

/০ প্রকার অর্থে ফার্সী তরহ্ হইতে বাঙ্গালায় তর্। ফার্সীর তরহ্ শব্দের হ্‌কারের লোপচিহ্ন-স্বরূপ তর (অকারান্ত) উচ্চারিত হয়। যথা, বহুতর—বহুপ্রকার (আজিকালি কেহ

কেহ 'অনেক' অর্থে বহুতর শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন, কোষ দেখ) ; তর-বেতর—নানাপ্রকার। এমনতর, কেমনতর, যেমনতর, তেমনতর শব্দ ব্যাকরণে ভুল। কারণ এমন কেমন যেমন তেমন শব্দে মন প্রত্যয় আছে। এমন-তর—এইরূপ প্রকার (!)।

৶০ অতিশয়োক্তি হইতে গুরু অর্থে গুরুতর (সং গুরু+সং তর) শব্দ চলিয়াছে। এইরূপ, ঘোরতর।

১২৯। দান।

ফার্সী দান—সং ধান (আধার)। ক্ষুদ্রার্থে দানী ; যথা, কলম-দান, কলমদানী—কলম রাখিবার আধার। এইরূপ, নস্ত-দানী, পিক-দানী, আতর-দানী ইত্যাদি।

১৩০। দার।

ফার্সী দার বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত হইয়াছে। কর্তা, স্বামী প্রভৃতি অর্থে দার বসে। যথা, বাদ্যকর—বাজন-দার। এইরূপ, গড়ন-দার, চাখন-দার, গোলা-দার, দোকান-দার, ছড়ী-দার, ফৌজ-দার, ফাঁড়ী-দার, চৌকী-দার, সুবে-দার, চোপ-দার, হাবল-দার (হালদার), তালুক-দার, মজমা-দার (মজুমদার), ইত্যাদি। দার শব্দে যুক্ত বা বিশিষ্টও বুঝায়। যথা, চুড়ি-দার পাজামা, বুটিদার রুমাল, দানাদার ডালিম। (উমেদবার শব্দের ব লোপে বাঙ্গালায় উমেদার ; এই শব্দে ফাং বার প্রত্যয়, দার প্রত্যয় নহে।)

১৩১। নবীস।

ফার্সীতে নবীস—লেখক। নকল-নবীস—নকল-লেখক, তাঈদ-নবীস—লেখনসহিষ্ণু। চিঠী-নবীস—চিট-নবীস, মহলা-নবীস। ফার্সী নবীস শব্দের সহিত ইং নভিস শব্দ ভুল করিয়া কেহ কেহ লেখেন শিক্ষা-নবিশ, শিক্ষা-নবিশি। শিক্ষা-নবিশ শব্দটি আধুনিক। যেমন সং বাগীশ শব্দটি বিদ্যাবাগীশ তর্কবাগীশ হইতে বাস্তবাগীশ, মিথ্যাবাগীশ পর্যন্ত আসিয়াছে।

১৩২। নামা।

ফার্সী নামা—চিঠি, যাহা লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে ওকালত-নামা, রোজ-নামা, সোলে-নামা, রফা-নামা (মিলন-পত্র), ইত্যাদি।

১৩৩। পোষ।

ফার্সী পোষ প্রত্যয়-সরূপ হইয়া যাহা ঢাকে এই অর্থ প্রকাশ করে। যথা, ফাং বালা-পোষ—উপরে যাহা ঢাকে, সর-পোষ—মাথা (শীর) বা উপর যাহা ঢাকে, তক্ত-পোষ—বসিবার আধার যাহা ঢাকে, যেমন চাদর (বাংতে অন্য অর্থ)। (পোষ+আক—পরিবার জিনিষ, তুং খোরাক)।

১৩৪। বন্দ্। বন্দি।

ফার্সী বন্দ্—যে বাঁধে। এই অর্থে ঘোড়ার নাল-বন্দ্—যে নাল বাঁধে। জিল্দ-বন্দ্—যে চামড়া দিয়া বই বাঁধে (দফ্তরী)।

ফাসী বন্দ—সং বন্ধ। বাক্‌সে বন্দ—বাক্স-বন্দি (করা)। এইরূপ, চিঠা-বন্দি, জমা বন্দি।

১৩৫। বাজ।

ফার্সী বাজ—যে খেলে। ইহা হইতে বাজ অর্থে দক্ষ, আসক্ত হইয়াছে। মকদ্দমা-বাজ—যে মকদ্দমায় আসক্ত বা দক্ষ। গলা-বাজ—যে উচ্চ গলা—স্বর—করিয়া কথা কহিতে দক্ষ; ইহার কর্ম গলা-বাজি। দোড়ী-বাজ (অপভ্রংশে দড়ী-বাজ)—যে দোড়ীতে বাজি করিতে দক্ষ; ইহা হইতে ধূর্তশিরোমণি। জাং বাজ—যে জান—জীবন লইয়া খেলে, জীবনকে যে তুচ্ছ করে। ফেরেব-বাজি—বঞ্চনা।

১৩৬। সই।

/০ সং সহিত হইতে সই হইয়া ঠাকুর-প্রতিমা জল-সই—জলসহিত—করা। সং জলসাৎ হইতে জলসই না হইতে পারে।

√০ আর্বী সহী—শুদ্ধ (ঠিক) হইতে সই আসিয়া মানান-সই—মানান-শুদ্ধ, প্রমাণ-সই—প্রমাণ-শুদ্ধ। এইরূপ, মাপ-সই, টেক-সই, সই-সই (মাথায়-মাথায়; তুং ভরপুর)।

১৩৭। স্তান, স্থান।

ফার্সী স্তান=সং স্থান। এই দুই শব্দের এত সাদৃশ্য যে একের পরিবর্তে অন্য বসিতেছে। হিন্দুস্থান বাস্তবিক হিন্দুস্তান (হিন্দু শব্দ সংস্কৃত নহে)। এইরূপ আফগান-স্তান, গোর-স্থান, কবর-স্তান, পীর-স্তান। পীরের আস্তান—সং আস্থান। (তুং গুলেস্তান=ফুলের স্থান অর্থাৎ উদ্যান)।

১৩৮। ধ্বন্যাদি অর্থে প্রত্যয়।

/০ সং-প্রাকৃতে শব্দের উত্তর স্বার্থে অম্ প্রত্যয় হইত। যেমন, পক্ষ+অম্—পাখম (ময়ূরের পক্ষ)। তেমনই বাঙ্গালায় সং খোল+অম্—খোলাম্ (যেমন খোলাম্ ভাঙ্গা, খোলাম্-কুচি); সং ফুল+অম্—ফুলম্ (-পোড়,-তেল); ভর+অম্—ভরম্ (যেমন ভরম্-ভর করা); জল+অম্—জলম্ (যেমন জলম্ময়)। কড়া হইতে কড়াম্; কড়াম্+ইয়া=কড়া-মিয়া—কড়ানিয়া (ম স্থানে ন)।

√০ এক সংখ্যার সহিত অন্য সংখ্যার গুণ করিতে দশের ঊর্ধ্ব সংখ্যার উত্তর ম্ ং হয়। যথা, তিন-এগারম্=তেত্রিশ, পাঁচ-কুড়িং=শ, পাঁচ-আঠাইশং=এক শ চল্লিশ, ইত্যাদি। (কিন্তু, তিন-দুগুণে=ছয়, তিন-ত্রিকুকে=নয়; পাঁচ-সাতে (সাত্তে—অর্থাৎ সপ্তে)=পঁয়ত্রিশ; তিন আটে (প্রায়ই আষ্টে—আট্‌টে)=চোব্বিশ, ইত্যাদি)। এগারম্, বারম্,… শতম্ ইত্যাদির ম্ সংস্কৃতের শেষ চিহ্ন-সরূপ রহিয়া গিয়াছে। পাঠশালায় যেখানে 'সিদ্ধি রস্তু,' বলিয়া পাঠ আরম্ভ হয়, সেখানে সংস্কৃত ভাষার চিহ্ন থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু, বোধ হয়

কিছুদিন পরে নামতা-আবৃত্তির সময় সংখ্যা-বাচক শব্দের শেষ বর্ণের দ্বিত্ব কিংবা শেষের ম্ যোগ থাকিবে না।

৶৹ ধ্বনি অর্থে আম্ ইম্ আং ইং হয়। যেমন, কুমীর জলে চবাম্ করিয়া লাফাইয়া পড়ে; মানুষটা দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেল, সপাং সপাং, পটাং পটাং করিয়া বেত মারিল, ইত্যাদি। আম্ আং যোগে স্থূলতা, ইম্ ইং যোগে ক্ষীণতা বুঝায়। সেতারের টান তারে আঙ্গুলের আঘাত করিলে পিড়িং-পিড়িং শব্দ হয়। (শিথিল দ্রব্যে আঘাত করিলে আং ইং শব্দ করে না; আশ্ উশ্ করে।)

।৹ সং রব হইতে র, এবং উচ্চারণ-সৌকর্যে অর। কচর-কচর—কচ্-কচ রব, কিচির মিচির—কিচি-মিচি রব, গজর গজর—গজ্-গজ রব ইত্যাদি। যে সকল দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দের অর্থে রব বা ধ্বনি বুঝাইতে পারে, সে সকল শব্দে অর যুক্ত হইলে কর্মের স্থিতিকাল বৃদ্ধি করে। কচ্-কচ করিয়া কাটা—শীঘ্র, কচর্-কচর করিয়া কাটা—মন্দগতি, সুতরাং দীর্ঘকালস্থায়ী।

।/৹ ত্বরা কিংবা ত্বরা করিয়া ওঠা—তড়াক্ করিয়া ওঠা। করিয়া, করা শব্দের ক যেন যুক্ত হইয়া তড়াক্। এইরূপ, গাঁ গাঁ (ধ্বনি) করা—গাঁক্-গাঁক করা। সড়াক্ করিয়া পলায়ন, পটাক্ করিয়া ছেঁড়া ইত্যাদির আক্ (বা ক) দ্বারা ধ্বনি বুঝায়।

।৵৹ ধ্বনি অর্থে আৎ প্রত্যয় হয়। গপাৎ করিয়া গেলা, ঝপাৎ বা ধপাৎ করিয়া পড়া, থপাৎ করিয়া বসা, পড়াৎ করিয়া ছেঁড়া, ইত্যাদি। আৎ স্থানে উৎ যোগে হ্রস্ব বুঝায়। পটাৎ, পড়াৎ—পুটুৎ, পুড়ুৎ। কট্—কুটুৎ করিয়া কামড়ানা, সুড়—সুড়ুৎ করিয়া পালায়ন, ঘট—ঘুটুৎ করিয়া গেলা ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে।

।৶৹ ধ্বনি অর্থে আশ্ হয়। ধপাশ্, ধড়াশ্ করিয়া পড়াতে ধপ, ধড়-শব্দ শোনা যায়। হয়ত শব্দ—এই শব্দের শ হইতে আশ্। স্থূল দ্রব্যের—স্তূপের পতনে ধপাশ্, উপবেশনে থপাশ্। এইরূপ, কটাশ পটাশ মটাশ ঠাশ ইত্যাদি। আ যোগে বিস্তার, উ যোগে ক্ষুদ্রতা বুঝায়। স্থূল বিস্তৃত দ্রব্যের পতনে ধপাশ, স্থূল ক্ষুদ্র দ্রব্যের পতনে ধুপুশ। এইরূপ, কটাশ কুটুশ, ঢকাশ ঢুকুশ, হাপশ হুপুশ ইত্যাদি।

১৩৯। সর্বনাম শব্দের উত্তর প্রত্যয়।

কয়েকটি সর্বনাম শব্দের উত্তর এবং সংস্কৃত শব্দের বিকারে খন খান ত থা বে মত মন প্রত্যয় হইয়াছে।

/৹ খন। সং ক্ষণ শব্দ হইতে সময় অর্থে খন হয়। যথা, এইক্ষণ—এখন। এইরূপ তখন, যখন, কখন। (তখন যখন বাস্তবিক তেখন, যেখন ছিল। অধুনা, তখন যখন সাধুভাষায় চলিয়াছে।)

৶৹ খান। সং স্থান শব্দ হইতে, এবং স্থান অর্থে খান হয়। যথা, এই স্থান—এখান। এইরূপ, সেখান, যেখান। কিন্তু, কোন খান।

৶০ ত। পরিমাণ অর্থে এবং সংস্কৃত শব্দের রূপান্তরে ত হয়। যথা, কত, তত, যত, এত।

।০ থা। স্থান অর্থে এবং সং ত প্রত্যয়ের বিকারে থা হয়। যথা, কোথা, এথা বা হেথা, যেথা, সেথা।

।/০ বে। কাল-নির্দেশ অর্থে এবং সং দা প্রত্যয়ের বিকারে বে প্রত্যয় হয়। যথা, কবে, যবে, তবে, এবে।

।৵০ মত, মতি, মন। এই সদৃশ—এমত, এমতি, এমন ; কি সদৃশ—কেমত, কেমতি, কেমন ; যে সদৃশ—যেমত, যেমতি, যেমন ; তে (সে) সদৃশ—তেমত, তেমতি, তেমন। প্রাচীন বাঙ্গালায় এবং আধুনিক কবিতায় এমতি যেমতি তেমতি পাওয়া যায়।

মন, মতি, মত প্রত্যয় সং বৎ (তুল্যার্থে ;=ফা° বন্) এবং বন্ত্ প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে। (বেদে নাকি মাবন্ত—আমার মত, ত্বাবন্ত্—তোর মত, ঈবন্ত্—এমন, কীবন্ত—কেমন, নীলবন্ত্—নীলের মতন, ইত্যাদি আছে)। বা° এমন কেমন=ও° এমন্ত কেমন্ত। শূন্যপুরাণে, 'এমন্ত ধর্ম্মর বরত ন করিব হেলা।' 'এমত ধর্ম্মর বরত অবহেলে জেহি জন।' মন্ত প্রত্যয়ের ন লোপে, এমত, যেমত ; ত লোপে, এমন যেমন। প্রাকৃত-ওড়িয়াতে এমিতি যিমিতি কিমিতি। এই মন্ত প্রত্যয় হইতে (ইহার) মত, ন বিপ্রকর্ষে মতন। বিশিষ্ট অর্থে সং বৎ প্রত্যয় স্থানেও বাংতে মন্ত হয় (১০১ সূঃ)। বোধ হয়, যেন (প্রাচীন জন্থু) শব্দও যেমন্ত—যেমন—যেন (তু° আসা° যেনে=বা° যেমন, আসা° তেন=বা° তেমন)। মত (তুল্য) ও যেন শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ লক্ষ্য করিলেও অনুমান হয় ত ন কোন সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অবশিষ্ট। হেন—সেমন্ত (বা তেমন্ত)—সেন—হেন। স স্থানে হ নূতন নহে (সূঃ)। তু° ও° সে-পরি—সে-প্রায়=তার তুল্য (সং তদ্বৎ)। যেমন শুনিল তেমন গেল, যেমনি শুনিল তেমনি গেল,—যেমন তেমন যেমনি তেমনি শব্দের মন সং যস্মিন্ তস্মিন্ (কালে) হইতে আসিয়াছে। সুতরাং উৎপত্তি ও অর্থ ভিন্ন।

১৪০। সংখ্যা-পূরণার্থে প্রত্যয়।

/০ মেয়েটি বার বছরে পড়িয়াছে, তিন দিনের দিন আসিয়াছে, ইত্যাদি প্রয়োগ স্মরণ করিলে জানা যায় বাঙ্গালা ভাষায় কালসংখ্যা পূরণ-বাচক সামান্য প্রত্যয় নাই। সাতের ঘরে (সপ্তম গৃহে), তিনের দিনে (তৃতীয় দিনে) ইত্যাদি হইতে জানা যায় সংখ্যা-বাচক শব্দে এর যোগ করিলে পূরণ-বাচক শব্দ হয়। এই এর সম্বন্ধ-পদের এর।

৶০ মাসের দিন বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ই এ হয়। আজ মাসের ক দিন—আজ ক-অই (রাঢ়ে অই)ঁ ; আজ পাঁচই, দশই, বারই অর্থাৎ আজ পাঁচদিন, দশদিন, বারদিন। এইরূপ আঠারই পর্য্যন্ত। ইহার পর এ ; যথা, উনিশে বিশে ইত্যাদি। এখানে ই বা ই পরিবর্ত্তে এ।

৶০ ওড়িয়াতে আজি পাঁচ-দিন, ছ-দিন। হিন্দীতে পাঁচবাঁ, ছঠবাঁ ; মরাঠীতেও পাঁচবা,

সহারা, ইত্যাদি পঞ্চম ষষ্ঠ অর্থ প্রকাশ করে। রাঁ রা প্রত্যয় বা° ইয়া উয়া স্থানীয়। অতএব বোধ হয় বা° ইঁ বা ই এবং এ সম্বন্ধীয়-অর্থে ই (ঈ) এবং ইয়া প্রত্যয়। স° পঞ্চমী হইতে পাচমী—পাঁচঈঁ—পাঁচ ই। এইরূপ, ষষ্ঠী—ছঅই—ছয়-ই, সপ্তমী—সাতই, ইত্যাদি। মী হইতে ই আসিয়া সংস্কৃতে যে শব্দে মী নাই, তাহাতেও রাঢ়ে ইঁ বসিয়াছে; যথা, একাদশী—এগারই, দ্বাদশী—বারই, ইত্যাদি। স্মরণ রাখিতে হইবে পূর্বকালে বঙ্গদেশেও তিথি দ্বারা দিন গণিত হইত। দিন শব্দের সংক্ষেপে রাঢ়ের ইঁ আসাও অসম্ভব নহে। আজ বিশে অর্থাৎ বিশিয়া—বিশ্যে—বিশে অর্থাৎ বিংশ-পূরক দিন। এই তিন প্রকার উৎপত্তির কোন্‌টা ঠিক, তাহা বলা দুষ্কর।

।০ অন্য শব্দ দেখা যাউক। চালিশ বর্ষ বয়সে প্রায় ঘটিয়া থাকে বলিয়া চালিশিয়া চালিশ্যা—চালশ্যে; ষাটি দিনে পাকে বলিয়া ষাটিয়া—ষাট্যা—ষেট্যে (স° ষষ্টিক ধান্য-বিশেষ); বাহাত্তর (বা বাআত্তর) বছর বয়সে মানুষের নাকি বুদ্ধিনাশ হয়, এই হেতু বাহাত্তরিয়া—বাহাত্তুরে (বাআত্তুরে)।

।/০ অপর দিকে শিশুজন্মের পঞ্চমরাত্রে কর্তব্য—পাঁচটী; ষষ্ঠরাত্রে কর্তব্য ষেটেরা (ষটরা ?); নবম রাত্রে কর্তব্য—নকৃতা বা নত্তা। কর্তব্য দিনে নহে, রাত্রে। এই হেতু ষটরা, অপভ্রংশে ষেটেরা; নব নক্ত (স°, রাত্রি) হইতে ন-নকৃতা—নকৃতা—নত্তা। এই সকল শব্দে রাত্রি কিংবা রাত্রিবাচক শব্দের চিহ্ন পাইতেছি। অষ্টম রাত্রে কর্তব্য আটকিয়া—আটক্যে। এইদিনে আট রকম কলাই লাগে বলিয়া আট-কলাইয়া—আট-কলায়ে। আটকিয়া—আট শব্দে কা+ইয়া মনে করা যাইতে পারে। (তু° পণকিয়া, শেরকিয়া)।

।৵০ পহলা দোসরা তেসরা চৌঠা—অন্য তিন ভাষাতেও প্রায় এই এই রূপ। হিন্দী ও মরাঠী-ভাষী তিথি গণনা করেন। তাঁহারা সংস্কৃত প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী শব্দের রূপান্তরে অন্য শব্দ প্রয়োগ করেন। পহলা দোসরা তেসরা চৌঠা—তাঁহাদের নিকট সাধারণ পূরণবাচক শব্দ। বাঙ্গালাতে প্রায়ই দিন-সংখ্যাবাচক। কদাচিৎ সামান্য সংখ্যাপূরণবাচকও বটে। * স° চতুর্থ হইতে চউঠা—চৌঠা।

।৶০ কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শব্দ স্থানে পহেলা বা পহিলা, দোসরা বা দুসরা, তেসরা বা তীসরা শব্দ কি ক্রমে আসিয়াছে? স° প্রথম হইতে স°-প্রাকৃতে পঢম, পঢুম †; স° দ্বিতীয়—স°-প্রা° দুতিয়ো, দুইঅ; স° তৃতীয়—স°-প্রা° ততিয়ো, তইঅ। সুতরাং স° প্রাকৃত হইতে পহলা দোসরা তেসরা শব্দ আসে নাই।

॥০ সংস্কৃতে এক শব্দ হইতে প্রথম নহে। প্রথম হয়ত প্র-তম (তু° আদি-ম)। অতএব প্রথম শব্দের প্র উপসর্গটাই প্রধান হইয়াছে। প্র—বিকারে পর; র লোপে পহ; পহ+লা

* পহলা নম্বর, দুসরা আদমী, তিসরা ঘর ইত্যাদি প্রয়োগ হিন্দী। কিন্তু বা°তেও বলা যায়, দুস্‌রা কথা, দুসরার কাজ।

† ও°-তে পড় অঁ।—অর্থাৎ প্রথম শব্দের বিকারে উৎপন্ন শব্দ চলিত আছে।

=পহলা। এই রূপ, দু শব্দ হইতে দুহ-রা, তি—তিহরা। হ স্থানে স হইয়া দুসরা, তিসরা। বলা বাহুল্য লা ও রা একই। এই রা, রাত্রি শব্দের রা কি স্বার্থে রা প্রত্যয়, তাহা অনুমান করা সহজ নহে।

॥/০ বাঙ্গালাতে পহলা দোসরা তেসরা চৌঠা; কিন্তু পরে পাঁচই, ছয়ই ইত্যাদি, শেষে উনিশে, বিশে ইত্যাদি। সংস্কৃতেও এক-স্থানীয়—প্রথম, দ্ব হইতে দ্বি-তীয়, ত্রি হইতে তৃ-তীয়। কিন্তু, চতুর্ হইতে চতু-র্থ, ষষ্ হইতে ষষ্-থ। ইহার পরে ম; যথা, পঞ্চম…দশম। একাদশ হইতে আর গোল নাই। একেবারে নাই, এমন নহে। বিংশ এবং বিংশতি-তম দুই-ই বলা চলে। এই তম আবার প্র-থম শব্দে পাই।*

১৪১। স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়।

এখানে পতি-পত্নী কিংবা পুং-স্ত্রী বিবেচনা না করিয়া পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ দেখা যাইতেছে।

/০ আকারন্ত দুই ব্যঞ্জনজাত অবয়ব ধর্ম মনুষ্য ও সম্পর্ক বাচক শব্দের উত্তর ঈ হয়, এবং ঈ হইলে শেষের আ লুপ্ত হয়। যথা, খেঁদা—খেঁদী, গেঁড়া—গেঁড়ী, বুড়া—বুড়ী, ছোঁড়া—ছোঁড়ী—ছুঁড়ী; নেড়া—নেড়ী, নেকা—নেকী, বাঁঝা—বাঁঝী, বেটা—বেটী, মামা—মামী, শ্যালা—শ্যালী, পিসা—পিসী, ইত্যাদি। (যাত্রা-) আলা—(যাত্রা-) আলী, (পোড়ার) মুখা—(পোড়ার) মুখী। দাদা—দাদী না হইয়া দিদী। মাসী শব্দের পুংলিঙ্গে মেসো। এই রূপ পূর্বে ছিল না। মাণিকে পাই, 'মাস্যার কল্পনা নয় মামার মন্ত্রণা', 'মেস্যার আনন্দ দেখে'। তু° হি° মৌসা। বাঙ্গালা মাসী শব্দ হইতে মাসা হইবার কথা। তাই মাণিকে মাস্যা। মাণিকের সময়ে মা স্থানে মে হইতেছিল। তাই অন্যরূপ, মেস্যা। এখন মেসা, উচ্চারণ-নিয়মে মেসো হইয়াছে। জেঠা—জেঠাই (রাঢ়ে), কোন কোন স্থানে জেঠী। শাহজাদা—শাহজাদী। বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বাঈ, বাই, বোধ হয়।

॥/০ তিন ব্যঞ্জন জাত শব্দের মধ্য ব্যঞ্জন হলন্ত উচ্চারিত হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা, পাগ্‌লা—পাগ্‌লী, ভাগ্‌নো—ভাগ্‌নী, ছোকরা—ছোকরী—ছুক্‌রী। মধ্য ব্যঞ্জন হলন্ত উচ্চারিত না হইলেও কোন কোন শব্দে ঈ হয়। যথা, শ্বশুর—শাশুড়ী; বহিন—ব’ন শব্দের পুংলিঙ্গে বনাই (পতি শব্দ স্থানে অই; রাঢ়ে ভগ্নীপতি), ননদ—ননদাই (ননদ-পতি)। ননদ শব্দের অন্যরূপ ননদী, (পদ্যে) ননদিনী।

৶০ জাতিবাচক শব্দের উত্তর নী ইনী আনী হয়। যথা, কুমর—কুমরনী, ডোম—

---

* সং দ্বিতীয়া তৃতীয়া গ্রাম্য উচ্চারণে দুতীয়া তিতীয়া। তী লুপ্ত হইলে দুইয়া তিইয়া বা দুয়া তিয়া। কখনও দুয়া তিয়া ছিল কি না, বলিতে পারিনা। কিন্তু অসম্ভব নহে। দুয়া—দুয়আ, তিয়া—তিয়আ. ক্রমে দুঅআ, তিঅআ; হ ও র আগম হইয়া দুহরা, তিহরা; হ স্থানে স হইয়া দুসরা তিসরা। তু° চৌ—রাশী (৮৪), সত্তরি (৭০) ইত্যাদি। পুঃ দেখ।

ডোমনী, মুচি—মুচিনী, নাপিত—নাপিতিনী নাপ্‌তিনি, বেস্তা—বেস্তানী (কবিকঃ), ব্যাধ—ব্যাধিনী, কোচ—কোচনী—কুচনী, বণিক—বণিকিনী (চণ্ডীদাস), পাগল—পাগলিনী, চোর—চোরনী, ধোবা—ধোবানী, সেকরা—সেকরানী, মোগল—মোগলনী, মুসলমান—মুসলমাননী। এই নিয়মে শিখ—শিখিনী—শিখ্‌নী, মগ—মগিনী—মগ্‌নী বলিতে ভাষার নিষেধ নাই। তু° সাঁওতাল—সাঁওতালনী, ধাঁগড়—ধাঁগড়নী। আসামীতে কোন কোন শব্দে অনী বসে। যথা, ভঁরালী (ভাণ্ডারী)—ভঁরালী-অনী। ওড়িয়া ভাষায় মহান্তি—মহান্তি-আণী; বাঙ্গালায় মহান্তিনী হইত। বালঙ্গাতেও আনী আছে। যথা, চাকর—চাকরানী, ঠাকুর—ঠাকুরানী সংক্ষেপে ঠাকরণ, চৌধুরী—চৌধুরী-আনী—চৌধুরানী, মেথর—মেথরানী। বেহাই—বেহাইনী সংক্ষেপে বেহাইন, নাতি—নাতিনী—নাতনী বা নাতিন, মিতা—মিতিনী মিতিন, ভূত বা প্রেত—পেতিনী—পেত্‌নী। সং ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী হইতে বামন—বামনী, বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী হইতে বৈষ্টম—বৈষ্টমী আসিয়াছে। শূন্যপুরাণে ঋষিপত্নী অর্থে ঋষ্যানী, যেন ঋষি+আনী। পত্নী শব্দের সংক্ষেপে আনী, অনী, ইনী, নী আসিয়া থাকিবে।

।০ পশুপক্ষ্যাদি প্রাণী-বাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ ইনী হয়। যথা, হাঁস—হাঁসী, পায়রা—পায়রী, ঘোড়া—ঘোড়ী—ঘুড়ী, ছাগল—ছাগলী, পাঁঠা—পাঁঠী, শিয়াল—শিয়ালী, বিড়াল—বিড়ালী, ভেড়া—ভেড়ী। কৃত্তিবাসে (আদ্যে), ঘুঘু—ঘুঘুরী। ভারতচন্দ্রে, 'ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন। সারসা সারসী গড়ে বকবকীগণ॥ তিত্তিরী তিত্তিরা পাণিকাক পাণিকাকী। কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী॥' কতকগুলি শব্দে ইনী হয়। বোধ হয় পরে নী থাকে বলিয়া পূর্ব স্বর ই হইয়াছে। যথা, বাঘ—বাঘিনী (আসা° বাঘিনী, ও° বাঘুনী, হি° বাঘনী, ম° বাঘীণ)। সিংহ—সিংহিনী, হাথী—হাথিনী, গৃধ্র—গৃধিনী, সাপ—সাপিনী, হংস—হংসিনী (আসা°-তে হাঁস—হাঁসিনী)। অধিকাংশ প্রাণীবাচক নাম উভয়লিঙ্গ। প্রাণী-জাতিবাচক নামে পুং স্ত্রী উভয় বুঝায়। পুংস্ত্রী ভেদ করিতে হইলে নামের পূর্বে অন্য শব্দ যোগ করিতে হয়। যথা, এঁড়ো-গোরু—গাই-গোরু, এঁড়ো-বাছুর—বকনা-বাছুর। কখন কখন বকন—বকনা শোনা যায়। গাই শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। এইহেতু গাই-মহিষ বলা যায়। ওড়িয়াতে গাই-বাছুরী। কুকুর বা কোত্তা—কুত্তী বা কুত্তী-কুকুর, ছানা—মাদী-ছানা, শিআল—মাদী-শিআল, বোকা-ছাগল—পাঁঠী-ছাগল, বোকা-পাঁঠা—ধাড়ী-ছাগল। পক্ষী-বাচক শব্দের পুংস্ত্রী ভেদ করিতে হইলে নর মাদী বসে। যথা, নর-ময়না—মাদী-ময়না। সংস্কৃতে শুক—শুকী। সং সারী সারিকা স্ত্রীলিঙ্গ। বাঙ্গালায় সারু—সারী (অনেক স্থানে সারীকে সালিক-পাখী বলে)। সংস্কৃতে 'শুক-সারিকা-প্রলাপ' (শুক ও সারীকে বুলি শেখান)—কলার মধ্যে গণ্য হইত। শুক ও সারী ভিন্ন জাতি। আশ্চর্যের কথা বাঙ্গালী কবি শুকের সঙ্গে সারীর বিবাহ দিয়া থাকেন, যেন শুকের স্ত্রীলিঙ্গে সারী! যথা, চণ্ডীদাসে, 'নিশিযোগে শুকসারী যেই কথা কয়।' কৃত্তিবাসে (আদ্যে), 'সারি সুয়া কাছে'। (শুক ও°-তে সুআ)। কাব্যে ভারতচন্দ্র হইতে গোবিন্দ-অধিকারী শুক-সারী-সংবাদে শুকের স্ত্রীলিঙ্গে সারী করিয়াছেন। নতুবা শুক ও সারীর বিবাহ অসম্ভব।

।/০ কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে শব্দান্তর আবশ্যক হয়। যথা, বাবা—মা ; ঠাকুরদাদা—ঠাকুরমা, ঠাকরণদিদী ; ভাই—ভগিনী, বোন, ভাইজ, ভাই-বউ (গ্রাম্য ভাত্রবধু, ভাদরবউ) ; কর্ত্তা—গিন্নী ; বড়বাবু—বড়গিন্নী ; নাতি—নাতি-বউ, নাতিনী ; ছেলে—মেয়ে ; বেটাছেলে মেয়েছেলে ; পুরুষ-মানুষ—মেয়ে-মানুষ ; পুরুষ—প্রকৃতি, মেয়ে, স্ত্রী ; বর—কন্যা (উ° কন্তে) ; মিনসা (উ° মিনসে)—মাগী ; ভাতার—মোগ (মাইগ—অর্থাৎ মাগী, প্রাচীন বাঙ্গালার মাগু) ; জামাই—মেয়ে ; মদ্দ—মেয়ে ; সাহেব—মেম, বিবী ; নবাব—বেগম ; পো—ঝী ; ছেলে—ঝী ; শালা—শালাজ, শালী ; দেঅর, ভাশুর—জা ; চাকর—ঝী, দাসী ; রসুয়ে - রাঁধনী, রাঁধী (রসুয়ে-বামুন - রাঁধনী-বামনী ; বাঁধনী-বামুন বলিলে রাঁধনী-স্বরূপ বামুন বুঝায় ; এইহেতু অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। ও°-তে রাঁধনিআ পুং, রাঁধুনী স্ত্রীং। আসা°-তে রাঁধনি-বামুণ—রাঁধনী-বামুণী। অর্থাৎ ই ঈ বর্ণযোগে পুং স্ত্রী প্রভেদ।)

।৵০ কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, ধাই, আই বা আয়ী, সই, বউ, বউড়ী, ঝিঅড়ী, বড়কী, মেজকী, সেজকী, ছোটকী, বাঁদী, রাঁড়ী (রাঁড়ী—বিধবা, রাঁড়—উপপত্নী)। সতীন-মা সৎ-মা সতাই বা সতা, পাট-করনী, ঘুঁটে-কুড়ানী, দারা (স° দার), অবীরা (স°), ইত্যাদি। মেছোনী শব্দও নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। উহার পুংলিঙ্গে মাছুয়া বা মেছো সম্প্রতি অপ্রচলিত।

।৶০ বউ ঝী মেয়ে শব্দযোগে মনুষ্য-জাতি-বাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হয়। সেইরূপ, পো ও জা যোগে পুংলিঙ্গ হয়। যথা, ঘোষজা—ঘোষের বউ, দত্তের পো—দত্তের ঝী। কবিকঙ্কণে, 'শুন গো ব্যাধের ঝি তোমারে বুঝাব কি।' 'আইসহ দত্তের পো বৈসহ কম্বলে।' আদরে এইরূপ, জেল্যে-বউ, ডোমের মেয়ে, বামুন-বউ, ইত্যাদি।

॥০ বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গে ঈ দেওয়াই নিয়ম। গ্রাম্য লেখক ঈ দিয়া থাকেন। প্রাচীন বাঙ্গালায় ঈ পাই, ই পাই না। যথা, কবিকঙ্কণে, 'মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী। কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়া রন্ধনী॥' এইরূপ, নাগরী, রূপসী, * পাপিষ্ঠী (কৃত্তিবাসে), বাউলী, সর্বনাশী, এলোকেশী। বিশেষতঃ, ইনী দিয়া মানিনী বিনোদিনী অভাগিনী কলঙ্কিনী কুটুম্বিনী মাতঙ্গিনী শ্যামাঙ্গিনী ভুজঙ্গিনী হেমাঙ্গিনী সুকেশিনী উন্মাদিনী প্রভৃতি শব্দের শেষে ঈ লেখা নিয়ম। কবি-মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার এই রীতি পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদবধ-কাব্যে গোপিনী ভুজঙ্গিনী সুকেশিনী প্রভৃতি সমুদয় স্ত্রীলিঙ্গপদ ইনী যোগে নিষ্পন্ন। 'অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী'। 'নাহি কাজ, প্রিয়তম! সীতায় উদ্ধারি—অভাগিনী।' (নীল-)বরণী ঘরণী কাটনী রান্নী দিঅনী ধুঅনী ইত্যাদি শব্দে ঈ না দিয়া উপায় নাই। কবিকঙ্কণে 'রত্নমালা এই কন্যা ইন্দ্রের নাচনী।' নাচনী—নর্ত্তকী, নাচনি—নৃত্য, এই প্রভেদও উপেক্ষার বিষয় নহে। কয়েকটি শব্দে ই লেখা বহুকাল হইতে প্রচলিত

* মেঘনাদবধকাব্যে, রূপস পুংলিঙ্গ শব্দও আছে। যথা, 'রূপস পুরুষ দল আর এক পাশে, বাহিরিল হুহুঙ্কারি'। কিন্তু রূপস শব্দ শুনি না।

আছে। যথা, সই। সঈ না হইয়া কেন সই হইল, তাহা বলা দুষ্কর। কারণ উচ্চারণ সঈ। এইরূপ, বউ না হইয়া বউ। হয়ত সংস্কৃত নিয়মে সম্বোধনে সই বউ করিতে করিতে ই উ স্থায়ী হইয়াছে। আঈ বা আয়ী (সং আর্য আর্যিকা), ধাঈ (সং ধাত্রী) শব্দও দেখাদেখি আই ধাই হইয়াছে। উচ্চারণে আঈ অপেক্ষা আয়ী ঠিক। বোধ হয়, নিয়মটা এই। যে সকল শব্দের শেষের ঈ ব্যঞ্জনে যুক্ত না থাকে, সে সকলে ই; ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে ঈ। এই নিয়ম তদ্ধিত ঈ প্রত্যয়েও পাওয়া গিয়াছে (যথা, বেনারসী কিন্তু, ঢাকাই)। তথাপি দেঈ (দেবী), বাঈ, ধাঈ ইত্যাদি লিখিয়া ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী ভাষার সহিত সাদৃশ্য রাখিতে পারিলে ভাল হইত।

১৪২। গ্রামাদি-বাচক শব্দ ও প্রত্যয়।

গ্রাম, নগর, পুর প্রভৃতি স্পষ্টার্থ সংস্কৃত শব্দ অনেক গ্রামের ও নগরের নামের অঙ্গ হইয়াছে। লোকে এই সকল শব্দের অর্থ বিস্মৃত হইয়া আবার গ্রাম, নগর লেখে। যথা বিপ্রপুর গ্রাম, নন্দী-গ্রাম গ্রাম, চট্টগ্রাম নগর। এখানে প্রত্যয় ব্যতীত গ্রামাদি-বাচক শব্দও একত্র করা যাইতেছে।

/০ আ, ইয়া, উয়া প্রত্যয় সম্বন্ধীয় অর্থে বসে। এই অর্থ লইয়া গ্রামবাচক হইয়াছে। যথা, মকর হইতে মগরা, কালীনদী হইতে কালীয়া, বক হইতে বগুয়া।

৵০ আই প্রত্যয় মানুষের নামে বসে। মানুষের নামানুসারে গ্রামের নামেও আই আসিয়াছে। যথা, ক্ষীরাই, জনাই।

৶০ সং আলি হইতে আইল। যথা, নড়ার (খড়ের) আলি—নড়াইল, সীমা-আলি—সীমাল—সিমলা।

।০ সং পাটক হইতে পাড়া, এবং প লোপে আড়া। সং আলি শব্দের ল স্থানে ড় হইয়া আড়ি। বোধ হয়, কোন কোন স্থলে সং বাটি শব্দ হইতেও আড়ি আসিয়াছে। যথা, পঞ্চ-পাটক—পাঁচড়া; গোপ-বাড়ী—গোয়াড়ী; কেঅট-পাড়া—কেঅটাড়া।

।/০ ঈশ্বর নাম প্রায়ই মহাদেবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, ভুবনেশ্বর, জলেশ্বর, বালেশ্বর। এই মহাদেবের নামে গ্রাম প্রসিদ্ধ হয়।

।৵০ আবাদ ফার্সী; সং আবাস। বাঙ্গালাতে আবাদ প্রায়ই নূতন স্থাপিত গ্রাম। যথা, মুর্শীদ-আবাদ, দৌলৎ-আবাদ। আবাদ অর্থে সৌভাগ্যশালী আছে। এই অর্থে জাহান্-আবাদ—(জাহান্ = পৃথিবী) সৌভাগ্যশালী বা সুখময় স্থান।

।৶০ সং বন শব্দ হইতে অন আসিয়া পলাশ-বন—পলাশন, মন্দার-বন—মান্দারণ হইয়াছে।

॥০ সং স্কন্ধ (শাখা) হইতে কান্দি—ভূমিখণ্ডের শাখা বা পার্শ্ববর্তী স্থান। যথা, দাউদ-কান্দি, বোধ হয় দাউদ নামের লোকের ভূমিখণ্ড।

।৶০ সং কুণ্ড—দেব-জলাশয়। বীরভূম ও চট্টগ্রামে অনেক কুণ্ড আছে, এবং কুণ্ডের নামে গ্রামের নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যথা, সীতা-কুণ্ড।

।৵০ সং কূল—নদ্যাদির তীরভূমি। যথা, খানা-কূল—(খানা=)কানা নদীর কূল। সং কূল—স্তূপ অর্থে কূড় হইয়াছে। যথা, পাংশুকূল—পাঁশকূল—পাঁশকূড়; বালিকূড়—বেলে-কূড়—বেলুড়।

।৶৵০ কোণ ও পার্শ্ব অনুসারে নাম। যথা, চন্দ্রকোণা—বোধ হয় পূর্বকালে চন্দ্রের শৃঙ্গের আকারে কোণ ছিল। নেত্রকোণা—নেত্রের আকারের। বনপার্শ্ব হইতে বনপাশ, ইন্দ্রপার্শ্ব হইতে ইন্দাশ।

৸০ সং খণ্ড—অংশ। যথা, শ্রী-খণ্ড, সাত-খণ্ড ইত্যাদি।

৸/০ সং গর্ত্ত হইতে গড়—পরিখা। যথা, নারায়ণ-গড়।

৸৵০ সং গঞ্জা—মদিরাগৃহ, আকর; ফার্সী গঞ্জ—বাণিজ্য-স্থান। যথা, দেওয়ান-গঞ্জ, মুনশী-গঞ্জ।

৸৶০ সং গ্রাম হইতে গাঁ। গাঁও (বাস্তবিক গাঅঁ)।

১৲ সং খল্ল—গর্ত্ত হইতে খাল। খাল+ঈ=খালী। যথা, নব-খালী—নওয়াখালী, গঙ্গা-খালী—গেঅঁখালী।

১/০ সং খোলক হইতে খোলা। হাঁড়ার আকারের নিম্ন স্থান। যথা, নল-খোলা, নাটা-খোলা।

১৵০ সং গুল্ফ হইতে গোড়—শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। গোড় হইতে গোড়া—আরম্ভ। হ্রস্বার্থে গুড়া। যথা, শিলার আরম্ভ—শিলী-গুড়ী।

১৶০ সং গোল হইতে গোলা ধান্যাদি-বিক্রয়-স্থান। যথা, ভগবান নামক ব্যক্তির নাম হইতে ভগবান-গোলা।

১।০ সং গৃহ হইতে ঘর। প্রথমে যত ঘর থাকে, তদনুসারে নাম। যথা, দশ-ঘরা, চৌ-ঘরিয়া।

১।/০ গাছ কুসুম ফুল শব্দে অনেক গ্রামের নাম হইয়া থাকে। যথা, বেল-গাছিয়া, ফুল-কুসুমা, ফুলিয়া ইত্যাদি।

১।৵০ ঘাট সং ঘট্ট অবতরণ-স্থান, কিংবা সং আঘাট—গ্রামের সীমা। যথা, কালী-ঘাট। হাট স্থানে ঘাট হইতে পারে। যথা, গো-ঘাট, বোধ হয় গো হাট।

১।৶০ সং চক্র—গ্রামসমূহ হইতে চক। কিংবা সং চতুষ্ক হইতে চউক—চক, চারি-কোণা স্থান। যথা, রাণীর-চক।

১॥০ নদীর মধ্যে কিংবা পার্শ্বে উত্থিত ভূমি, চর। যথা, চর-বিষ্ণুপুর, দেবীর-চর।

১॥/০ সং চুল্লী হইতে জুলী—দীর্ঘ নালী। বড় জুলী—জোল। যথা, নাড়া-জোল। জোল শব্দের রূপান্তরে সোল বোধ হয়। যথা, আসন-সোল—আসন গাছের জোল।

১॥৵০ সং ঝর প্রায় জোলের তুল্য। যথা, কেন্দু গাছের ঝর—কেঙঝর।

১॥৶০ অনেক নামের শেষে দি, ডি, ডিহা, টা আছে। সং দ্বীপ, ফাং দেহ (সং দেশ), এবং দীঘি হইতে আসিতে পারে। ফার্সী দেহ হইতে ডিহী—জমীদারের প্রধান গ্রাম। যথা, ভাণ্ডার-ডিহী, বেল-ডিহা—বিল্ব-দ্বীপ—সংক্ষেপে বেলটা, বার-দ্বীপ—বারদি।

১৸০ সং তুঙ্গ হইতে ডাঙ্গা—উচ্চ ভূমি। যথা, ফরাশ-ডাঙ্গা।

১৸৴০ ডাঙ্গার বিপরীত ডহর—সং হ্রদ হইতে আসিয়াছে। হ্রদ হইতে দহ, এবং দহ ডহর মূলে এক। পূর্বকালের নিম্নভূমি ভরাট হইয়া গ্রাম। যথা, চক্রাকার দহ—চাক-দহ, শৃগালের দহ—শিয়াল-দহ। এইরূপ, সং বিল—গর্ত নামও আসিয়াছে। যথা, চাঁদ-বিল।

১৸৵০ সং তল অধোভাগ হইতে তলা। তলা শব্দের অপভ্রংশে টোলা, এবং ছোট টোলা—টুলী। যথা, চণ্ডী-তলা, কলু-টোলা। টোলা, টুলী নগরের পাড়া। তেমনই পটী ও ফাং মহাল্লা। তলা শব্দ সামান্যতঃ পৃষ্ঠদেশ, স্থান বুঝায়। এইরূপ, শিব-তলা, রথ-তলা, একতলা, দুতলা ইত্যাদি।

১৸৶০ সং দীর্ঘিকা—দীঘি, সং পুষ্করিণী—পুখর, পুকুর, সং সাগর—সায়র নামেও গ্রাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যথা, চক-দীঘি (চতুষ্কোণ দীর্ঘিকা), কামার-পুকুর, পাত্র-সায়র, শিব-সাগর।

২৲ সং দ্বীপ—মূল অর্থ দুই দিকে জল-বেষ্টিত ভূমি। তিন চারি দিকে জল-বেষ্টিত হইলেও দ্বীপ। পাশের ভূমি হইতে উচ্চ হইলেও দ্বীপ। যথা, নব-দ্বীপ—অপভ্রংশে নদীয়া। দ্বীপের অপভ্রংশে দীয়া। যথা, লক্ষ্মণ-দীয়া।

২/০ কোন কোন গ্রামের নামের শেষে না আছে। এই না নানা শব্দের সংক্ষেপে আসিতে পারে। কোণা—না, নদী—নই—না, নৌকা—না, এবং হ্রস্বার্থে বাং না প্রত্যয় হইতে পারে। যথা, সং খুল্ল—ছোট, না—ছোট; খুল্লনা—খুলনা—ছোট কিছু; হিজল-কোণা—হিজলনা; মেঘবর্ণা—মেঘনা, কিংবা মেঘনদ হইতে মেঘনা। পানী (জল) হইতে আনী থাকিতে পারে। যথা, মহিষ-পানী—মইষানী।

২৵০ সং পাটক হইতে পাড়া। গ্রামের অর্ধভাগের নাম পাটক। পাড়া—গ্রামের ভাগ। যথা, ভাট-পাড়া—ভট্ট-পাটক (ভট্টপল্লী নহে)।

২৶০ সং বাট—প্রাচীর, বাটী—আবৃত স্থান। প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান বাট, বাটী হইতে বাড়ী। বাড়ী থাকাতে বাড়িয়া। কোন কোন নামে সং বেষ্ট—বেড়, বেড়া থাকাতে বেড়িয়া আসিয়াছে। যথা, বৈদ্য-বাটী, কালী-বাড়ী, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া, উলু-বেড়িয়া।

২।০ যেখানে খাদ্য বিক্রয় হয়, তাহা ফার্সীতে বাজার। বাজার গ্রামের নামের অঙ্গ হইতে পারে। যথা, অমৃত-বাজার।

২।/০ বাজার অপেক্ষা হাট শব্দ অনেক গ্রামের নামে পাওয়া যায়। মানুষের ও দেবতার নামে, বিক্রেয়-দ্রব্যের নামে হাট প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা, শ্রী-হট্ট, ভাণ্ডার-হাটী, দুই-বাজনা-হাটী, গুয়া-হাটী—গৌহাটী।

এখানে এই বিষয় শেষ করা যাউক। গ্রামের নামের ইতিহাস এবং গ্রামের ইতিহাস পরস্পর জড়িত। শব্দ-বিচার দ্বারা নামের ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। (কৌতূহলী পাঠক ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসী-পত্রে অনেক উদাহরণ পাইবেন)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কারক ও সমাস।

১৪৩। বহুবচনের বিভক্তি।

/০ পূর্বে (১১১ পৃঃ) বিভক্তি-সংজ্ঞার অর্থ দেওয়া গিয়াছে। তদনুসারে দেখা যায়, বাঙ্গালায় শব্দের বিভক্তি অল্প; যথা, ই এ য় কে রে তে এতে রা এরা র এর দিগ। দিগ দ্বারা কেবল বচন-জ্ঞান হয়; ই রা এরা দ্বারা বচন ব্যতীত কারক-জ্ঞানও হয়, এ য় তে দ্বারা কোথাও হয়, কোথাও হয় না। কারক হইতে বচনের সম্বন্ধ পৃথক কল্পনা করিয়া এখানে বহুবচনের বিভক্তি বলা যাইতেছে।

৵০ ই রা। সর্বনাম শব্দে কর্তাকারকে ই এক বচনের, রা বহুবচনের বিভক্তি। আমি মূল শব্দ ধরিলে উহাতে বিভক্তি নাই; আমা ধরিলে একবচনে বিভক্তি ই আছে। আমা মূল শব্দ ধরিলে আমা-কে, আমা-য়, আমা-রে, আমা-তে, আমা-র, আমা দ্বারা, আমা দিয়া, আমা হইতে, ইত্যাদি সহজে পাই। সংস্কৃতে অস্মদ্ শব্দ হইতে অহম্ পদ; অর্থাৎ অস্মদ্ মূল, অহম্ বিভক্ত্যন্ত পদ। এইরূপ, যুষ্মদ্ হইতে ত্বম্, তদ্ হইতে সঃ সা, ইদম্ হইতে অয়ম্, ইয়ম্ ইত্যাদি। অতএব বোধ হয়, বাঙ্গালাতেও আমা তোমা আপনা তো মো যে তে ই উ কে, মূল শব্দ। কর্তাকারকে এই সব কথিত ভাষার রূপ,—

একবচনে	বহুবচনে
আমা + ই = আমি	আমা + রা = আমরা
তোমা + ই = তুমি	তোমা + রা = তোমরা
আপনা + ই = আপনি	আপনা + রা = আপনারা
তো + ই = তুই	তো + রা = তোরা
মো + ই = মুই	মো + রা = মোরা
যে + ই = যিনি	যেঁ + রা = যাঁরা
তে + ই = তিনি	তেঁ + রা = তাঁরা
ই + ই = ইনি	ইঁ + রা = এঁরা
উ + ই = উনি	উঁ + রা = ওঁরা
কে + (ই) = কে	কে + রা = কারা

যে+(ই)=যে	যে+রা=যারা
তে+(ই)=সে	তে+রা=তারা
ই+(ই)=ই—এ	ই+রা=এরা
উ+(ই)=উ—ও	উ+রা=ওরা

সাধু বা লিখিত ভাষায় আ দীর্ঘ করিতে মাঝে হা আসিয়া যাহারা, তাহারা, যাহারা, কাহারা। সম্ভ্রমে স্বর দীর্ঘ ও অনুনাসিক হইয়া তাঁহারা যাঁহারা ইঁহারা উঁহারা। কিন্তু কিনি কিংবা কাহাঁরা হয় না। কারণ যাহাকে কে বলিয়া জিজ্ঞাসা করি, সে অজ্ঞাত এবং মানের যোগ্য কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। কে হইতে কাহা, যে হইতে যাহা, তে হইতে তাহা, ই হইতে ইহা, উ হইতে উহা ইত্যাদি মনে করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এখানে বিভক্তি-যোগে রূপ পরিবর্তন দেখিয়া মূল শব্দ অনুমান হইতেছে।

৶০ বাস্তবিক, প্রাচীন রূপ আহ্মি তুহ্মি (শূন্য পুরাণে) হইতে আমি তুমি। ওড়িয়াতে আম্ভে তুম্ভে। প্রাচীন শূন্য-পুরাণে কিংবা পরবর্তী কবিকঙ্কণের কুত্রাপি মুই পাই না। কিন্তু শূন্য-পুরাণে (একটি স্থানে) মুরা (আমরা), মোহর (আমার), এবং কবিকঙ্কণে মোর আছে। অতএব বোধ হয় পূর্বকালে রাঢ়েও মুই শব্দ ছিল। এখন কেবল তুই-মুই শব্দে আছে। আহ্মি হইতেও আহ্মর—মহর—মোহর—মোর আসিয়া থাকিতে পারে। সং-প্রাকৃতে অম্হি পদের বহুবচনে মো হইতে পারিত। ওড়িয়াতে আম্ভ হইতে সম্বন্ধপদ আম্ভর। চৈতন্যচরিতামৃতে মুঞি, মুই, মো আছে। দীনতা প্রকাশ করিতে হইলে মুই হইত। কৃত্তিবাসে বানর ও রাক্ষসেরা স্থানে স্থানে মুই বলিয়াছে। ওড়িয়াতে মুঁ দীনতায়, আম্ভে বক্তার সম্মান-জ্ঞানে।* এইহেতু রাজা এবং তৎতুল্য ব্যক্তি আম্ভে বলিতে পারেন, সাধারণে মুঁ, বহুবচনে আমে। বর্তমান সে, পালি ও সংস্কৃত-প্রাকৃতে এবং বিদ্যাপতিতে সো। চৈতন্যচরিতামৃতে তিহ সেহ, তেঁহ; আসামীতে তেওঁ (বাস্তবিক তেহঁ)। তেহ বা তিহ শব্দ মান্যে তেঁহ, তিঁহ হইত। তেঁহ হইতে তিনি, এবং সে ও তিনি বহুবচনে তাঁহারা। সে শব্দ ওড়িয়াতে মান্য ব্যক্তির প্রতিও প্রয়োগ করা যায়; অতএব ও° সে, বা° তিনি ও সে র স্থানীয়। ইহাতে বোধ হয় প্রাচীন বাঙ্গালাতেও সে বা সো, এই এক শব্দ ছিল। সংস্কৃত ও সং-প্রাকৃতে তে বহুবচন। তিনি শব্দও বহুবচন। সে করে, তিনি করেন; ওড়িয়াতে করে, করন্তি। আসামতে মই তই একবচন, আমি তুমি বহুবচন।† এইরূপ ওড়িয়াতে মুঁ তু একবচন, আমে তোমে বহুবচন। হিন্দীতে মৈঁ তূ একবচন, হম তুম বহুবচন। এইরূপ মরাঠীতে মী তূঁ একবচন, আহ্মী তুহ্মী বহুবচন। এই সব কারণে বোধ হয়, প্রাচীন বাঙ্গালাতে মুঁই তুই একবচনান্ত, এবং আমি তুমি

* ইংরেজীতে রাজা একজন হইলেও বলেন We। এইরূপ পত্রিকা-সম্পাদক। কারণ ইঁহারা একাই এক শ।

† আসা°-তে তই শব্দের বহুবচনে তইতে, এবং তুমি শব্দের বহুবচনে তোমালোকে। তই শব্দের বহুবচন যে তুমি, তাহা ভুলিয়া তুমি পৃথক শব্দ হইয়াছে। পরে দেখ।

বহুবচনান্ত পদ বিবেচিত হইত। তুমি সম্ভ্রম-সূচক ছিল, কিন্তু প্রয়োগে সামান্য শব্দ হইয়া পড়িয়াছে।* এইহেতু আপনি শব্দ তুমির স্থান লইতেছে। তুই একবচন বলিয়া আদরে এবং অনাদরে উভয় স্থলেই বসিয়া থাকে। দেবতাকেও তুই বলা যায়। সংস্কৃত সঃ একবচন, তে বহুবচন। বাঙ্গালাতেও সে একবচন, এবং তিনি বাস্তবিক মান্যে বহুবচন। এইরূপ জে (যে) কে সংস্কৃতপ্রাকৃতে বহুবচন বুঝাইত। আরও দেখা যায়, সর্বনাম শব্দ অনুনাসিক হইলে মান্য ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হয়। তুই তুমি, সে তিনি, ইহা ইনি, যাহা যিনি, উহা উনি, তাহা তিনি। কিন্তু মুই বলি আর আমি বলি, উভয়ই অনুনাসিক। বোধহয়, পূর্বকালে সভাসমাজের সাধুভাষার এক লক্ষণ অনুনাসিকত্ব ছিল, এবং সে লক্ষণ সংস্কৃত ভাষার ন ম এর চিহ্ন-স্বরূপ আসিয়াছিল।

।০ এ য় রা এরা। কর্তা-কারকে দেবতা ও মনুষ্য-বাচক শব্দে এই এই বিভক্তি হয়। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর এ এরা, আকারান্ত শব্দে য়, এবং স্বরান্ত শব্দে রা হয় (সম্বন্ধে র এর বিভক্তি দেখ)। লোক গাছ প্রভৃতি শব্দ লেখায় অকারান্ত, উচ্চারণে ব্যঞ্জনান্ত। বিভক্তি-যোগের সময় এই কথাটি সর্বদা স্মরণে আবশ্যক। লোকে বা লোকেরা, দেবতায় বা দেবতারা, পড়শীরা, বউরা, ছেলেরা, বণিকেরা। রাঢ়ে আ ই উ স্বরান্ত শব্দে আদরে এরা হয়, এবং মা-রা, মা-র (সম্বন্ধ পদ) কখনও হয় না (চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, মধুসূদনেও† মা-য়ের)। ঝীরা, ঝীএরা; বউরা, বউএরা (বা বৌয়েরা)—এই দুই রূপের প্রয়োগ এক নহে। অনাদরে স্বরলোপ, এবং আদরে স্বরযোগ বাঙ্গালা ভাষার সাধারণ নিয়ম। বাপেরা, পণ্ডিতেরা বলিলে অসম্মান করা হয় না। কবিকঙ্কণে, 'বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল।'

।/০ দে দি দিগ। লিখিত ভাষায় দিগ, কথিত ভাষায় দে দি। দিগ বিকারে দে। যে সকল শব্দে কর্তাকারকে রা বসিতে পারে, সে সকল শব্দে অন্য কারকে দে দি দিগ বসে। আমাদে(-র), ছেলেদি(-কে), ছেলেদিগ(-কে), ইত্যাদি। পশুরা গোরুরা পশুদিকে (বা দিগে) পশুদিগকে ইত্যাদি শোনা যায় না।

।√০ গুলা, গুলি। দি, দিগ বরং বিভক্তি বলা চলে, গুলা গুলি-কে বলা চলে না। বহু-অর্থবোধক প্রত্যয় বলা চলে। সর্বনাম এবং দেবতা ও মনুষ্য বাচক শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দে গুলা গুলি প্রত্যয় হয়। ধানগুলা, মাছগুলা, গাছগুলা, নৌকাগুলা, ইত্যাদি। দ্রব দ্রব্যের গুলা বলা যায় না। কিন্তু অবজ্ঞায় বলা যায়। যথা, মাণিকে, 'পিছল করিল অঙ্গে মেখে তৈলগুলা।' আদরে গুলি, অর্থাৎ গুলার হ্রস্বার্থে গুলী। (কিন্তু গুলি লেখা ...ত প্রচলিত যে গুলী বানান চলে কি না সন্দেহ)। 'আহা! মাছগুলি মরিয়া গেল!' অনাদরে দেবতা ও মনুষ্য-বাচক শব্দেরও পরে গুলা হয়। তখন উদ্দিষ্ট দেবতা ও মানুষ

---

* ইংরেজী thou একবচন, you বহুবচন। কিন্তু শিষ্টসমাজে you একবচনেও প্রযুক্ত হয়।

† 'কহিও মায়েরে মোর', 'হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী'।

অচেতন বস্তু ও ইতর প্রাণীর তুল্য জ্ঞান হয়। 'লোক-গুলার আক্কেল দেখেছ?' গুলি দ্বারা দয়া প্রকাশ পায়। 'লোক গুলির কি কষ্ট!' এখানে সম্মান নাই, কিন্তু দয়া আছে। কখন কখন সবগুলা সবগুলি অনেকগুলা অনেকগুলি বলা যায়। তখন গুলা গুলি বহুবচনের প্রত্যয় না হইয়া দ্রব্য বা ব্যক্তি বুঝায়। কিন্তু, 'অনেক গুলা ইট', 'সব আম গুলা', কিংবা 'লোক-গুলা সব' ব্যাকরণে চলে না, অনবধানতায় চলে। লোকগুলা, সব গিয়াছে—লোকগুলা গিয়াছে, সব গিয়াছে একজনও নাই—এই অর্থ প্রকাশ করে। প্রত্যয়ের পর প্রত্যয় লাগাইবার ঝোঁক অতিশয়োক্তি ও ভাবের আবেগে ঘটে।

।৵০ সকল সমূহ গণ প্রভৃতির উল্লেখ অনাবশ্যক। এই সকল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত শব্দের সহিত শোভা পায়। গোরু-সকল, মাছ-সকল, ডাকাইত-গণ, পুলিশ-গণ ইত্যাদি চলে না। কথিত ভাষায় যাহা শুনিতে কটু, লিখিত সাধুভাষায় তাহা মধুর হয় না। সমূহ ও গণ, শব্দের পরে বসে; সকল, সব, সমস্ত, সমুচ্চয়, সমুদয়, এবং (যাবনিক) বেবাক, বিলকুল, তামাম প্রভৃতি শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণ হইয়া বসে, বিশেষ্যের পরে বসে না। তখন দেবতা, মনুষ্য, অ-মনুষ্যের বিচার আবশ্যক হয় না। সকল গাছে জল পেয়েছে? সমস্ত লোক শুয়েছে? অর্থাৎ একটিও বাকী নাই ত? সকল শব্দ বিশেষণ; অর্থে সমুদয় কলা বা অংশ সহিত, সুতরাং সমগ্র, অখণ্ড, পূর্ণ। সংস্কৃতের সকল-সিদ্ধিদ, সকলেন্দু প্রভৃতি প্রয়োগ হইতে সকল শব্দের অর্থ স্পষ্ট হইতেছে। এইরূপ অর্থ বাঙ্গালাতেও আছে। সকলে গিয়াছে? সকলেই পারে, ইত্যাদি সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা গণা যায়, তাহার সম্বন্ধে গণ শব্দ বসিতে পারে, এবং সংস্কৃতে গণ শব্দের প্রয়োগে চেতন অচেতনের প্রভেদ দেখা যায় না। বাঙ্গালায় গণ শব্দের সমূহ সমবায় অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রেণীর ভাব না থাকিলে গণ শব্দ ভাল শোনায় না। মেঘগণ সঞ্চরণ করিতেছে, ধান্যগণ পক্ক হইয়াছে, ইত্যাদি ভাল শোনায় না। বাঙ্গালাতে অচেতন পদার্থে গণ শব্দ বসে না।

বস্তুতঃ বাঙ্গালাভাষার প্রকৃতিতে সকল গণ সমূহ প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দের যোগ প্রায় আবশ্যক হয় না। মনুষ্য, গোরু, বৃক্ষ, গাছ প্রভৃতি শব্দ জাতিবাচক, সুতরাং বহুত্ব-জ্ঞাপক। এইহেতু, বালকগণ খেলা করে, গোরুসকল চরিতেছে, উটপক্ষীরা উড়িতে পারে না, বৃক্ষগণ শুখাইয়া গিয়াছে, ইত্যাকার বাক্য নূতন শোনায়। জাতিবাচক নাম বহুত্ব-বোধক। এইহেতু একত্ব-বোধ নিমিত্ত নামের পরে টা টি টী খানা খানি ইত্যাদি যোগ করিতে হয়। দ্রব্য গুণ কর্ম ভাব-বাচক বিশেষ্যের বহুবচন থাকিতে পারে না। সোনা-রা, দয়া-রা, চাকরি-রা, কর‍্রা-রা হইতে পারে না। জাতিবাচক নাম বহুবচন। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় বহুবচনের বিভক্তি সর্বনাম পদে আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং প্রাচীন বাঙ্গালাতেও পাওয়া যায়। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এবং সে ভাষার সাদৃশ্যে আধুনিক বাঙ্গালায়, (এইরূপ আসামী ওড়িয়াতে), বিশেষতঃ নূতন লেখকের লেখায়, বহুবচনের বিভক্তির এবং সকল গণ সমূহ ইত্যাদির অপ-প্রয়োগের আধিক্য ঘটিতে দেখা যায়। সঙ্খ্যা-বাচক কিংবা বহুত্ব-জ্ঞাপক

বিশেষণ থাকিলে বিশেষ্যে বহুবচনের বিভক্তি লাগে না। অনেক গুলা আম, সব আম গুলা —শুদ্ধ ভাষা নহে। বিশেষণ দ্বিরুক্ত হইলে বহুবচন বুঝায়। ভাল ভাল আম—অনেক আম। এখানে প্রকর্ষ অর্থও আছে। প্রত্যেক, এক বিশেষণ শব্দ থাকিলে পরে বহুবচনের বিভক্তি বসিতে পারে না। 'প্রত্যেক বিশেষ্য পদগুলি'—কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না।

॥০ বাঙ্গালায় বহুবচনে কর্তাকারকে এ রা হয়। এ য় ই একই। আসামী, ওড়িয়া ও হিন্দিতে এ, এবং মরাঠীতে এঁ আছে। অতএব এই এ বিভক্তির মূল সংস্কৃত বোধ হয়। হয়ত সংস্কৃত বহুবচনের বিভক্তি নি এ (যথা, ফলানি, সরে´) এই পাঁচ ভাষায় আসিয়াছে। মাস্থে বহুবচনের বিভক্তি লাগে। এই কারণে আসামী ও ওড়িয়াতে একজন হইলেও পণ্ডিতে, কালিদাস এক কবি হইলেও কালিদাসে বলা ও লেখা রীতি। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তি এন এণ স্থানে এ আসিয়াছে (যেমন রামেণ কৃতং), তাঁহাদের অনুমান দুর্বল। বা° রা বিভক্তির অনুরূপ অন্য চারি ভাষায় পাই না। ইহাতে বোধ হয় রা বাঙ্গালার নিজস্ব, এবং সংস্কৃত বিভক্তি কিংবা শব্দ-বিশেষের বিকারে উৎপন্ন। হয়ত বা° সম্বন্ধ পদের র বিভক্তি হইতে বহুবচনের বিভক্তি রা হইয়াছে। মু হইতে মোর, মোর হইতে মোরা অর্থাৎ আমা-সম্বন্ধীয় (লোক)। তদ্ধিত প্রত্যয় রা ড়া তুলনা করা যাইতে পারে। সম্বন্ধের র কারক-প্রকরণে দেখা যাইবে। কিংবা লোক শব্দের বিকারে লা—রা হইয়াছে। মোরা—আমি-লোক। আসামীতে তোমা-লোকে—তোমরা। ওড়িয়াতে স্ত্রীলা—ত্রীলা—তিরলা শব্দ গ্রাম্য লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আসামীতে তিরোতা (সং স্ত্রী) ওড়িয়ার তিরলা। এইরূপ (পিলা-) ঝীলা শব্দও ওড়িয়াতে শোনা যায়। 'স্ত্রীলোক' শব্দের সংক্ষেপে ও° তিরিলা আ° তিরোতা বোধ হয়। আসামীতে তোমা-লোক যেমন, তেওঁ-লোক তেমন বহুবচন। তেওঁলোক—তিনি-লোক। হিন্দীতে হমলোগ (আমরা) বহু প্রচলিত। বা° আমি শব্দ মূলে বহুবচন হইলেও আমরা আসিয়াছে, হি°-তে হম বহুবচন হইলেও হম লোগ চলিয়াছে। ওড়িয়াতে মান বহুবচনের প্রত্যয়। লোক-মান—লোকেরা। অনেকে ইহাকে আবার বহুবচন করিয়া লোক-মানে বলে। এই মান শব্দ সং, অর্থ পরিমাণ (তু° আসা° কিছুমান—কিঞ্চিৎ পরিমাণ)। ও° আস্তে স্পষ্ট বহুবচন। তথাপি আস্তে-মানে আধুনিক লেখক ও বক্তা সর্বদা প্রয়োগ করিতেছেন। প্রত্যয়ের মূল ভুলিলে প্রয়োগ বাড়িতে থাকে। বা° রা দেবতা ও মনুষ্য-বাচক বিশেষ্য এবং সর্বনামে বসে। কিন্তু কেহ কেহ ভুল ক্রমে অন্য শব্দেও বসাইয়া ফেলে। ও° তে আস্তেমানে যেমন অশুদ্ধ, তেমনই বৃক্ষসবু, গোরুসবু স্থানে বৃক্ষমানে, গোরুমানে ইত্যাদি বলাও অশুদ্ধ। এমন কি গ্রাম্য হিন্দীতে গোরু-লোগ চলিয়া যায়।

॥/০ প্রাচীন বাঙ্গালায় রা পাই না। শূন্য পুরাণে মুরা আছে বটে, কিন্তু সে গ্রন্থের সব স্থান প্রাচীন নয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় দিগও পাই না। চৈতন্যচরিতামৃতে (তিন শত

বৎসর পূর্বে) তাঁ সবার—তাঁহাদিগের। প্রাচীন বাঙ্গালায় (এবং বর্তমান কথিত ভাষায়) সব শব্দ দ্বারা বহুবচনের বিভক্তির কাজ হয়। 'পাখী সব করে রব'—খাঁটি বাঙ্গালা। এইরূপ, ওড়িয়াতেও সবু। আধুনিক আসামীতে বোর ও বিলাক বসিতেছে। আসামী ভাষা সংস্কৃত হইতে অতিভ্রষ্ট হইতেছে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালা ছাড়া অন্য চারি ভাষাতে দিগ পাই না। আমরা বাল্যকালে দিগ্‌গে, দিগ্‌গের শুনিতাম। দিগ্‌গে—বর্তমান দিগে বা দিগকে, দিগ্‌গের—দের বা দিগের। প্রবোধচন্দ্রিকায় (১০০ বর্ষ পূর্বে), আমারদের, আলঙ্কারিকেরদের, ইত্যাদি আছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে, 'সে জন তোমারদিগের তথাতথা মরে'। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, ফারসী দিগর (অর্থ, 'অন্য') হইতে বাং দিগ আসিয়াছে। কিন্তু, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে ধ্বনি-সাম্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। দলীল-পত্রে 'রামহরি-দিগর বাদী' পাই, কিন্তু চলিত কথাবার্তায় দিগর শুনি না। গ্রাম্য দলীল-লেখকেরা দিগর পরিবর্তে দিগ্‌গর দিগগের দিগ্‌গ লেখে না, লেখে দিগর। প্রবোধচন্দ্রিকায়, তুলাকার্পাস-দিগর, ছুরীবন্দুক-দিগর পাই। দিগর হইতে দিগ আসিলে আমাদিগরকে কেবল এইরূপ পদ হইত, আমাদিগে তোমাদিগে, তাদিগে এবং আমাদের তোমাদের তাদের ইত্যাদি আসা কঠিন হইত। দিগরশব্দ চলিত আছে। এইহেতু উহার গর লোপে কেবল দি টুকু থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ আপত্তি, দুই শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গের এক এক স্থানে দিগর শব্দের নানা পরিবর্তন হইত না (২০২ পৃঃ দেখ)। অন্যদিকে, প্রাচীন বাঙ্গালায় বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে ইত্যাদি অর্থে আদি ও আদিক শব্দ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।* বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্তমান বাঙ্গালার পূর্বরূপ পাই। বাঙ্গালা আসামী ওড়িয়াতে ব্রহ্মা-আদি দেবতা, ব্যাঘ্র-আদি পশু অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দীতে বহুত্ববোধক আদি শব্দ বিশেষ প্রচলিত আছে। "রাজা মহারাজা আদি অনেক পুরুষ উৎসুক হৈঁ।" এইরূপ প্রয়োগ যে-কোন হিন্দী পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ওড়িয়াতেও আদি শব্দ প্রচলিত আছে। আদি শব্দ সংস্কৃত বলিয়া বহুকালে লোকমুখে স্থান ভেদে নানারূপ ধরিয়াছে। এই সব কারণে মনে হয়, আমা-আদি তোমা-আদি হইতে আমাদি তোমাদি আসিয়া থাকিবে। প্রাচীন বাঙ্গালায় (এবং সংস্কৃত-প্রাকৃতে) স্বার্থে ক সর্বদা বসিত (কারক দেখ)। আদিক শব্দের শেষের ক স্থানে গ হওয়া কিছুই নূতন নহে। চণ্ডীদাসে, 'মোদের ঘরে রোগী আছে আরে, দেখ একবার যাই।' 'তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি।' কিন্তু, চণ্ডীদাসের নামে অনেকের পদ চলিয়া গিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতেও দের দিগে পাই না, কিন্তু ইত্যাদিক শব্দ আছে। অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদি হইতে বোধ হয় বাঙ্গালা দি দে তিন শত বৎসরের অধিক পুরানা নহে। আমা-আদি পদে কার জুটিয়া সম্বন্ধে আমাদিকার, আমাদিকের আমাদিগের আসাও অসম্ভব নহে। কালিকার, আজিকার স্থলে রাঢ়ে গ্রাম্য কালিকের, আজিকের পদ চলিতেছে। (সম্বন্ধে কার বিভক্তি দেখ)।

* যথা, 'এথা শচী আগে ব্রহ্মাদিক স্তুতি করে।' নবদ্বীপ-পরিক্রমা।

৸৵০ বাঙ্গালা গুলা গুলি ওড়িয়াতে গুড়াক, গুড়িক। গুলা ও গুড়া একই; স্বার্থে ক বসাইয়া গুড়াক, গুড়িক। প্রবোধচন্দ্রিকায়, 'ছলিয়াগুলিকের'। গুলা শব্দ প্রাচীন শূন্য-পুরাণে আছে। 'বিভূতি গুলা,' 'ভূম গুলি' (ভূমি গুলি)। বঙ্গের কোন কোন স্থানে গুলান, গুলিন (স্বার্থে ম্—ন্) আছে। হিন্দী ও মরাঠীতে গুলা শব্দের অনুরূপ পাই না। ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শব্দ-বিশেষের বিকারে গুলা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, সং গণ শব্দের অপভ্রংশে বাং গুলা শব্দ হইয়াছে। কিন্তু, বাঙ্গালা কিংবা ওড়িয়াতে গণ শব্দ অজ্ঞাত হয় নাই, এবং গণ শব্দ ওড়িয়াতে গড় হয় নাই। সং কুল—সমূহ, রাশি—হইতে গুলা গুড়া সহজে আসিতে পারে, এবং গুলা শব্দের প্রয়োগ দেখিলে সমূহ ও রাশি অর্থ পাওয়া যায়।*

১৪৪। কারক ও কারকের বিভক্তি।

।০ বাক্যে অনেক পদ থাকে। পদের অর্থ একত্র করিলে বাক্যের অর্থ পাই। সংস্কৃতে অব্যয় ব্যতীত বিভক্তি-শূন্য পদ অসম্ভব †, বাঙ্গালাতে সেরূপ পদ সাধারণ। শব্দের অর্থ, বাক্যে শব্দের স্থান, প্রসঙ্গাদি বিবেচনা করিয়া বাক্যের অর্থ হইয়া থাকে। 'রাম বন যা,' —এরূপে যখন কোলের শিশু কথা কহে, তখন সে কথা তাহার মায়ের কাছে অস্পষ্ট হয় না। রাম বনে যা, রাম বনে গেলেন, রাম পায়ে হাঁটিয়া বনে গেলেন, রাম বাল্যকালে বনে গেলেন, রাম লক্ষ্মণসঙ্গে বনে গেলেন, ইত্যাদি বাক্যে ধাতু ও শব্দে বিভক্তি-যোগের প্রয়োজন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। যত প্রকার কর্ম যতভাবে করিয়া থাকি, তৎসমুদয় বুঝাইতে এক এক বিভক্তি থাকিলে বাক্যের অর্থ অতি স্পষ্ট হইত, কিন্তু, সে সব বিভক্তি শিখিতে জীবনে সময় কুলাইত কি না সন্দেহ। ভাষার পূর্বে যদি ব্যাকরণ জন্মিত, তাহা হইলে ব্যাকরণে আঁকা-বাঁকা সূত্র থাকিত না, নিপাতনের আদেশের প্রয়োজন হইত না।

৵০ সংস্কৃত-ব্যাকরণকার ভাষার নামপদ বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি বিভক্তি পাইলেন। ইহাদের তালিকা করিয়া প্রথম তালিকা দ্বিতীয় তালিকা ইত্যাদি নাম দিলেন। এইরূপে তিনি বিভক্তিগুলিকে সপ্ত শ্রেণীতে ভাগ করিলেন। এই খানে নিবৃত্ত হইলে তাঁহার পরিশ্রমের প্রয়োজন থাকিত না। তিনি পদের অর্থ এবং বিভক্তির যোগ মিলাইতে লাগিলেন। দেখিলেন পদের যাবতীয় অর্থ আট ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে ছয় ভাগের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে, দুই ভাগের সহিত নাই। যে ছয় প্রকার মূল অর্থের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে, সে গুলিকে ব্যাকরণকার কারক বলিলেন। অন্য দুই ভাগ পদ-মাত্র রহিয়া গেল, কারক নাম পাইল না। এই দুই ভাগে সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ হইল।

* সং কুল শব্দের অপভ্রংশে বাং-তে কুড় শব্দও আছে। ইতস্ততঃ প্রসারিত ধান্যের রাশি করিলে ধানের কুড় করা হয়। সং কুল, কূল শব্দ হইতে বাঙ্গালাতে আরও কয়েকটি শব্দ আসিয়াছে। কোষে উল, কুড়, উড়-কুড়, কুলান ইত্যাদি শব্দ দেখ।

† অনেক অব্যয় শব্দেও বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে।

৶০ কিন্তু নাম-পদের যাবতীয় অর্থ আট ভাগের মধ্যে আনা সহজ নহে। কারণ পদের অর্থ অসংখ্য বলিতে পারা যায়। অসংখ্যকে সংখ্যের মধ্যে আনিতে গেলে এক এক ভাগের সংজ্ঞা বিস্তৃত করিতে হয়, না হয় কষ্ট-কল্পনায় কাজ সারিতে হয়। সংস্কৃত-ব্যাকরণে এই দুয়ের লক্ষণ আছে। সংস্কৃতে গমনার্থক ধাতু সকর্মক হইয়াছে, তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত পদের কর্ম জুটিয়াছে, ধিক প্রতি সহ অলম্ কিম্ নমস্ অন্য বিনা প্রভৃতি শব্দ যোগে নানাবিধ পদের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত-টীকাকার নামপদমাত্রের কারক নির্দেশ না করিয়া বিভক্তি বলিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ বিভক্তি দ্বারা (১) কর্তাকর্মাদি কারক পদ, এবং (২) সম্বন্ধ সম্বোধন এবং বিশেষ বিশেষ অর্থে ও বিশেষ বিশেষ শব্দ-যোগে পদ সিদ্ধ হয়।

।০ বাঙ্গালা-ভাষা সংস্কৃতের রীতি কতক পাইয়াছে, কতক পায় নাই। সুতরাং বাঙ্গালা-ব্যাকরণে সংস্কৃতের আদর্শ সম্পূর্ণ রাখা যাইতে পারে না। বাঙ্গালায় সকল পদে কারকের বিভক্তি থাকে না এবং স্থান বিশেষে একই পদ দুই তিন কারক মনে করা চলে। একটা কথা প্রণিধান কর্তব্য, পদকে কারক অনুসারে ভাগ করা যে রকম, বিভক্তি অনুসারে ভাগ করা সে রকম নহে। ঐ দুই ভাগ কোথাও মিলিয়া যায়, কোথাও মেলে না। আর এক কথা, সকল স্থলে ক্রিয়ার সহিত কারকের অন্বয় স্পষ্ট না থাকিয়া শব্দের সহিত থাকে।

।/০ **প্রথমে কারক ভাগ করা যাউক।** যে করে বা হয়, সে কর্তা। সংস্কৃতে কুম্ভকারঃ ঘটং করোতি—কুম্ভকার নিশ্চয়ই কর্তা। কুম্ভকারেণ ঘটঃ ক্রিয়তে—এখানেও কুম্ভকার কর্তা, বিভক্তি যাহাই হউক। ইহার অনুকরণে পণ্ডিতী বাঙ্গালায় 'গ্রন্থকার-কর্তৃক লিখিত পুস্তক'—এখানে গ্রন্থকারকে পুস্তকের কর্তা বলা অভিপ্রায়; কিন্তু গ্রন্থকার-কর্তৃক (গ্রন্থকার কর্তা যাহার) পুস্তক পদের বিশেষণ, এবং লিখিত পদ অনাবশ্যক এবং অশুদ্ধ বলিতে পারা যায়। চলিত বাঙ্গালায়, 'গ্রন্থকারের লিখিত'—গ্রন্থকারের বস্তুতঃ কর্তা। 'কুম্ভকার নিজে ঘট গড়ে'—নিজেও কর্তা। 'ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে,' 'বেদে বলে,' 'গোরুতে ধান খায়,'—কর্তা স্পষ্ট। 'পয়সাকে পয়সা গেল জিনিষও পেলে না,'—পয়সাকে কর্তা মনে করিতে হইতেছে। 'আমাকে যাইতে হইবে,' 'তোমাকে শুনিতে হইবে'—আমাকে তোমাকে কর্তা। 'তুমি গেলেই চলিবে'—তুমি পদ গেলে পদের কর্তা। 'ঘর থাকিতে বাহিরে কেন'—থাকিতে পদের কর্তা ঘর।

।৵০ কর্তা যাহা করে, তাহা কর্ম। এ সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নহে। কর্তার ঈপ্সিততম যাহা, তাহাই কর্ম। 'এমন ছেলে দেখি নাই,' 'এমন ছেলেকে মারিতে নাই,' 'কথাটা শুনিতে ভাল,' 'শয়ন কর'। 'অন্ন ভোজন কর'—ভোজন বিশেষ্যের কর্ম অন্ন; 'অন্নের ভোজন' বলিলেও অন্ন কর্ম। 'বাদ্য বাজাও,' 'কি ঠকান ঠকাইয়াছি,' 'কি মারি মারিয়াছে'। 'দরিদ্রকে ধন দেও,' 'আমাকে ধন দেও,' 'সে কথা তোমাকে বলিব না'—দ্বিকর্মক ক্রিয়ার গৌণকর্মে বিভক্তি, মুখ্য কর্মে নাই। 'ঘর যাও,' 'বাড়ী এস,' 'পথ চল,' 'এক ক্রোশ চল,' 'এক দণ্ড চল,'—ইত্যাদিতে গমনার্থক ধাতুর কর্ম পাইতেছি। 'এক রাত্রি থাক,' 'দুই দিন

থাম,'—ইত্যাদিতেও রাত্রি দিন কর্ম মনে করিলে চলে। 'ত্বরা করিয়া,' 'ভাল করিয়া,' 'কেমন করিয়া'—ইত্যাদির ত্বরা ভাল কেমন কর্ম পদ। নতুবা করিয়ার কর্ম থাকে না। (তু° কি করিয়া যাবে)। 'শীত করিতেছে,' 'ভয় করিতেছে,' 'আমায় শীত করে আমাকে ভয় করে,' 'আমারে শীত করে ভয় করে'—ইত্যাদি করে ক্রিয়ার কর্ম আমায় আমাকে আমারে। 'শীত করিতেছে'—শীত আমাকে পীড়িত করিতেছে—এইরূপ অর্থ।

।৶০ করণকারক দ্বারা সাহচর্য, সাহায্য, উপকরণ, সাধন, এবং সাধন হইতে কারণ হেতু নিমিত্ত অর্থ বুঝায়। 'পুস্তক সাহায্যে,' 'তোমার সঙ্গে, সাথে,'—সাহায্যে সঙ্গে সাথে করণকারক। 'কানে শোন,' 'চোখে দেখ,' 'চোখে কানা,' 'কানে কানা'। 'দোড়ীতে বাঁধ,' 'ছুরীতে কাট'। 'তেলে ভাজ,' 'রোদে শুখাও'। 'মাটিতে ঘট হয়,' 'টাকায় কি না হয়,' 'দুই টাকায় কিনিয়াছি'। 'হাত দিয়া ধর,' 'পথ দিয়া চল,' 'রেলে যাইব,' 'পদব্রজে আসিব'। 'বিবাদে প্রয়োজন নাই,' 'শ্রম বিনা (কিংবা বিনা শ্রমে) কাজ হয় না।' 'বেত মার,' 'বেতের আঘাত কর'—বেত, বেতের করণ।

৷।০ অনেকে বলেন বাঙ্গালায় সম্প্রদান-কারক নাই। এ কথার অর্থ বুঝি না। বাঙ্গালায় সম্প্রদান-কারকের পৃথক বিভক্তি নাই। কিন্তু তেমনই আরও অনেক কারকের নাই বা থাকে না। যদি সম্প্রদান-কারকে কেবল দানের পাত্র বুঝাইত, তাহা হইলে উহাকে কর্ম-কারক মনে করা চলিত। কিন্তু সংস্কৃতে সম্প্রদান-কারক দ্বারা উদ্দেশ, নিমিত্তও বুঝায়। এই অর্থ করণ কি অপাদান কি অধিকরণ কারকে আরোপ করিয়া বিশেষ লাভ দেখি না। 'ব্রাহ্মণকে (বা ব্রাহ্মণে) দান কর,' সুপাত্রে কন্যা দান কর,' 'আমায় আশীর্বাদ করুন,' 'দেব দ্বিজে ভক্তি কর'—ইত্যাদি স্থলে কর্মকারক বলা যাইতে পারে। কিন্তু, 'অনুসন্ধানে চলিলাম,' 'যুদ্ধে যাইতেছেন', 'ঠাকুর-দর্শনে গিয়াছেন,' এবং রাঢ়ের 'জলকে যাই,' 'তেলকে যাই'—ইত্যাদি স্থলে নিমিত্ত অর্থ স্পষ্ট। 'গান শুনিতে ভাল বাসি,' 'পড়িতে বসি,' 'খেলিতে যাই' ইত্যাদি বাক্যে শুনিতে পড়িতে খেলিতে—শুনি পড়ি খেলি ক্রিয়া শব্দে নিমিত্তার্থে তে বিভক্তি। এরূপ পদ সম্প্রদান কারকও মনে করা যাইতে পারে। 'আমার নিমিত্তে,' 'তোমার জন্যে,' 'সুখের তরে,' ইত্যাদির নিমিত্তে, জন্যে, তরে—সম্প্রদান কারকে এ বিভক্তি। 'টাকার লোভ'—টাকার সম্প্রদান কারক।

৷৴০ অপাদান-কারক দ্বারা স্থানান্তর-গতি, বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ, উৎপত্তি ইত্যাদি বুঝায়। এই কারক-পদের পরে হইতে, থেকে, চেয়ে, ইত্যাদি পদ প্রায়ই বসে। 'ঘর হইতে তাড়াও,' 'দূর হইতে মার,' 'বিপদ হইতে বাঁচাও,' 'তখন হইতে বলিতেছি,' 'এখন অবধি চেষ্টা কর।' 'আমার কাছে টাকা লও,' 'রাম চেয়ে শ্যাম বড়,' 'দুইএর মধ্যে বড় কে'? 'দশ জনের মধ্যে এক জন'। 'হিমালয়ে গঙ্গার উৎপত্তি,' 'বীজে গাছ হয়,' 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু,' 'টাকায় টাকা আসে,' 'পশ্চিমা মেঘে বৃষ্টি হয়'। কোন কোন স্থলে অপাদান ও করণ মিশিয়া যায়; যেমন 'তাহাঁর শাসনে সবাই ত্রস্ত,' 'রাগেরমুখে গালি দিয়াছে,'

'মাথার ঘায়ে পাগল,' 'যাতে হয় তা কর,' ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে অপাদান ও অধিকরণ মিশিয়া যায়; যেমন 'দুই বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছে,' 'তিন বৎসর পরে ফলিবে'।

॥৶০ অধিকরণ-কারক দ্বারা ক্রিয়ার স্থান আধার সময় বুঝায়। আধার স্থান হইতে অন্য কারকও আসিয়া পড়ে। 'প্রবাসে বাস,' 'বাড়ীতে আছেন,' 'সভায় বসিয়াছেন,' 'এ সময় (বা সময়ে) বাড়ীতে থাকেন না,' 'দশ বছরে পড়িয়াছে,' 'চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার গেল,' 'দুর্জনের সঙ্গে বাস,' 'হৃদয়ে মমতা,' 'সর্বজীবে দয়া,' 'উত্তরে প্রীত হইলাম,' 'প্রণয়ে বিচ্ছেদ,' 'সে বিষয়ে সন্দেহ নাই'। 'আগে চল,' 'পূর্বে বলিয়াছি,' 'বনে যাও,' 'ঘরে চল।' 'ঘর থাকিতে বাবই ভেজে,' 'দিন থাকিতে পথ কর,' 'দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা,' 'যাইতে যাইতে পথ ফুরায়,' 'পড়িতে পড়িতে পণ্ডিত,'—ইত্যাদি বর্তমান ক্রিয়াপদে তে করিয়া অবস্থা বুঝাইতেছে। 'বিপদে পড়িলে বুদ্ধি খোলে,' 'তুমি গেলে সে আসিবে'—ইত্যাদি পড়িল, গেল অতীত ক্রিয়াপদে অধিকরণে এ। 'আজিকে যাব,' 'কালিকে আসিবে,' 'তখনকে হইবে,' 'দুপরকে পঁহুছিবে'—ইত্যাদি উদাহরণে কে দ্বারা নির্দিষ্টকালের পূর্বে বুঝাইতেছে। 'দুপরকে পঁহুছিবে'—দুপর হবার পূর্বে; 'দুপরে পঁহুছিবে'—দুপর হবার সময়ে (পঁহুছিবে,) কিংবা পঁহুছিতে দুপর—দুই প্রহর সময় লাগিবে।

॥৴০ সম্বন্ধপদ বিশেষ্যকে বিশেষিত করে। স্বামীত্ব-সম্বন্ধই সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় থাকে না, অন্য সম্বন্ধে ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু যেমন সংস্কৃতে ষষ্ঠী-বিভক্তি দ্বারা করণ অপাদান সম্প্রদান অধিকরণ বুঝায়, বাঙ্গালাতেও র বিভক্তি দ্বারা প্রায় সব কারক বুঝায়। কেবল র বিভক্তি দেখিলে চলিবে না; অর্থ দেখিয়া অনেক স্থলে কারক বুঝি। বিশেষণ সম্বন্ধ,—যেমন, 'সুখের দিন', 'গুণের ভাই', 'দুধের ছেলে', 'রাজার ধর্ম', 'দুইএর ঘর'। স্বামীত্ব সম্বন্ধ,—'রামের বাড়ী', 'আমার কলম', 'তোমার বই'। কর্তা সম্বন্ধ,—'বিবাহের বর', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'আমার লেখা', 'তোমার পড়া বই'। কর্ম সম্বন্ধ,—'বিদ্যার আলোচনা', 'পড়িবার কেতাব'। করণ সম্বন্ধ,—'বেতের প্রহার', 'মাটির ঘর'। সম্প্রদান সম্বন্ধ,—'তাহার পাকে', 'কলিকাতার পথ দক্ষিণে', 'এক ক্রোশের পথ'। অপাদান সম্বন্ধ,—'বাঘের ভয়', 'সোনার খনি', 'মহিষের ঘৃত'। অধিকরণ সম্বন্ধ,—'সে বাটীর মঙ্গল', 'দেশের লোক', 'বসিবার আসন'। সম্বন্ধ পদ দ্বারা আরও নানা অর্থ প্রকাশিত হয়। যথা, নির্ধারে, 'ভালর ভাল', 'বাছার বাছ', 'গুণীর শ্রেষ্ঠ'। অভেদে, 'জ্ঞানের দীপ', 'ধর্মের নৌকা'। বিশেষণের সহিত সম্বন্ধ, 'তোমার সমান', 'রামের তুল্য', 'সীতার সহিত', 'আমার প্রিয়', 'তোমার রুচিকর'। এইরূপ, 'ইহার উপরে নীচে মধ্যে পূর্বে, প্রতি' ইত্যাদি। 'কিছু পরে,' 'একটু আগে',—'কিছুর পরে', 'একটুর আগে'। ইত্যাদি।

৮০ এখন বিভক্তি ভাগ করা সহজ। দেখা যায়, কারকের বিভক্তি অত্যল্প, ই এ য় কে তে র রা। এগুলির মধ্যে ই এ য় একই; এবং উচ্চারণের সুবিধার নিমিত্ত তে স্থানে এতে

র স্থানে এর, রা স্থানে এরা, এবং স্থলবিশেষে কে স্থানে একে হয়। সম্বন্ধে কার বিভক্তিও আছে; তদ্বিষয় পরে দেখা যাইবে। দ্বারা দিয়া হইতে থেকে চেয়ে লেগে জন্যে তরে প্রভৃতি বিভক্তি নহে, এক এক পদ। এই সকল পদ পরে থাকিলে সহজে কারকজ্ঞান হয় বটে, কিন্তু 'বিভক্তি' (=পদের অংশ) বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে।

ই বিভক্তি কেবল সর্বনাম শব্দের কর্তাকারকের এক বচনে, এবং রা এরা নাম শব্দের কর্তাকারকের বহুবচনে বসে। পূর্বে এবিষয় দেখা গিয়াছে। র বিভক্তি কেবল সম্বন্ধ পদে লাগে। কিন্তু সম্বন্ধ পদের মধ্যেও নানা কারকের অর্থ আছে। কে বিভক্তি কর্তা, সম্প্রদান অধিকরণ, বিশেষতঃ কর্মে লাগে। তে কর্ম ব্যতীত অন্য কারকে, এবং এ যাবতীয় কারকে লাগে। সুতরাং বিভক্তি ধরিয়া কারক-নির্ণয় অসম্ভব।

৮/০ বিভক্তির প্রয়োগ-সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে। কর্তাকারকে নামপদে বিভক্তি প্রায়ই লাগে না। অর্থাৎ শব্দের যে রূপ, কর্তাকারকেরও সেই রূপ। শব্দটি জাতিবাচক হইলে তাহা বহুবচনেরও রূপ। বিশেষ ধর্ম প্রকাশ করিতে হইলে জাতিবাচক বিশেষ্যে বিভক্তি আবশ্যক হয়। প্রকৃত ব্যঞ্জনান্ত এবং উচ্চারণে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে এ, অ আকারান্ত শব্দে য় তে, অন্য স্বরান্ত শব্দে এ তে। মনুষ্য-বাচক শব্দে তে যোগ গ্রাম্যতা। যথা, লোকে বলে, মূর্খে করে, মানুষে পারে, দেবতায় করে। 'গোরু ঘাস খায়', এবং 'গোরুতে ঘাস খায়',—দুই-এর অর্থ এক নহে। সব সকল উভয় নিজ—সবে সকলে উভয়ে নিজে হয়। এইরূপ পরস্পর। জন শব্দও কতকটা এইরূপ। দুইজন গিয়াছে, দুইজনে গিয়াছে—অর্থ এক নহে।

পরস্পর অর্থ বুঝাইলে দুইটি কর্তার দ্বিতীয়টিতে বিভক্তি লাগে। যথা, গুরু শিষ্যে পরামর্শ করিতেছে। দুইটির কর্তৃত্ব প্রকাশ করিতে হইলে দুইটিতেই বিভক্তি লাগে। 'মায়ে ঝীয়ে ঝগড়া করিতেছে', 'তোমায় আমায় বিবাদ করি'—এখানে এ স্থানে য়।

গুণ ও ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যে কর্তার বিভক্তি থাকে না। যথা, তাঁর দয়া আছে, আপনার যাওয়া হবে।

৮৶০ কর্মকারকের বিভক্তি কে বটে, কিন্তু প্রায়ই থাকে না। কর্মকে বিশেষ করিয়া বলিবার সময় কে লাগে, নতুবা নহে। এইহেতু 'ছেলে লও' 'ছেলেকে লও', 'কবিরাজ দেখাও' 'কবিরাজকে দেখাও', 'গোরু চরাও' 'গোরুকে চরাও', ইত্যাদি উদাহরণের দুই রূপে অর্থের প্রভেদ আছে।

অচেতন পদার্থ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী-বাচক বিশেষ্যে কর্মকারকে কে কখনও লাগে না। যথা, কাপড় তোল, কলম রাখ, ছারপোকা মার। বিশেষ করিতে হইলে টা খান জুড়িতে হয় 'কাপড়-খান তোল', 'কলম-টা রাখ', 'ছারপোকা-টা মার'। বহুবচনেও বিভক্তি থাকে না। 'বইগুলা রাখ।'

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার গৌণকর্মে বিভক্তি থাকে, মুখ্যে থাকে না। যথা, সে কথা রামকে

বলিবে, গোরুকে জল খাওয়াও, গাছে জল দেও। 'গাছে' কর্মকারক, কারণ দি ধাতু দ্বিকর্মক। 'গাছকে' না বলিয়া 'গাছে'—অর্থাৎ কে স্থানে এ। তু° আমাকে আমায় (আমাএ)। *'দিনকে রাত, রাতকে দিন করে', 'ধরাকে শরা জ্ঞান করে'*—ইত্যাদিতে কে বস্তু নির্দেশ করিতেছে। 'ঠাকুর দর্শন করা', 'বৃক্ষ ছেদন করা', 'অন্ন ভোজন করা',—ইত্যাদি উদাহরণের 'করা'র কর্ম লইয়া বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-লেখকেরা একমত নহেন। কেহ বলেন, দর্শন করা ছেদন করা, ভোজন করা—একসঙ্গে ক্রিয়া, এবং ঠাকুর বৃক্ষ অন্ন কর্মকারক। কেহ বলেন, 'করা'র কর্ম দর্শন ছেদন ভোজন, এবং ঠাকুর বৃক্ষ অন্ন সম্বন্ধ পদ। অর্থাৎ ঠাকুরের দর্শনকে করা। কিন্তু দর্শন করা—দেখা, ঠাকুর দর্শন করা—ঠাকুর দেখা ; ঠাকুর স্পষ্ট কর্ম। 'দর্শন করা'—একসঙ্গে ক্রিয়া মনে করিলে দোষ হয় না। ঠাকুর দর্শন—ঠাকুরকে দর্শন। এই ভাবে দেখিলে 'দর্শন' কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের কর্ম 'ঠাকুর'। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। কেবল সকর্মক ধাতুর কৃদন্ত শব্দের পরে 'কর' বসে ; সুতরাং কোথাও গোলযোগ হয় না। কিন্তু যদিও কেহ বলে না ঠাকুর দৃষ্ট করিল, অন্ন ভুক্ত করিল, তথাপি বৃক্ষ ছিন্ন করিল, ধন বিনষ্ট করিল ইত্যাদি উদাহরণ লেখার ভাষায় পাওয়া যায়। 'ছিন্ন করিল' 'বিনষ্ট করিল', ইত্যাদি পণ্ডিতী ভাষা। 'ধন বিনষ্ট—ইহা করিল',—এইরূপ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

৬৶৹ (রাঢ়ে) আমাকে বল, তোমাকে দিব। কখন কখন আমায় বল, তোমায় দিব। বঙ্গের কোন কোন স্থানে আমারে বল, তোমারে দিব। প্রাচীন ও আধুনিক পদ্যে আমারে তোমারে পাওয়া যায়। শূন্যপুরাণে কর্মকারকে ক কে এ রে—চারি রূপই পাই। আসামীতে কর্মকারকে ক। উত্তর বঙ্গে (মালদহে) অদ্যাপি ক আছে। যশোরে 'আমারগে' 'তোমারগে'—কর্ম ও সম্বন্ধ দুই-ই প্রকাশ করে। বরিশালে 'আমারগো' বা 'মোগো', 'তোমারগো', বা 'তোগো আমাদের ও আমাদিগকে, তোমাদের ও তোমাদিগকে। কোন কোন স্থানে তাদেরে না বলিয়া তাদের ; যেমন, তাদের কেহ বলে না—তাদিকে। 'তাদের'—সম্বন্ধ পদ কি কর্ম কারক সহজে বোঝা যায় না। বোধ হয় এইহেতু 'তাদেরকে বলিও'—এমন অদ্ভুত গ্রাম্য পদও হইয়াছে। এইরূপ, দিকে বা দিগে পরিবর্তে দেরে, দের, দেরকে, দেরকেরে, রারে, রগে, রগো, ঘরক, গরক ইত্যাদি নানা গ্রাম্য রূপ প্রচলিত আছে। হুগলী জেলার পূর্বাংশে ভদ্রলোকেও বলেন, তাঁদে ঘরে বা তাঁদের ঘরে বলিয়াছে—অর্থাৎ তাঁদিকে। বোধ হয় তাঁদিগরে (তাঁদিগকে) হইতে 'তাঁদেগরে—তাঁদে ঘরে' বা 'তাঁদের ঘরে' আসিয়াছে। পাবনায় এইরূপ। সুখের বিষয় অপভ্রষ্ট রূপ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। *

---

* তোমারে আমারে, তোমাএ আমাএ, ইত্যাদির সাদৃশ্যে কবি মধুসূদন কর্মকারকে সর্বনাম ব্যতীত অকারান্ত বিশেষ্য পদেও রে স্থানে এ দিয়াছেন। যথা, বাঁচালে দাসীরে ; হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী। কিন্তু, কহ দাসে, নাশিবে লক্ষ্মণ মেঘনাদ শূরে, আবরিতে গগনে, সেবি অহঃরহঃ দেবেন্দ্রে, ইত্যাদি। এইরূপ প্রয়োগ বঙ্গভাষায় একেবারে নূতন। ক্রিয়াপদেও মধুসূদন বঙ্গভাষার রীতি মানেন নাই। শান্তিলা জলধি (জলধি শান্ত হইল),

১৲ অধিকরণ কারকে অকারান্ত, ব্যঞ্জনান্ত এবং উচ্চারণে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে এ, আকারান্ত শব্দে য় তে, অন্ত স্বরান্ত শব্দে তে (কদাচিৎ এ) হয়। কাল-বাচক শব্দের এবং গমনার্থক ক্রিয়ার অধিকরণে স্থান-বাচক শব্দের বিভক্তি বিকল্পে লুপ্ত হয়। 'তিনি কাল বাড়ী এসেছেন,' 'এ সময় তিনি থাকিলে'। 'বাড়ীতে এসেছেন,' 'এ সময়ে থাকিলে'—বলিবার সময় 'বাড়ী' ও 'সময়' বক্তার বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু এরূপ বলা চলে না (রাঢ়ে), 'তিনি বাড়ী নাই,' 'তিনি বাড়ী আছেন'; কিন্তু বলা চলে 'লোকের বাড়ী দুর্গা পূজা হয়'। 'ঘর যাও,' 'বাড়ী এস,' 'কলিকাতা যাইতেছি,' 'বর্ধমান চলিলাম' ইত্যাদি উদাহরণে 'ঘর' 'বাড়ী' প্রভৃতি গমনার্থক ধাতুর কর্ম বিবেচনা করা চলে। রাঢ়ে অনেক স্থলে কর্মকারকের কে বসে। যথা, ঘরকে যাও (সং গৃহং যাহি), ঘরকে এস, সেথাকে যাও, এথাকে এস। ওড়িয়াতেও এইরূপ; ঘরকু যাঅ, বনকু পলা (বনে পলাও)। বাঙ্গালা 'আজকে যাব,' 'কালকে বলিব' ইত্যাদি উদাহরণেও অধিকরণে কে পাই। চণ্ডীদাসে, 'আজুক শয়নে ননদিনী সনে শুতিয়া আছিনু সই।' অন্যত্র, 'সে ধন পাইলে ঘরকে যাই।' জ্ঞানদাসে, 'ঘরকে গেলে কি বলিব মায়।' মাণিকে, 'মথুরাকে যায় দধি বিক্রয় করিতে।' অর্থাৎ অধিকরণ বিশেষ করিতে হইলে কে। 'ঘরে যা,' 'ঘরকে যা'—অর্থে অবিকল এক নহে। অকারান্ত বিশেষণ এবং আকারান্ত শব্দে য় হয়। 'ভালয় ভালয় পঁহুছিতে পারিলেই মঙ্গল' 'ছোটয় বড়য় তামাশা'। যেখানে য় পরে ও কিংবা ই বসাইতে হয়, সেখানে তে আবশ্যক। রাঢ়ে এইরূপ। যথা, তার কথাতেই হবে। কোন কোন লেখক ভাষায়ও ভাষায়ই লিখিয়া অকারণে পঠনক্লেশ বৃদ্ধি করেন।

১/০ করণ কারকেও এ তে হয়। 'জালে মাছ ধরে,' 'আগুনে পোড়ে,' 'ছুরীতে কাটে।' চণ্ডীদাসে, 'কাটারিতে যেন কাটে।' 'কাটারিতে' এবং 'কাটারী দিয়া'—কাটার অর্থ অবিকল এক নহে। অকস্মাৎ 'কাটারীতে,' ইচ্ছায় 'কাটারী দিয়া।' অর্থাৎ করণ বিশেষ ভাবে বলিতে হইলে এ তে না দিয়া দ্বারা দিয়া যোগ করিতে হয়। দ্বারা শব্দ একেবারে সংস্কৃত করণ কারক, অর্থ দ্বার—উপায়—করিয়া। 'আমা দ্বারা এ কাজ হবে না'—আমার দ্বারা। কিন্তু 'আমা তোমা তাহা যাহা ইহা দ্বারা' লেখা ও বলা বর্তমান রীতি হইয়াছে। বাং দি (এবং সং দা) ধাতু হইতে দিয়া পদ হইয়াছে কি না সন্দেহ। ওড়িয়াতে দেই (দিয়া)। বোধ হয় সং আ-দা ধাতু হইতে বাং দিয়া আসিয়াছে। 'লাঠী দিয়া মার'—লাঠী আদান বা গ্রহণ করিয়া। 'পথ দিয়া চল,' 'কটক দিয়া পুরী গেল' ইত্যাদি স্থলে সং দা ধাতু মনে করা কঠিন। 'আমাকে দিয়া কাজ হবে না'—আমাকে উপায় গ্রহণ করিলে। করণ কারকের পরে দ্বারা ও দিয়া পাই, পৃথক পাই না। অতএব এই দুই শব্দ করণের প্রত্যয় মনে করা অন্যায় নহে। সে কালের পণ্ডিতী বাঙ্গালায় কর্তৃত্ব বুঝাইতে 'কর্তৃক,' করণ বুঝাইতে 'করণক,' হেতু বুঝাইতে

কল্লোলিল (জলধি কল্লোল করিল), বিনাবিলা বেণী (বিনাইলা), আস্ফালিল হয়-বৃন্দ; ঝন্‌ঝনিল কৃপাণ (ঝন ঝন করিল), মর্মরিয়া পাতাকুল (পাতাকুলকে মর্মর ধ্বনি করাইয়া), ইত্যাদি। ক্রিয়াপদ দেখিয়া সকর্মক অকর্মক বুঝিতে পারা যায় না। ইহাই প্রধান দোষ।

'প্রযুক্ত' ও 'বিধায়' শব্দ বসিত। যথা, 'সূত্রধর-কর্তৃক কুঠার-করণক সে কাষ্ঠ ছিন্ন হইয়াছে। রজ্জু-করণক বদ্ধ আছে যে অশ্ব তাহাকে মুক্ত কর, তিনি তীক্ষ্ণ অসি-করণক তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।' (শ্যামাচরণের ব্যাকরণ)। অর্থাৎ পদের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া যাইতে হইত সে পদের কি কারক বুঝিতে হইবে। কর্তৃক, সেকালের কর্তা-কারক-জ্ঞাপক সঙ্কেত। আশ্চর্যের কথা বাঙ্গালার এই বিকাশের দিনেও সভাপতি-কর্তৃক পঠিত সম্পাদক-কর্তৃক লিখিত মুদ্রাকর-কর্তৃক মুদ্রিত ইত্যাদি, অদ্ভুত বাঙ্গালা চলিতেছে।

১৶০ সম্প্রদান ও অপাদান কারকের পৃথক্ বিভক্তি নাই। সংস্কৃত-প্রাকৃতেও সম্প্রদান কারকের পৃথক বিভক্তি ছিল না, ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা সম্প্রদান কারকের কাজ চলিত। পৃথক্ বিভক্তি নাই বলিয়া কারক নাই বলিতে পারা যায় না। এ বিষয় পূর্বে দেখা গিয়াছে। বাঙ্গালাতে এ তে কে এই তিন বিভক্তি প্রায় সকল কারকে লাগে, অথচ কর্তা কর্ম করণ অধিকরণ অন্ততঃ এই চারি কারক কেহই অস্বীকার করেন না। এ তে কে দিয়া সম্প্রদান; অপাদান কারকে কদাচিৎ এ বসে। 'ছাতে জল পড়ে'—ছাত দিয়া বা ছাত হইতে। 'গাছ হ'তে ফুল পাড়,' 'গাছে হ'তে ফুল পাড়'; 'ঘর হ'তে চুরি,' 'ঘরে হ'তে চুরি';—অর্থে ঈষৎ প্রভেদ আছে। বিশেষ উল্লেখে বিভক্তি, নতুবা নহে। অপরাপর কারকের পক্ষেও এই নিয়ম। নিমিত্তার্থে ও হেত্বর্থে এ তে প্রচুর পাওয়া যায়। করাতে, যাওয়াতে—হেত্বর্থে তে। রাঢ়ে নিমিত্তার্থে কে বিভক্তিও হয়। যথা, বেলা গেল জলকে যাই (সং জলায় যামি),—জলের নিমিত্তে। 'তেলকে লোক পাঠাও'—তেলের নিমিত্ত; 'তাঁকে দাঁড়াইয়া এস'—তাঁর নিমিত্ত বা তাঁর ভয় দূর করিতে। ওড়িয়াতেও এইরূপ আছে। জলকু, তেলকু—জলের, তেলের নিমিত্ত। ওড়িয়া খাইবাকু (খাইবার নিমিত্ত), যিবাকু (যাইবার নিমিত্ত), এবং বাঙ্গালা খাইতে যাইতে এক শ্রেণীর। এ বিষয় কৃৎপ্রত্যয় প্রকরণে দেখা গিয়াছে। রাঢ়ে 'কিসকে যাবে'—কেন বা কি নিমিত্তে। 'কিসে হাত কাটিয়াছে,' 'কিসে যাবে,'—কিসে করণ-কারক। কিসে হাত কাটিয়াছে—কি সেটা যেটায় হাত কাটিয়াছে। ওড়িয়া কিস্, সং প্রাকৃতে কিস্; স স্থানে হ-য় হইয়া আ'তে কিয়। বা' কেন—অবিকল সংস্কৃত রূপ। রাঢ়ের কিস্‌কে, ওড়িয়া কিসকু, কাহিঁকি, হিন্দী কাহে-কো। এই কে কি কু কো নিমিত্তার্থে কে, এবং বোধ হয় সংস্কৃত 'কৃত' (প্রয়োজন) শব্দের বিকারে আসিয়াছে। কিসকে—কি প্রয়োজনে, জলকে—জল প্রয়োজনে। কৃত্তিবাসে (লং), 'না থোবেন তোর বিচকে বাগুন।' মাণিকে, 'বীচকে বেগুন ক্ষেতে না রাখিবে আর।' অর্থাৎ বীজের নিমিত্তে বা বীজ প্রয়োজনে। 'লাঠিকে লাঠি ছাতাকে ছাতা'—লাঠিকে—লাঠির প্রয়োজন হইলে। 'তোমাকে প্রণাম করি,' 'তোমায় গড় করি'—তোমার উদ্দেশে প্রণাম, গড় করি। 'করি' ক্রিয়ার কর্ম 'তোমাকে' বা 'তোমায়' মনে করা চলে না। 'তোমাকে ধন্য,' 'তোমায় আশীর্বাদ',—'তোমাকে,' 'তোমায়' কর্মকারক বলিলে অর্থ হয় না। রাঢ়ের সাধারণ লোকে নিমিত্ত অর্থে 'জন্তে,' 'লেগে' (লাগিয়া), 'তরে' বলে। পণ্ডিতেরা 'নিমিত্তে' অধিক বলেন। কেন শব্দও 'কেনে';

যথা, চণ্ডীদাসে, 'রাই এমন কেনে বা হলো।' বাস্তবিক দেখিতে গেলে এ বিভক্তি যোগে নিমিত্তে, জন্যে, ইত্যাদি। 'বিদিতার্থে লিখিলাম'—এ বিভক্তি। কৃত্তিবাসে 'তরে' কর্মকারকের বিভক্তি পাই। যথা, 'ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল নারদের তরে'—নারদকে; 'সভাকার তরে'—সবাকে। থেকে—থাকিয়া, লেগে—লাগিয়া, চেয়ে—চাহিয়া, তরে—তরিয়া বুঝিতে পারি; কিন্তু 'হইয়া'—'হ'য়ে' না হইয়া 'হইতে।' এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

১৶০ সম্বন্ধ পদে র এর। শব্দ এক অক্ষরের হইলে, ব্যঞ্জনান্ত হইলে, অকারান্ত বিশেষ্য হইলে, কিংবা শব্দের শেষ অক্ষর স্বর হইলে এর, অন্যত্র র। অথবা, একের অধিক অক্ষরের এবং অ ভিন্ন স্বরান্ত শব্দের পরে র। যথা, ক-এর, মা-এর, গাঁ-এর; কাজের, সুন্দরের, দুঃখের, দেহের; ভাইএর, জামাইএর, সইএর, দুইএর, বউএর; কিন্তু, গঙ্গার, মনসার, নদীর, বধূর, ছেলের, বুনোর। অকারান্ত বিশেষণের পরে র হয়। যথা, ভালর, মন্দর, ছোটর, কালর উপর কাল, তেরর ঘরে। মানুষের নাম স্বরান্ত হইলেও র হয়। যথা, অমূল্য-র বাসা, অনন্ত-র বই, প্রসন্ন-র পুত্র, প্রিয়-র খুড়া, হর-র পিসী, সুর-র মাসী। কদাচিৎ মহেন্দ্রের, অনন্তের ইত্যাদি পদও শোনা যায়।

১৷০ সম্বন্ধ পদের আর এক বিভক্তি, কার আছে। যথা, এখানকার, কোন্‌খানকার, সেদিক্‌কার, কোথাকার, ভিতরকার, এখনকার, সেদিনকার, আজিকার, আগেকার প্রভৃতি দিক ও কালবাচক শব্দে কার বসে। 'এখনের, তখনের কথা' হয় না, এখনকার, তখনকার। 'পূবের জালানা' 'পূবদিককার জালানা,' 'সেদিনের কথা' 'সেদিনকার কথা' অর্থে একটু বিশেষ আছে। কৃত, ভূত, ঘটিত অর্থ না হইলে কার বসে না। 'এখানকার মঙ্গল'—এখানে ঘটিত ব্যাপার ভাল; 'সেদিনকার কথা'—সে দিনে যে কথা ভূত বা উৎপন্ন হইয়াছিল; 'পূবদিককার দরজা'—পূবদিকে যাহা না থাকিলে চলিত না। পুরানা বাঙ্গালার 'আপনকার' —এখন 'আপনার' হইয়াছে। 'আপনকার'—আপনি যাহার উৎপাদক। এইরূপ, 'একজনকার,' 'সকলকার,' পুরানা বাঙ্গালা 'সভাকার' (সবাকার) ইত্যাদিতে একজন-কৃত, সকল-কৃত, অর্থ হইতে সামান্য সম্বন্ধ-অর্থও আসিয়াছে। কেহ কেহ 'সত্য ঘটনা' না বলিয়া 'সত্যকার (সত্তিকার) ঘটনা' বলে। 'সত্যকার'—যেন সত্যকালে বা যুগে ঘটিত। এইহেতু 'মিথ্যাকার' হইতে পারে না। যেখানে কাল বা দিক বিশেষ লক্ষ্য হয় না, সেখানে কার বসে না। ইহাই কার প্রয়োগের নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। 'চারি জনকার খাবার'—যেন সংখ্যা বিশেষ লক্ষ্য; 'চারি জনের খাবার'—চারি জন অপেক্ষা কম বা বেশী লোকের খাবার। কার বিভক্তির উৎপত্তি পরে দেখা যাইবে।

১৷৶০ সম্বোধনে শব্দের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ সম্বোধনের বিভক্তি নাই। সংস্কৃত শব্দের সম্বোধনে সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মে লিখিত ভাষায়, হে নারি, জগদম্বে, রাজন্‌, ব্রহ্মন্‌, পিতঃ, মাতঃ ইত্যাদি হয়। কিন্তু, লিখিত ভাষা এখানে আলোচ্য নহে। শিক্ষা-অধ্যায়ে আদরে ও অনাদরে ডাক-নাম সংক্ষেপ ও বিকারের নিয়ম পাওয়া গিয়াছে। এখানে সম্বোধনের

অব্যয় লেখা যাইতেছে। অব্যয়ের পরে কিংবা পূর্বে কোন শব্দ থাকিলে, হে গো গা রে রা লো লা। যথা, কি হে ভাই, ভাই হে; ঠাকুর গো, সখিরে, চল লো চল, ইত্যাদি। অন্য শব্দ না থাকিলে, অহে অগো অরে অলো। প্রশ্নে, অহে হেঁহেঁ হেঁরে হেঁরা হেঁলো হেঁলা হেঁগো হেঁগা। বাঙ্গালাভাষায় আদরে ওষ্ঠদ্বয় কাছে কাছে আসে, অনাদরে দূরে যায়। সম্বোধনে আদরে ও (যেমন গো, লো), অনাদরে আ (যেমন গা লা)। পুরুষের মধ্যে সম্ভ্রমে গো, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কিংবা দুই সমবয়স্কে হে, * অন্যত্র গা রে রা। এক নারী অন্য নারীকে সম্ভ্রমে গো, জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কিংবা দুই সমবয়স্কায় লো, অনাদরে লা। সম্ভ্রমে স্ত্রীকে পুরুষ, পুরুষকে স্ত্রী গো। খেদে গো; যথা, চণ্ডীদাসে, 'কহে সুবদনী শুনগো সজনি, দুঃখ কি বলিব আর।' পরিহাসে লো; যথা, 'নাপিতিনী কহে শুন লো সই। অনাথী জনের বেতন কই॥' মধুসূদনে, 'যা লো তুই সৌদামিনী-গতি। দেখ লো সখি চাহি লঙ্কাপানে।' খেদে রে; যথা, চণ্ডীদাসে, 'হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।' বাৎসল্যে পুরুষ স্ত্রীজাতিকে রে; কন্যাকে পিতা রে বলিয়া সম্বোধন করেন। স্ত্রী উপহাসে পুরুষকে রে, আরে। যথা, চণ্ডীদাসে, 'ভাল হৈল আরে বঁধু আইলা সকালে।' এইরূপ পুরুষকে পুরুষে। বিপদে রে; যথা, বাবারে, বাপরে, মারে। দেবতা সম্বোধনে গো, হে। অভিমান ও নিন্দায় গা। অনির্দিষ্ট কিংবা দূরবর্তী ব্যক্তি সম্বোধনে অ ও ঔ অই আই এই হৈ ঐ।

১৪৫। শব্দ-বিভক্তির মূল-নির্ণয়।

/০ বাঙ্গালায় বিভক্তি এ কে তে র রা। উৎপত্তি কি?

প্রথমে সম্বন্ধ পদের বিভক্তি দেখি। এ বিষয়ে আসামী বাঙ্গালা এক। কেবল বাঙ্গালা ভাষা না দেখিয়া ওড়িয়া হিন্দী ও মরাঠী ভাষাও দেখা যাউক। বা° মানুষের, ও° মানুষর, হি° মানুষকা, ম° মানুষাচা। এখানে র ক চ। স স্থানে চ, এবং চ স্থানে ক হইতে পারে। অতএব স° স্য, সংপ্রাকৃত স্স হইতে ম° চা, হি° কা আসিয়া থাকিবে।

৵০ কিন্তু, ওড়িয়া ও বাঙ্গালার র পাইলাম না। ওড়িয়াতে বহুবচনে (মাঝে, বিশেষে) 'মানুষঙ্কর'। এখানে ক, কর পাইতেছে। শূন্যপুরাণে পাই 'তামাকর'—তামার, 'রূপাকর' —রূপার। আমরা অদ্যাপি অনেক শব্দে প্রাচীন কার বিভক্তি দিয়া থাকি। আপনকার, আজিকার, যেখানকার ইত্যাদিতে প্রাচীন কার। বিদ্যাপতিতে, 'তাকর মূলে দিনু দুধক ধার' —সম্বন্ধে ক এবং কর দুইই পাইতেছি। 'তাকর'—ও° 'তাঙ্কর,' বা° 'তার' বা 'তাহার'। প্রাচীন আসামীতে 'যা কেরি,' 'তা কেরি'—যাহাঁর, তাহাঁর অর্থে পাই। সম্বন্ধে ক ও পাই। যথা, বেদক বাণী—বেদের বাণী, গোবিন্দক নামা—গোবিন্দের নাম। বিহারীতে ক; যথা, দেশক—দেশের। মালদহে অদ্যাপি ক আছে। মৈথিলীতে র হইয়াছে। হিন্দীতে কা

* কবি-মধুসূদন হে অপ-প্রয়োগ করিয়া লিখিয়াছেন, 'সুধিলা প্রভু;—কি হেতু সুন্দরি, কাতরা তুমি হে আজি।' শিব, গৌরীকে বলিতেছেন। সীতাকে রামচন্দ্র বলিতেছেন, 'এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে, হেমাঙ্গি!'

যেমন আছে, তেমনই মেরা তেরা, হমারা, তুম্হারা আছে। অর্থাৎ সামান্ত বিভক্তি কা সর্বনামে হইয়াছে রা, যেন কা রা মূলে এক।* বিদ্যাপতির 'হাতক দরপন', হিন্দীতে 'হাথকা', মরাঠীতে 'হাতচা,' প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হাথর,' বর্ত্তমান বাঙ্গালায় 'হাতের,' ওড়িয়া আসামী 'হাতর'। সংস্কৃত বিভক্তি স্য হইতে চা কা উৎপন্ন বুঝিতে পারি, কিন্তু র কিংবা কর বিভক্তি পাই না।

সং ঈয় তদ্ধিত প্রত্যয় স্থানে সং-প্রাকৃতে কোন কোন শব্দে কের হইত। সং রাজকীয়— সং-প্রা° রাঅকের। ইহাতে এমন বুঝায় না, কের শব্দের মূল ঈয়। কারণ কোথায় ঈয়, আর কোথায় কের ? কেহ কেহ অনুমান করেন, সং কৃত শব্দের অপভ্রংশে কের আসিয়াছিল। পূর্ব্বে (২০৪ পৃঃ) আমরা এই কৃত হইতে বাঙ্গালা হেত্বর্থে কে অনুমান করিয়াছি। কৃত হইতে কের, কার, কর অনুমান করিতে পারি। কিন্তু বাঙ্গালা আসামী ওড়িয়ার র বিভক্তিও কি সেই কার হইতে ? কা লোপে র থাকিতে পারে। কিন্তু কের হইতে মরাঠী বিভক্তি চা পাই না। এ কথাও সত্য, সংস্কৃত-প্রাকৃত সর্বত্র এক ছিল না, এবং সকল ভাষা যে একই প্রাকৃত অপভ্রংশের বিভক্তি লইবে, এমনও মনে করিতে পারা যায় না। সম্বন্ধের বিভক্তির মূল কের ছিল, হয়ত আর কিছু ছিল। বোধ হয় প্রথমে স্বার্থে ক ছিল, তার পর তাহাতে র যুক্ত হইয়া কর, কের, কার হইয়াছে। সং কস্য স্থানেও কার আসিতে পারে। তু° লিখিতং শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কস্য কর্জপত্র মিদং—মুখোপাধ্যায়ক-স্য—মুখোপাধ্যায়কর—মুখোপাধ্যায়কার কিংবা মুখোপাধ্যায়র। অর্থাৎ স্য স্থানে র আসিতেছে, ক স্বার্থে। শূন্য পুরাণে তামা অর্থে তামাক, এবং সম্বন্ধে তামাকর আছে। ও°-তে জন-কর—(একজন-কার)—জনক-স্য। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের স স্থানে বা°-তে র মাত্র-দুই-চারিটা শব্দে পাই। এই কারণে সং স্য হইতে বা° র, এই অনুমান দুরূহ হইতেছে।

সং-প্রাকৃতে দ্বিবচন ছিল না। ষষ্ঠীর এক বচনে স্স, বহুবচনে ণ ছিল। অনেক পুংলিঙ্গ শব্দের এক বচনেও ণ ছিল। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ ও সর্বনাম শব্দের কেবল বহুবচনে ণ পাই। বোধ হয়, এই ণ বাঙ্গালা ওড়িয়া আসামীর র হইয়াছে। অস্মদ্ শব্দের বহুবচনে সং প্রাকৃতে অম্হাণং মহাণং, যুষ্মদ্ শব্দের তুম্হাণ তুমাণ। অম্হাণ—অম্হার—আমার, তুম্হাণ —তুম্হার—তোমার। ওড়িয়াতে আম্ভর তুম্ভর, হিন্দীতে হমারা তুম্হারা। মরাঠীতে আমচা তুমচা। অতএব সং-প্রা° স্স হইতে মরাঠী চা, হিন্দীতে কা ; সং-প্রা° ণ হইতে বাঙ্গালা আসামী ওড়িয়া র ; এবং সং-প্রা° কের হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা কর ওড়িয়া ক্কর। অই ণ হইতে মরাঠীর লা ; যেমন ম° আপলা (আপনার)। আত্মন্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে সং-প্রাকৃতে অপ্পাণাণং—আপানার—আপনার, অনুরূপ অপ্পাণং মরাঠী আপলা। ণ স্থানে যে ড়, এবং

* সংস্কৃতে ক প্রত্যয় দ্বারা সম্বন্ধীয় বুঝাইতে পারে। যথা, মামক—আমার, যুষ্মক—তোমাদের, অস্মক—আমাদের ; তৃতীয়ক—তৃতীয়-দিবস-সম্বন্ধীয় ; অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রক—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ-বিশিষ্ট।

ড় স্থানে যে র ল হইতে পারে, তাহা শিক্ষাধ্যায়ে দেখা গিয়াছে। ফল কথা এই যে বাঙ্গালা বিভক্তির মূল এক নহে, অনেক।

৵০ এই সম্বন্ধের র হইতে কর্তাকারকের বহুবচনের রা আসা অসম্ভব নহে। আমার যাহারা—তাহারা 'আমরা', অর্থাৎ আমার+া—আমার-সম্বন্ধীয় (ব্যক্তিরা)। সং-প্রাকৃতে দেৱা, গিরিও বা গিরিণো, নঈও বা নঈআ (নদী), মাআ (মা), রাআ (রাজা) অহ্মে (আমি), তুম্হে (তুমি) প্রভৃতি প্রথমার বহুবচন। অর্থাৎ আ ও এ বিভক্তি। বা° আসা° ওঁ° হিঁ° মং-তে এ বহুবচনের বিভক্তি আছে। হিন্দীতে ভাইয়েঁ, হিন্দুওঁ প্রভৃতি ওঁ যোগে বহুবচন। বাঙ্গালাতে শুধু আ না হইয়া র আগমে রা। সংস্কৃতে নর শব্দের কর্তাকারকে বহুবচনে নরাঃ, অর্থাৎ বিভক্তি আঃ। ফার্সীতে বহুবচনের দুই বিভক্তি, একটি আন, যেমন সাহেব—সাহেবান (তুং সং ফলানি); অন্যটি হা, যেমন কলমহা=সং কলমাঃ, অস্‌পহা=সং অশ্বাঃ। কারণ যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে বহুবচনে আ।*

।০ বাঙ্গালায় কর্ম কারকের বিভক্তি কে। বিদ্যাপতিতে, 'ভানুক সেবি'—ভানুকে সেবি। শূন্যপুরাণে, 'আহ্মি জাক জনমাইব তাক দিও ঠাঁই।' এখানে জাক তাক—যাকে তাকে। তবে বর্তমান কে পূর্বকালে ক ছিল। আসামীতে অদ্যাপি ক আছে। বা° কে, ওঁ° কু, হিঁ° কো, মং স লা। চারিভাষায় ক, এক ভাষায় স লা, আশ্চর্য্য বোধ হয়।

সংস্কৃতে কর্মকারকে কিংবা অন্য কারকে ক ছিল না, কিন্তু ক স্বার্থে প্রচুর বসিতে পারিত। বাঙ্গালায় বহুস্থলে কর্মকারকে কে দিতে হয় না, অর্থাৎ কর্তা ও কর্মকারকের রূপ এক। পূর্বকালেও এই প্রকার হইত। সংস্কৃতেও অনেক শব্দের এক বচনে কর্তা কর্ম রূপে এক। সং প্রাকৃতেও তাই ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালায় স্বার্থে ক বসিত। শূন্যপুরাণে, 'গরুড়েক মুক্ত কৈল গাজন দুআরে'—গরুড় গাজন দুআর মুক্ত করিল। 'শ্রীরামক স্তুনিতে হইল ভবনদী পার'—শ্রীরাম (পূর্বকথা) শুনিয়া ভবনদী পার হইল। এইরূপ আর দুই এক স্থানে আছে। কর্মকারকে ক অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং উদাহরণের প্রয়োজন নাই। বোধ হয় পূর্বকালে যাহা স্বার্থে ক ছিল, কালক্রমে তাহা কর্মে বাঁধা পড়িয়াছে। অর্থাৎ কর্মকারকের ক বিভক্তি বাঙ্গালা আসামী ওড়িয়া হিন্দীর নিজস্ব, সংস্কৃত হইতে আগত নহে। বোধ হয় সং-প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে।

কোন কোন ভাষায় সম্বন্ধেও ক আছে। ইহাতে মনে হয়, সেই ক কর্মকারকেও গিয়া পড়িয়াছে। কথাটা হঠাৎ উড়াইয়া দিবার নহে। কারণ বঙ্গে কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ সর্বনামে কর্মকারকে রে বিভক্তি অত্যন্ত প্রচলিত আছে। 'আমারে দেও', 'তোমারে বলিব'

---

* নরাঃ পদে বিসর্গ আছে, এবং সজাত ও রজাত বিসর্গ স্থানে সংস্কৃতে র হয়। বা° বাহির, সং বহিস্ ব বহিঃ। বহির্গত। সং গোঃ বা° গোরু এই রকম দুই চারিটা পরিবর্তন দেখিয়া মনে হইতে পারে সং ঃ স্থানে বাং-তে র আসিয়াছে। কিন্তু যে বিসর্গ সং-প্রাকৃতে লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা হঠাৎ বর্তমান বাং-তে আসিবার কারণ কি? অন্য তিন ভাষাতেই বা নাই কেন?

ইত্যাদি প্রাচীন বাঙ্গালাতেও ছিল। এমন কি, সর্বনাম পদে কে অপেক্ষা রে অধিক ছিল। পার্সীতে রা কর্মকারক এবং সম্বন্ধপদ দুইএরই বিভক্তি। রে বিভক্তির র লোপে থাকে এ, ফলে 'আমাএ'—'আমায়'।* র লোপ এবং আগম কোন কোন ভাষায় এবং বাঙ্গাল শব্দ-বিশেষে সাধারণ। কিন্তু 'আমাকে' হইতে 'আমায়', কি 'আমারে' হইতে 'আমায়', তাহা স্থির করা কঠিন। মরাঠীতে কর্মকারকের বিভক্তি স লা সম্বন্ধপদের বিভক্তি চা লা অর্থাৎ এক। সং-প্রাকৃতে সম্প্রদান কারকের পৃথক বিভক্তি ছিল না, ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা সে কারকের কাজ হইত, এবং সেইরূপ মরাঠীতে হইয়া থাকে। মরাঠীতে সম্প্রদান এবং কর্মে কদাচিৎ তেঁ বিভক্তিও বসে। প্রাচীন ওড়িয়াতে না-কি কর্মকারকে তে ছিল। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন-সরূপ 'মো-তে' (আমাকে), 'তো-তে' (তো-কে) আছে। চ হইতে ত আসা বিচিত্র নয়। যাহা হউক, বাঙ্গালায় কর্মকারকে তে নাই, কিন্তু অন্যান্য কারকে আছে। এক বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কেমন ভিন্ন ভিন্ন কারক বুঝায়, তে তাহার এক দৃষ্টান্ত। তথাপি সংস্কৃত-মূলক বলিয়া সকল ভাষায় বিভক্তির পরস্পর সাদৃশ্য থাকার কথা।

ক, কা, কি, কু, কে, কো এক ক বর্ণের উচ্চারণ-সৌকর্যে আসিয়াছে। ওড়িয়াতে ঘরকু, কিন্তু নইকু নইকি—(নদী প্রতি) দুই-ই বলা চলে। বর্তমান আসামীতে কর্মকারকে ক, কিন্তু প্রাচীন আসামীতে 'যাঙ্ক্ করত নিত্য সেবা'—(যাহাঁকে নিত্য সেবা করিতেছেন) পাই। হিন্দীতে কা কো চলিত আছে। এইরূপ একই শব্দে স্বরবর্ণ যুক্ত হইয়া আজি আজ্, যেন যেনে, কেন কেনে, তবে তেবে, যবে যেবে ইত্যাদি হইয়াছে। বাঙ্গালাতে না নি, আসামীতে ন নি নে নো, ওড়িয়াতে ন নি, এইরূপ।

।/০ সংস্কৃতে অধিকরণে এ বিভক্তি; যেমন নরে। বাঙ্গালাতেও এ। প্রাচীন আসামীতে এ তে ত তিন রূপ পাই। কিন্তু তে বিভক্তির উৎপত্তি কি? শূন্য পুরাণে অধিকরণে ত তে পাই। 'জনমিল পরম হংস জলেত ভাসিল।' 'হাথত টাকার বাটি'—হাথেতে বা হাতে। 'জলেত' 'হাথত' ক্রমে 'জলেতে' 'হাতেতে' হইয়াছে। আসামে ও উত্তর বঙ্গে এখনও 'জলৎ'। প্রাচীন বাঙ্গালায় ক যেমন কর্তা কর্ম সম্বন্ধ এবং ক্রিয়াপদে বসিত, ত তেমনই পাদপূরণে বা কথার মাত্রা-সরূপে বসিত। শূন্য-পুরাণে ক্রিয়াপদের পরে, 'কেবা তুহ্মার মাতা পিতা কহত না উত্তর।' 'সংসার তরিবাত জদি'—যদি সংসার তরিবা বা তরিবে। চৈতন্য-চরিতামৃতে ত প্রচুর পাওয়া যায়। 'সামান্য বিশেষরূপে দুইত প্রকার।' 'তবে সে সকল লোকের হয়ত নিস্তার।' এই ত সংস্কৃত তু তুল্য ছিল। আমরা বলি 'যাবে ত?' 'যাবেনা ত কি?' 'হইল ত', 'তোমার ত সেই কথা', 'সেই ত করিলে', 'তাইত বটে', ইত্যাদি। সং জলে, বাং জলে, ওং জলে বা জলরে, হিং জলমেঁ, মং জলান্ত। হিং মেঁ—এঁ; মরাঠীতে আন্ত (সং অন্ত?) ব্যতীত ইঁ আঁ আছে। ওড়িয়াতে এ ব্যতীত রে আসিয়াছে। প্রাচীন আসামীতেও রে পাই। বাঙ্গালাতেও এ ব্যতীত তে আসিয়াছে। বাঙ্গালায়

* তু' শূন্যপুরাণে 'বাটাল তাম্বুল', 'বাটাজ তাম্বুল', 'বাটাএ তাম্বুল'—এই তিন রূপ আছে, অর্থ বাটার তাম্বুল।

প্রাচীন কাল হইতে বিভক্তি এ। বিদ্যাপতিতে এ। বোধ হয়, পাদ পূরণ কিংবা নিশ্চয়ার্থে অধিকরণের এ পরে ত বসিত, ফলে দাঁড়াইত তে। এ, ইহার টানে তে হইয়া এতে —যেমন 'জলেতে'—হইয়াছে। জলে, জলেত, জলেতে। অর্থাৎ জলেতে পদে দুইবার বিভক্তি বসিয়াছে। এই কারণে 'জলেতে' গ্রাম্য ভাষা, এবং 'জলে' সাধুভাষা হইয়াছে। 'জলে' পদ প্রাচীন রীতি অনুসারে 'জলএ' হইবার সম্ভাবনা ছিল। তুলনা কর, 'নদীএ এল বান।' এই এ স্থানে য় হইয়া 'কাদায়', 'ভাষায়'। ওড়িয়াতে র আগম হইয়া 'জলএ' স্থানে 'জলরে'।

।৵০ বাঙ্গালায় করণ কারকেরও বিভক্তি এ তে। ছুরীতে, কলমে, খোঁচায় ছিঁড়িয়াছে। এ য় একেরই দুই রূপ। আসা° ও° বিভক্তি রে হি° নে (সে), ম° নেঁ। সংস্কৃতে এন না আ; স°-প্রাকৃতে এণ ণা এ ই। অতএব দেখা যাইতেছে সংস্কৃত হইতে হি° ম° বা° বিভক্তি এ আসিয়াছে। এ স্থানে রে করিয়া আসামী ওড়িয়াতে বিভক্তি রে, এবং তে করিয়া বাঙ্গালাতে বিভক্তি তে হইয়াছে। শেষে শুধু স্বর এ উচ্চারণে কষ্ট হয়; এই হেতু স্বর সঙ্গে একটা ব্যঞ্জন র, মিশিয়াছে। বোধ হয় এ স্থানে তে হইবার কারণও কতকটা এই। স্বরবর্ণ সহিত র যত যুক্ত হইতে দেখি, অন্য ব্যঞ্জন তত দেখি না। অন্যদিকে ক যত লুপ্ত হয়, অন্য ব্যঞ্জন তত হয় না।

।৶০ অপাদান কারকের 'হইতে' শব্দের মূল স° ভূ এবং বাঙ্গালা হ ধাতু। ভূ ধাতুর অর্থ সত্তা, সুতরাং সম্ভব, উৎপত্তি। 'গাছ হইতে ফল পড়িল',—ফলের উৎপত্তি গাছ। 'সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত'—পরিষৎ আদি বা কারণ। এইরূপ সর্বত্র। বা° থাক (এবং স° স্থা) ধাতুর অর্থ স্থিতি। সত্তা ও স্থিতি এক। এইহেতু 'হইতে' পরিবর্তে 'থাকিয়া' বা 'থেকে', 'ঠাঁইএ' বা 'ঠিঁএ' (স্থানে), 'নিকটে', 'কাছে', 'কাছ থেকে' ইত্যাদি আসিয়াছে। কিন্তু 'হইতে' ও 'থাকিয়া'—রূপে ভিন্ন। 'হইতে'—'হই' ক্রিয়াপদে অপাদানে তে, বোঝা যায়। কিন্তু সেইরূপ 'থাকিতে' নয়, 'থাকিয়া'—অনন্তরার্থে ইয়া প্রত্যয়। 'গাছ থেকে ফল পড়িল'—ফল গাছে ছিল—তার পর পড়িল। সুতরাং অর্থ 'হইতে'-র তুল্য হইল। এমন বাক্যও আছে, 'হুগলী হইয়া বর্ধমান যাইবে'—অর্থাৎ হুগলীতে স্থিতি করিয়া। 'রাম চেয়ে শ্যাম বড়'—রামকে তুলনার আদি করিলে শ্যাম বড়, কিংবা রামকে দেখিয়া বোধ হইল শ্যাম বড়। 'চেয়ে' স্থানে 'চাইতে' শব্দও বসে। 'চাইতে'—চাই ক্রিয়াপদে অপাদানে তে। অপাদানে ও°-তে রু ঠারু, হি° তে সে, ম°তে ঊন হূন, আসা°-তে পরা। স°-প্রাকৃতে বহুবচনে হিন্তো সুন্তো ছিল। আসা°-তে অদ্যাপি (প্রায়ই পদ্যে) হন্তে (বা° হইতে) আছে। কোন কোন মরাঠী পণ্ডিত মনে করেন, হিন্তো সুন্তো হইতে মরাঠীর হূন ঊন বিভক্তির উৎপত্তি। হ ও স স্থান পরিবর্তন করিতে পারে, এবং হ লোপে ঊন থাকে। সিন্তো হইতে হি°-র সে বিভক্তিও অনুমান করা যাইতে পারে। ও° ঠারু—স্থান-উ—স্থান-রু—স্থান হইতে। ঠারু পরিবর্তে শুধু রু ও হয়।* অতএব বিভক্তি রু—যেন মরাঠীর

* কবি জয়কৃষ্ণ দাসের (১৬০১ শক) রসকদম্বলতায় 'ঝাঁকি ঝোরখে দুরু হেরই আয়ত নাগর কালা।'—

উন বিভক্তির উ এবং উ-তে র আগম। আসা° পরা, স° উপরি হইতে। মেঘর পরা—মেঘের উপর হইতে, এখানেও স্থান বা আদি। কিন্তু, স°-প্রাকৃতে হিন্তো সিন্তো কোথা হইতে আসিল? সংস্কৃতে অপাদানের একবচনে আৎ অঃ, বহুবচনে ভ্যঃ। পালিতে একবচনে স্‌সা, বহুবচনে হি। সংস্কৃতের অঃ হইতে পালির স্‌সা এবং হিন্দীর সে আসা অসম্ভব নয়। সংস্কৃত ভ্যঃ হইতে পালির হি আসিয়া থাকিবে। সংস্কৃতের ভ্যঃ কি মূলে ভূ ধাতু? সংস্কৃতে লোকাৎ *—লোকতঃ, তস্মাৎ—ততঃ, দুই প্রকার পদ আছে। পালির স্‌সা সঙ্গে ত স্‌ মিলিয়া প্রাকৃত সুন্তো এবং হি সঙ্গে মিলিয়া হিন্তো? যাহা হউক, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া লাভ নাই। দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার 'হইতে'-র মূলে ভূ ধাতু; এবং 'হইতে' পাইবার নিমিত্ত স°-প্রাকৃত হিন্তো না আনিলেও চলে। মরাঠী ভাষা স°-প্রাকৃতের যত নিকটবর্তী, অন্য চারি ভাষা তত নহে।

১৪৬। সন্ধি।

/০ সংস্কৃত ভাষায় দুই বর্ণ (ধ্বনি) পরস্পর নিকট হইলে মিলিত হয়। এইরূপে ধাতু ও প্রাতিপদিকের সহিত বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হইয়া পদ ও শব্দ রচিত হইয়াছে। দুই বা অধিক পদও পরস্পর যুক্ত হইয়া দীর্ঘ আকার ধরে। পদের সন্ধি দেখিলে মনে হয়, সংস্কৃত-ভাষী দ্রুত কথা কহিতেন, নতুবা কর্তা-ক্রিয়া-কর্মাদি মিলিত হইতে পারিত না। শিক্ষাধ্যায়ে দেখা গিয়াছে অন্ততঃ কতক সন্ধির মূল স্বাভাবিক।

৵০ বাঙ্গালা-ভাষা শব্দ-সন্ধির বিরোধী। এত বিরোধী যে সন্ধিযোগ্য সংস্কৃত শব্দও না মিশাইয়া পৃথক পৃথক বলিলে বাঙ্গালায় শ্রুতিমধুর হয়। মধ্বাভাব, পিত্রৈশ্বর্য, বিদ্বাল্লেখক প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ভাঙ্গিয়া 'মধুর অভাব,' 'পিতার ঐশ্বর্য,' বিদ্বান লেখক' বলা ও লেখা হইয়া থাকে। সন্ধি হইলে যে শব্দের অর্থ বুঝিতে এবং উচ্চারণ করিতে ক্লেশ হয় না, সে শব্দ বাঙ্গালায় চলে। বিদ্যালয়, কটূক্তি, পিত্রালয়, সচ্চরিত্র, জগন্নাথ প্রভৃতি শব্দ এই রূপ। বাক্যের অন্তর্গত সন্ধিযোগ্য সংস্কৃত বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সন্ধি হইয়া থাকে, অন্য পদের হয় না।

৶০ বাঙ্গালায় সন্ধি একবারে হয় না, এমন নহে। ধাতু ও প্রাতিপদিকের সহিত বিভক্তি ও প্রত্যয়ের সন্ধি হয়। দুই শব্দের সমাস হইলেও সন্ধি হয়। এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সমান। প্রভেদ এই, বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন পদের সন্ধি হয় না।

।০ সংস্কৃতে দুইটি স্বরবর্ণ পাশে পাশে থাকিতে পারিত না। কিন্তু, স°-প্রাকৃতে থাকিতে

ঝরকায় ঝুঁকিয়া দুরূ—ও° দূররূ—দূর হইতে হেরিতে লাগিল নাগর কালা আসিতেছেন। (১৩১৪ সালের সাঃ পঃ পঃ)। সম্বন্ধ পদেও রূ আছে।

* সংস্কৃত বিভক্তি আৎ সঙ্গে ফার্সীর বিভক্তি আজ তুলনা করা যাইতে পারে। স°-তে 'কটকাৎ'—কটক হইতে,' ফার্সী 'আজ কটক'—কটক হইতে। সংস্কৃত শব্দের ত দ স্থানে ফার্সীতে প্রায়ই জ পাওয়া যায়।

পারিত। সং 'শৃগাল' শব্দ সং-প্রাকৃতে 'সিআল' হইয়াছিল। আমরা বাঙ্গালায় বলি 'শিআল', কিন্তু প্রায়ই লিখি 'শিয়াল'! 'শিআল' লিখিলে সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মে 'শ্যাল' হইত। বোধ হয়, এই আশঙ্কায় 'শিয়াল' লিখিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছি। 'করিআ' লিখিলে সংস্কৃত-ব্যাকরণ 'কর্য্যা' বা 'কর্যা' করিয়া ফেলিত। হয়ত এই কারণে 'করিয়া' লেখা রীতি হইয়াছিল। (প্রাচীন বাঙ্গালায় 'কর্য্যা' বানান ছিল, এবং বঙ্গের কোন কোন স্থানে অদ্যাপি 'কর্য্যা' শব্দ আছে।) করি+আছি—'করিআছি' না হইয়া 'করিয়াছি' হইবার কারণও সংস্কৃত-ব্যাকরণের শাসন। শুধু স্বর বসাইতে যেন বাঙ্গালা ভাষা কাতর। ওড়িয়া-ভাষা কিন্তু সংস্কৃত-প্রাকৃতের মতন শুধু স্বর বসাইয়া যায়। হয়ত প্রাচীন বাঙ্গালা-লেখক অ এবং য় বর্ণের উচ্চারণ এক করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় এত য় আনিয়া দিয়াছেন। প্রাকৃত জনের জিহ্বা কণ্ঠ কর্ণ জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শিক্ষাধ্যায়ে উল্লেখ করা গিয়াছে। ই এ স্থানে য় এবং এ স্থানে য়ে অনেক পদে চলিয়াছে। যথা সং খদির—খইর—খয়র (কেহ কেহ বলে খয়ের); সং ভ্রাতৃ—ভাই, ভাই+ইয়া —ভাইয়া—ভায়া; প্রাচীন বাং করিহ—করিঅ—করিও (কেহ কেহ লেখেন করিয়ো); সং গ্রাম—গাআঁ—গাঁয়, গাঁয়+এর=গাঁয়ের; সং মাতৃ—মাই (কিংবা মাতা—মাআ—মায়), মাই+এর=মায়ের। এইরূপ, দুই+এর—দুয়ের, ভাই+এর—ভায়ের, দুই+এক—দুয়েক। কত+এক—কতেক, ত লোপে—কয়+এক=কয়েক। কিন্তু ত লোপে হয় অ থাকিবে, নয় কিছুই থাকিবে না। অতএব 'কএক' হইবার কথা। 'কত' হইতে 'কঅ' করিয়া শেষের অ উচ্চারণ করিতে ধৈর্য চাই। বাঙ্গালা ভাষা কয়, নয় (নব), ছয়, পঁয় (-ষষ্টি) ইত্যাদি করিয়া ছাড়িয়াছে। মাটি+ইয়া—মাটিয়া ঠিক আছে। কিন্তু জল+উয়া—জলুয়া বানান উচ্চারণের সঙ্গে মেলে না। এই কারণে বোধ হয় ইয়া উয়ার ঠিক বানান ইআ উআ। (১৩১৭ সালের ফাল্গুনের প্রবাসী পত্র দেখ)

।/০ বাঙ্গালা ভাষার শব্দের সন্ধির নিয়ম এক। সমাস হইলে এবং পূর্ববর্তী শব্দ ব্যঞ্জনান্ত এবং পরবর্তী শব্দ স্বরাদি হইলে ব্যঞ্জনে স্বর যুক্ত হয়। যথা, জন+এক—জনেক, বার+এক—বারেক। সাদৃশ্যে, অর্ধ+এক—অর্ধেক, কুড়ি+এক—কুড়িএক—কুড়িক, দুঃখ+এর—দুঃখের, বিরহ+এর—বিরহের, প্রভৃতি আছে। পাহাড়+উপরি—পাহাড়োপরি, ভেলা+উপরি—ভেলোপরি বাঙ্গালায় চলে না। পাহাড়+উপরি যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে বরং পাহাড়ুপরি হইতে পারে। তোমার+ই—তোমারি, তেমন+ই—তেমনি প্রভৃতি শব্দে সমাস নাই। কিন্তু ই প্রত্যয়তুল্য হইয়াছে।

।৵০ অনেক সংস্কৃত শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গ বাঙ্গালাতে লুপ্ত হয়। মনঃ তেজঃ বাঙ্গালাতে মন তেজ। এই হেতু মনান্তর, মনাগুন, তেজী সতেজ শব্দ হইয়াছে। 'মনঃ' ও 'তেজঃ' বাস্তবিক 'মনস্' ও 'তেজস্'। এই স্ লোপের চেষ্টায় বিসর্গের উৎপত্তি। এই স্ কোথাও আ হইয়াছে, যেমন অপ্সরস্ হইতে অপ্সরা (সংস্কৃত); কোথাও র হইয়াছে,

যেমন বহিস্ হইতে বা° বাহির (তু° স° বহিরঙ্গ, বহির্ভূত)। কিন্তু সংস্কৃত তস্ ও শস্ প্রত্যয়ের বিসর্গ বাঙ্গালায় লুপ্ত হয় না। ফলতঃ বস্তুতঃ ক্রমশঃ প্রায়শঃ প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ উচ্চারিত হয়। যে বিসর্গের মূল র, তাহাও লুপ্ত হয় না। পুনঃ পুনঃ—পুনপুন হয় না। কিন্তু চতুর্ শব্দের র লোপে চতু, এবং ত লোপে চউ, উচ্চারণ-বিকারে চৌ; যেমন চৌঠা, চৌমাথা। এইরূপ দুই চারিটা শব্দ ব্যতীত অধিকাংশ শব্দের সন্ধির সময়ে বিসর্গ স্থানে ও স র হয়। মনোযোগ, মনোরথ, তেজোহানি, তেজস্কর, নিষ্ফল, পুনর্বার, পুনরায় (স° পুনরপি), প্রভৃতি শব্দ কথিত ও লিখিত ভাষায় চলিত আছে। এমন কি, গ্রাম্য লোকে বলে দুখ্খ, অন্তষ্করণ, অন্তস্পুর। কৃত্তিবাসে দুখ্খ। সাদৃশ্যে বোধ হয়, কিম্বা, বশম্বদ, সম্বাদ ইত্যাদি লেখা কিছু মাত্র দোষের নয়। আমরা এই সকল শব্দ ম দিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, অতএব ম লেখা বরং শুদ্ধ। বাঙ্গালায় কোথায় কতদূর সংস্কৃত ব্যাকরণ মানা যাইবে, তাহার মীমাংসার সময় এখনও আসে নাই। গ্রাম্য জন মন্‌যোগ, তেজ্‌হানি বলে; কারণ শব্দ মন্ ও তেজ্। তথাপি যে 'মনান্তর' হয়, তাহার কারণ 'অন্তর' শব্দের বিকারে 'আন্তর' শব্দ।

১৪৭। সমাস।

৵০ বাঙ্গালায় সমাস আছে, এ কথা শুনিয়া অনেক পণ্ডিত আশ্চর্য হইয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় এমন ভাষা নাই যাহাতে দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষ সমাস নাই। সংস্কৃতে সমাসের যত আধিক্য, বাঙ্গালায় তত নাই বটে, কিন্তু সমাস-ছাড়া কথা-কহা চলে না। প্রাচীন সংস্কৃতে না কি দুই তিনের অধিক পদের সমাস হইত না, বাঙ্গালাতেও হয় না। বহু পদের দীর্ঘ-সমাস চলিত ভাষায় না থাকার কথা। দ্বন্দ্ব সমাস লম্বা হইতে পারে, কারণ শব্দগুলি প্রায় স্বাধীন থাকে; কিন্তু সমাসের পর সমাস, তার পর সমাস করিলে টীকার প্রয়োজন হয়। এই হেতু বোধ হয় কাদম্বরীর দীর্ঘ-সমাস-বদ্ধ-পদ শ্রেণী সংস্কৃত-ভাষার পর লোক-প্রাপ্তির পরে রচিত হইতে পারিয়াছিল। 'অ-বিরল-কাদম্বিনী-গভীর-গর্জ্জন-চকিত-চিত্ত-কাদম্বরী-বদন-চন্দ্র-বিলোকন-চটুল', কিংবা 'জাতি-যূথী-চম্পক-মন্দার-শেফালিকা-কুসুম-মণ্ডিত-নিকুঞ্জ-গহন-মধ্য-বর্ত্তী-নন্দ-নন্দন-চরণা- রবিন্দ-গলিত-মকরন্দ-পানা-নন্দিত' পদ * বাঙ্গালায় কখনও আবশ্যক হয় না।

৶০ সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক পদের অন্তে এক এক বিভক্তি থাকে। বিভক্তির সংখ্যাও কিছু অল্প ছিল না। সমাসে সে অসংখ্য বিভক্তির লোপও হইয়াছিল। পূর্ব পদের বিভক্তি লুপ্ত হইয়া শেষের পদটিতে দাঁড়াইয়াছিল। তথাপি, ধনঞ্জয়, ভয়ঙ্কর, বসুন্ধরা, আত্মম্ভরী, যুধিষ্ঠির, অন্তেবাসী, দাসীপুত্র, গোপীনাথ প্রভৃতি শব্দের পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালাতেও এইরূপ আছে।

৶০ **দ্বন্দ্ব সমাস।** দ্বন্দ্ব নাম হইতে বোধ হয় দুইটি নিরপেক্ষ পদের সমাস দ্বন্দ্ব সমাস।

---

* এক ব্যাকরণ হইতে উদ্ধৃত হইল।

রামের ও লক্ষ্মণের—রাম-লক্ষ্মণের, মা ও বাপ—মা-বাপ, নাম ও ধাম—নাম-ধাম। বাঙ্গালার সকল পদে বিভক্তি থাকে না। সুতরাং পদের সমাস ও শব্দের সমাস—দুইই বলা চলে। দুই বিশেষণ শব্দেরও দ্বন্দ্ব সমাস হয়। কানা ও খোঁড়া—কানা-খোঁড়া, শাদা ও কাল—শাদা-কাল, চালাক ও চতুর—চালাক-চতুর। বিকল্প বুঝাইতেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়। জয় বা পরাজয়—জয়-পরাজয়, হারি বা জীত—হার-জীত, ভাল বা মন্দ—ভাল-মন্দ, কম বা বেশী—কম-বেশী, বিশ বা পঁচিশ—বিশ-পঁচিশ।

।০ বাঙ্গালাভাষায় দ্বন্দ্ব সমাসের অসংখ্য উদাহরণ আছে। ঘটী-বাটী, কাপড়-চোপড়, ঠাকুর-ঠুকুর, জল-টল প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ দ্বন্দ্ব-সমাস-নিষ্পন্ন। পরে এতদ্বিষয় বিস্তারিত করা যাইবে। (১৪৮ দেখ)

।/০ দ্বন্দ্ব সমাসে কোন্ শব্দ আগে কোন্ শব্দ পরে বসে, তাহার নির্ণয় সহজ নহে। আগে পরে বসিবার অনেক নিয়ম আছে। (১) স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ থাকিলে, আগে পুরুষ পরে স্ত্রী। যেমন, দাস-দাসী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, নদ-নদী, বেটা-বেটী, বাপ-মা, নেড়া-নেড়ী, হর-গৌরী, রাম-সীতা। (২) সে সম্বন্ধ না থাকিলে, প্রথমে হ্রস্ব শব্দ পরে দীর্ঘ কিংবা দুরুচ্চার্য শব্দ। যেমন ইঁট-পাথর, মাল-মসলা, ফুল-চন্দন, মোগ-ভাতার, গ্রহ-নক্ষত্র, চোর ছেঁচড়, চো-ডাকাইত, অন্ন-ব্যঞ্জন, পাহাড়-পর্বত, মেয়ে-মর্দ্দ, বর-বামুন, সাঁঝ-সকাল। (৩) মান্য গণ্য ও প্রধান আগে। শ্বশুর-জামাই, গুরু-শিষ্য, গুরু-পুরুত, বামুন-বৈষ্টম, গান-বাজনা, খাওয়া-পরা, পথ-ঘাট, মুখ-হাত। বোধ হয় আরও নিয়ম আছে। চন্দ্র-সূর্য, পাপ-পুণ্য, বাজনা-বাদ্য, পাল পার্বণ, দোল দুর্গোৎসব, দহরম-মহরম, ওড়ন-পাড়ন, চাষ-বাস, হাজা-শুখা, হাওলাত-বরাত, লেনা দেনা, খুড়া-জেঠা, বাপ-দাদা, নাতি-পুতি, সুখ-শান্তি, লোক-জন, বাবা-বাছা, রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম, স্ত্রী-পুরুষ, মা-বাপ, প্রভৃতির কোন কোনটা উপরের নিয়মের মধ্যে আসিতে পারে কিন্তু সব আসে না। দিনের পর রাত্রি—দিন-রাত, দিবা-নিশী (সং নিশীথ)। দিবস-রজনী, অহো-রাত্র; কিন্তু সূর্য চন্দ্র না হইয়া চন্দ্র-সূর্য; স্থল জল না হইয়া জল-স্থল; পুণ্য অপেক্ষা পাপ পরিত্যাজ্য হইলেও পাপ-পুণ্য। সুখ-দুঃখ, কিন্তু দুখ-সুখ; আগে পরিচয় পরে আলাপ, কিন্তু আলাপ-পরিচয়; আগে শোনা পরে পড়া, কিন্তু পড়া-শোনা; আগে ভাত পরে শাগ, কিন্তু শাগ-ভাত। কোন কোন শব্দ-দ্বন্দ্ব দেখিলে মনে হয় যেন যে শব্দে অ আ ভিন্ন স্বর এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জন আছে, সে শব্দ পরে বসে। যেমন, কাজ-কর্ম, মাথা-মুণ্ড, মাপ-জোঁখ, ভাবনা-চিন্তা। সকল স্থলে এ নিয়মও নহে।

।৵০ দ্বন্দ্ব সমাসের দুই পদেও বিভক্তি থাকিতে পারে। যথা, আগে-পাছে, বুকে-পিঠে, কোলে-কাঁখে, চোখে-মুখে, ঘরে-বাহিরে, হাতে-পায়ে, ঘাড়ে-গর্দানে, পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, বনে-বাদাড়ে, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে, জলে-কাদায়, হাতে-হেতেরে। দেখা যায়, সকল গুলিতে এ বিভক্তি বসিয়াছে।

।৶০ দ্বিরুক্ত শব্দও এই সমাসের অন্তর্গত হইতে পারে। মার-মার (শব্দ), খাই-খাই

(রব), হাসি-হাসি (মুখ), ভাল-ভাল, কাঁচা-কাঁচা, শীঘ্র-শীঘ্র, ঝিন-ঝিন, চিঁ-চিঁ, ঝন্-ঝন, কড়্-কড়্, ইত্যাদি।

॥০ বিশেষ্য সর্বনাম বিশেষণ ক্রিয়া অব্যয়,—সকল শব্দ দ্বিরুক্ত হইতে পারে। হইলে, প্রকর্ষ, বীপ্সা ও পৌনঃপুন্য বুঝায়। (১) বিশেষ্য দ্বিরুক্ত হইলে বীপ্সা ; যথা, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই ; গাঁএ-গাঁএ রাষ্ট্র। অর্থ-প্রকর্ষে ; যথা, ধুম-ধাম, জাঁক-জমক।* পৌনঃপুন্য ; যথা, ছুম্-ছুম, বম্-বম। (২) সর্বনাম দ্বিরুক্ত হইলে বীপ্সা হইতে অনিশ্চয় বুঝায়। যথা, আমা-তোমার কাজ নয়, কে-কে যাবে। (৩) বিশেষণ দ্বিরুক্ত হইলে অনেকের মধ্যে উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট বুঝায়। যথা, লাল-লাল ফুল, পাতলা-পাতলা রুটী, লাল-লাল দেখিয়া ফুল তোল, মোটা-মোটা করিয়া ইট গড়িবে। বিশেষণ সঙ্খ্যাবাচক হইলে একদা তৎসঙ্খ্যক বুঝায়। যথা, হাজার-হাজার লোক দেখিয়াছে, চারি-চারি পেয়াদা আসিয়াছে। (৪) ক্রিয়া দ্বিরুক্ত হইলে পৌনঃপুন্য বুঝায়। যথা, গেয়ে গেয়ে গলা ভাঙ্গিয়াছে। অনুজ্ঞায়, ত্বরা, বিনয় ; যথা, মার-মার, চল-চল, যাও-যাও। (৫) অব্যয় দ্বিরুক্ত হইলে প্রকর্ষ ও পৌনঃপুন্য বুঝায়। যথা, বার-বার বলিও না, পয়-পয় বারণ করিলাম, ছিঃ-ছিঃ, হায়-হায়।

॥/০ তৎপুরুষ। সংস্কৃতে তৎপুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন পদের বাহুল্য আছে, বাঙ্গালাতেও আছে। পূর্ব-পদের কারক-বিভক্তির লোপ করিতে তৎপুরুষের প্রয়োজন। দুই পদই বিশেষ্য, কিংবা প্রথম পদ বিশেষ্য এবং দ্বিতীয় পদ বিশেষণ ও কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পদাদি-যোগে তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে। তৎ-পুরুষ—তাহার মানুষ এই নাম হইতে বোঝা যায়, সম্বন্ধ-পদের বিভক্তি লোপ করাই এই সমাসের প্রধান লক্ষ্য। যথা, মামা-বাড়ী, বামুন-পাড়া, ঠাকুর-পো, রাম-ধনু, বাউল-সম্প্রদায়, শিব-তলা, তাল-গাছ, মুদী-খানা, বাই-নাচ। কর্ম-কারকে,—ঠাকুর-দর্শন, কলিকাতা গমন, ভাত-খাওয়া, মাছ-ধরা। করণ-কারকে,—ধন-হীন, জল-মেশানা, দুধ-সাবু, রেল-গাড়ী, ঘি-ভাত, জল-জীয়ন্ত, মন-গড়া। সম্প্রদান-কারকে,—বালিকা-বিদ্যালয়, হিন্দু-ইস্কুল, ধান-জমি, ডাক-মাশুল। অপাদান-কারকে,—আগা-গোড়া, বিলাত-ফেরত, বিশ-ত্রিশ, ঘোষ-জা। অধিকরণ-কারকে,—ঘর-গড়া, গাছ-পাকা, নাঁদ-পচা।

॥৵০ বাঙ্গালায় তৎপুরুষ সমাসে শব্দের পরিবর্তন হয় না। সংস্কৃত হইতে গুণী, ধনী, মানী, কারী, ভাবী, দায়ী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়াছে। কেহ বলেন, বাঙ্গালাতে সমাস করিবার সময় এই সকল ইন্-ভাগান্ত শব্দ ইকারান্ত করিতে হইবে, কেহ বলেন, বাঙ্গালাতে সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম পালন আবশ্যক নহে। ধনীর ঘর, ধনীরা, ধনী দ্বারা, ধনী সকল যখন ঈকারান্ত লিখিতেছি, তখন ধনী-গণ, ধনী-মহাশয় লিখিলে দোষ হইতে পারে না। আমার বিবেচনায় একই শব্দের দুই রূপ রাখিয়া লাভ নাই। বাঙ্গালায় শব্দটি ধনী, সংস্কৃতে ধনিন্। ধনী নির্ধনী, দোষী নির্দোষী, অক্ষম সক্ষম, অচল সচল, সম্ভব অসম্ভব, প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা। অতএব সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম-রক্ষা পাণ্ডিত্য-প্রকাশ মাত্র। বাঙ্গালা-ভাষা সংস্কৃত নয়, একথা বুঝিয়াও আমরা বাঙ্গালা-ভাষা সংস্কৃতের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে চাই! আশ্চর্য এই,

সংস্কৃত ভাষার শব্দ পাইলে সংস্কৃত ব্যাকরণ খুলিয়া বসি, অন্যান্য ভাষার শব্দের বেলা সে-সে ভাষার ব্যাকরণ দেখিতে চাই না। ফার্সীতে দরিয়া-দিল, বাঙ্গালাতে দিল-দরিয়া; ফার্সীতে জমিন্দার—বাঙ্গালাতে জমিদার; ইংরেজীতে ডাক্তারি ও মাষ্টারি অশুদ্ধ, বাঙ্গালাতে শুদ্ধ। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

॥৶০ **কর্মধারয়।** এই সমাসে এক পদ অন্য পদকে বিশেষিত করে। নীলোৎ-পল, রজত-পাত্র, সু-কৃত, অ-জ্ঞাত প্রভৃতি শব্দ কর্ম-ধারয় সমাসের দৃষ্টান্ত। বিশেষণ-বিশেষ্য-যোগে নিষ্পন্ন কর্মধারয় সমাস বাঙ্গালাতে প্রায় নাই বলিলেও চলে। কারণ বাঙ্গালায় বিশেষণের বিভক্তি থাকে না, 'দয়াল ঠাকুর' দুইটি শব্দ কাছে কাছে লিখিলেই কর্মধারয় সমাস হয় না। হইলে 'বড় গাছ', 'ছোট পাতা', 'লাল ফুল', 'খোঁড়া পা', 'ভাঙ্গা হাত' 'হারা ধন' প্রভৃতি সবই কর্মধারয়ের উদাহরণ।

৸০ বাঙ্গালায় কর্মধারয় সমাস নাই, এমন নহে। উন-বিশ—উন-ইশ বা উনিশ, উন-ত্রিশ, পাই-কম (এক টাকা), সাড়ে-পাঁচ, পৌনে-সাত, মহা-গোল, মহা-কারখানা। 'দুই' 'এই' শব্দের ই লুপ্ত হয়। এইক্ষণ—এখন, এইদিক—এদিক, দুইজন—দুজন, দুইতলা (দ্বিতীয় তল)—দুতলা। তিন ও চারি (চতুঃ) শব্দ তে ও চৌ হয়। এইরূপ, তে-তলা চৌ-তলা। এক দুই তিন প্রভৃতি বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসিয়া আসন্নমানতা প্রকাশ করে। যথা, এক-তিল—তিলেক, একবার—বারেক, একখান—খানেক, খানেক মাস—মাস-খানেক, দুই বৎসর—বৎসর দুই, এক মণটা—মণটাএক—মণটাক, চারি গোটা—গোটা-চারি, কতক জন—জন-কতক (১৫১ দেখ)। কতকগুলি কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দও বিশেষ্যের পরে বসে। যথা, পড়া তেল—তেল-পড়া, সিদ্ধ আলু—আলু-সিদ্ধ, ভাজা চাল—চাল-ভাজা।

৸৴০ উপমিত ও রূপক সমাস কর্মধারয়ের অন্তর্গত হইয়া থাকে। যথা, চাঁদ তুল্য মুখ—চাঁদ-মুখ। এইরূপ, জল-পথ, নৌকা-পথ, ফুল-বাবু, ঠাকুর-দাদা, দাদা-ঠাকুর, বাবু-মশায়, বেণীমাধব-সেন, ডাঙ্গা-জমি, হাওয়া-শাড়ী, চিরনী-দাঁত, ডালিম-রং, গিনী-সোণা, বেল-গাছ, তাল-পুকুর। বলা বাহুল্য, কোন কোন শব্দে তৎপুরুষ কর্ম-ধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের প্রভেদ করা সহজ নহে।

৸৶০ সংস্কৃতে অব্যয় ও উপসর্গ দ্বারা বিশেষিত হইয়া অসংখ্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গালাতেও এইরূপ শব্দ আছে। যথা, অ-ফুরন্ত, অ-জানা, অনাটন, অনা-সৃষ্টি, আ-ধোয়া, আ-লোনা। ইহাদের সঙ্গে অভাব অর্থে অ-যুক্ত শব্দও আনা যাইতে পারে। অ-সুখ, অ-মিল, অ-বস্তি। এইরূপ, বি-সুখ (অসুখ-বিসুখ), বে-দল, বে-বন্দবস্ত, বে-আরাম, গর-হাজির, গর-মিল, সু-বন্দবস্ত, সু-নজর, কু-নজর। বিশেষ্যের পূর্বে অ বসিলে শব্দটি বিশেষ্য ও বিশেষণ দুই-ই হইতে পারে। 'রাম পৃথিবী অ-রাবণ করিয়াছিলেন। (তু° সং অ-মিত্র, অ-বীর, অ-ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি)

৸৷০ **বহুব্রীহি সমাস।** বহু ব্রীহি—ধান্য—আছে যার, সে বহুব্রীহি। এই নাম

হইতে বহুব্রীহি সমাসের মুখ্য ভাব পাওয়া যায়। দুই পদের মধ্যে পরপদ বিশেষ্য, এবং বিশেষ্যকে বিশেষিত করিতে পূর্বপদ বিশেষণ, বিশেষ্য কিংবা অব্যয় হয়। পরপদ বিশেষ্য বটে, কিন্তু সমস্ত পদ বিশেষণ হয়। যথা, (সংস্কৃত) দীর্ঘ-বাহু, মহা-বল, নীল-কণ্ঠ ; ছিন্ন-পক্ষ, ধৃত-রাষ্ট্র ; ধ্বযদ্-বর্ণ ; এক-চক্র, ষট্-পদ ; চার-চক্ষুঃ, ভূমি গৃহ ; ইন্দ্রাদি, প্রণতি-পূর্বক, অপ্রজাঃ, দুর্গন্ধি, ইত্যাদি।

১৲ বাঙ্গালাতে বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ আছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পরে যায়, এবং অন্য বিশেষণ পদ পূর্বে বসিলে শেষে ইয়া উয়া আ ঈ যুক্ত হয়। যথা, উঁচা কপাল যার—উঁচা-কপালিয়া—উঁচা-কপালো, ফুল আছে পাড়ে যে কাপড়ের—ফুলম্-পাড়িয়া—ফুলম্পেড়ো (ফুলম্ স্বার্থে-অম্), কালা মুখ যার—কালামুখুয়া—কালামুখো, কটাবর্ণ চোখ যার—কটাচোখো, গোঁফে খেজুর যার—গোঁপখেজুরো (অলস), ডাকাইতের মতন বুক (সাহস) যার—ডাকাবুকো, পয় নাই যার—অপয়া, জল নাই যাতে—নির্জলা, লাউতুল্য পেট যার—লাউপেটা, দুই নল আছে যাতে—দুনলা (বন্দুক), একগজ পরিমাণ যার—একগজী, পাঁচশের ওজন যার—পাঁচশেরী—পশরী। এইরূপ অসংখ্য শব্দ আছে।

কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পরে বসে। যথা, মুখ পোড়া যার—মুখ-পোড়া, কিন্তু পোড়া মুখ যার—পোড়ার মুখো (র কেন আসে ?), 'পাশ' করিয়াছে যে—'পাশ'-করা, লক্ষ্মী ছাড়িয়াছেন যাকে—লক্ষ্মী-ছাড়া, মোট বহিয়া প্রাপ্ত—মোট-বহা (কড়ী), ধান সিদ্ধ হয় যাতে—ধান-সিদ্ধ (হাঁড়ী), মতি ছন্ন যার— মতিছন্ন। এইরূপ, নাম-কাটা (শিপাই), লুচি-ভাজা (কড়াই), ঘর-পোড়া (গোরু), মাটি-কাটা (কোদাল), মণি-হারা (ফণী)। এই সাদৃশ্যে সংস্কৃত শব্দ-যোগে বাঙ্গালাতে বহুব্রীহি সমাস করিবার সময় বিশেষ্যের পরে ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ বসে। যথা, হস্ত-ছিন্ন (হাত-কাটা), বসন-পরিহিত (কাপড়-পরা)। তৎপুরুষ সমাসের সহিত বহুব্রীহির ভ্রম হইয়াও ঐরূপ পদ ঘটে। তথাপি, ছন্নমতি নহে, মতিছন্ন শব্দ চলিত আছে। সংস্কৃতেও বিশেষণ পরে বসে না, এমন নহে। চিন্তা-পর, দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

১/০ কোন কোন স্থলে বিশেষ্যে বিভক্তি থাকে। যেমন, বানেভাসা ছেলে—যে ছেলে বানে ভাসিয়া আসিয়াছে, পায়ে-পড়া লোক—যে পায়ে পড়ে বা পড়িয়াছে। যাকে দেখামাত্র হাসি আসে—সে দেখন-হাসি, খাইতে পারে না যে—সে নি-খাঅস্তি।

১৶০ কোন কোন স্থলে ইয়া উয়া আ ঈ লাগে না। যথা, এক গাড়ী পরিমাণ যার—এক-গাড়ী (কাঠ), পাঁচ নম্বর যার—পাঁচ-নম্বর (বাড়ী), কড়া মেজাজ যার—কড়া-মেজাজ (লোক), বুঝ (বোধ) নাই যার—অবুঝ, দরিয়া—সাগর—তুল্য দিল—মন বৃহৎ যার—দিল-দরিয়া (ফার্সী দরিয়া-দিল), সাত লহর যাতে—সাতলর (হার), ছাড়ে না যে—না-ছোড়। কিন্তু কাজের যোগ্য নয় যাহা—অ-কেজো, অধর্ম আচরণ যার—অধর্ম্যে। সংস্কৃতে বহুব্রীহি সমাসে কোন কোন পদের শেষে ক আসে। যথা, নব-বয়স্ক, বহু-হস্তীক। হয়ত এই ক

স্থানে বাঙ্গালায় আ ইয়া উয়া আসিয়াছে। তু° সং জালিক—জালিয়া—জেল্যে। সেইরূপ, অধার্মিক—অধর্ম্যে। কোন কোন স্থলে সংস্কৃতে বহুব্রীহি সমাসের পরে ইন্ বন্ত প্রত্যয় বসে। যথা, যশোভাগিন্, দীর্ঘ-সূত্রিন্, অমৃত-বুদ্ধিমন্ত। এই সাদৃশ্যে বাঙ্গালাতে ঈ (যেমন যশোভাগী, বে-দাগী), এবং মহাধনবন্ত শব্দ পাওয়া যায়।

১১/০ চুলা-চুলি, মারা-মারি, লাঠা-লাঠি প্রভৃতি অন্যোন্য-বাচক শব্দ বহুব্রীহির অন্তর্গত। কীল দ্বারা যে যুদ্ধ—তাহা কীলাকীলি, চুল টানিয়া যে যুদ্ধ—তাহা চুলা-চুলি। এরূপ শব্দ-দ্বৈত পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে (৯৩)।

১১০ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে শেষে ঈ নী প্রভৃতি যোগ হয়। যথা, চাঁদ-বদনী, অল্প-বয়সী, পাট-করনী, ঘুঁটে-কুড়ানী, পাড়া-বেড়ানী। ঝাঁটা খায় যে—ঝাঁটা-খাগুয়া—ঝাঁটা-খেগো, স্ত্রীলিঙ্গে ঝাঁটা-খাগী। ('খা গিয়া' হইতে 'খাগা')

১১/০ **অব্যয়ীভাব।** বিশেষ্যের পূর্বে অব্যয় থাকিয়া অব্যয়ীভাব সমাস হয়। সমাসের পর কোন কোন পদ অব্যয়ের ভাব পায়। এইহেতু সমাসের নাম অব্যয়ীভাব। যথা, (সংস্কৃতে), গৃহে গৃহে প্রতিগৃহম্। এইরূপ, সংস্কৃত ব্যাকরণে সমক্ষম্, অধিহরি, উপনদম্, প্রতিনিশম্, নির্বিঘ্নম্, যথানাম, যাবন্মাত্রম্, সাদরম্ প্রভৃতি দ্বিতীয়ান্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যথাশক্ত্যা, যথেচ্ছয়া প্রভৃতি তৃতীয়ান্ত পদও পাওয়া যায়।

১১৶০ এরূপ পদ বাঙ্গালায় অনেক স্থলে শেষে এ পায়। যথা, প্রতিগৃহে, প্রতিঘরে, প্রতিমাসে, সমক্ষে, সম্মুখে, সাবধানে, সানন্দে, সবিনয়ে, যথাক্রমে, যথাকালে, যথেচ্ছায়। কোন কোন পদে এ থাকে না। যথা, যথাশক্তি, যথারুচি, যাবজ্জীবন।

১১৶০ ঘরে ঘরে—প্রতিঘরে, দোকানে দোকানে—প্রতিদোকানে, দিনে দিনে—প্রতিদিনে। শেষের এ লোপ করাও চলে। ঘরে ঘরে—শব্দ দ্বিরুক্ত হইয়া বীপ্সার্থ বুঝাইতেছে। ঘরপ্রতি, ঘরপেছু দুই টাকা চাঁদা—এখানেও বীপ্সা অর্থ আছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট নহে। জনকে একটাকা, শতকে পাঁচটাকা প্রভৃতি উদাহরণে কে যোগে বীপ্সা বুঝাইতেছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড়, দিনকে দিন বুদ্ধি বাড়িতেছে—ইত্যাদি উদাহরণে গ্রামের পর গ্রাম, দিনের পর দিন অর্থাৎ বীপ্সা অর্থ আছে।

১৷৹ সংস্কৃত-ব্যাকরণে অভাব-অর্থে অ-যোগে অ-ধর্ম, অ-পাপ, অ-ভাব, প্রভৃতি পদও অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন। এরূপ পদ এবং অধিরাজ উপকূল অনুরূপ অনুগমন প্রভৃতি পদ বাঙ্গালা-ব্যাকরণে কর্মধারয় সমাস মধ্যে ফেলা চলিতে পারে। এইরূপ সংস্কৃতের দ্বিগু-সমাসও কর্মধারয়-সমাস মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

১১/০ সংস্কৃত শব্দের সহিত বাঙ্গালা কিংবা বিদেশী শব্দের সমাস কখনও সুশ্রাব্য হয় না। 'মড়া-দাহ' ও 'শব-পোড়ান' বহুকাল হইতে দৃষ্টান্ত হইয়া আছে। কিন্তু যাহা অশ্রাব্য, তাহা লোকবিশেষের নিকট সুশ্রাব্য হয়। 'গ্যাসালোকোদ্ভাসিত কলেজষ্ট্রীটস্থ ৫ নম্বর-ভবনে বিলাত-প্রত্যাগত স্বর্ণ-মেডাল-প্রাপ্ত ডাক্তার-গণ মেলেরিয়া-প্রপীড়িত প্লেগাক্রান্ত পাড়া-সমূহের

স্থ-বন্দবস্তের জন্য কুইনীন-সম্বলিত সেগুন-কাষ্ঠের বাক্স-সহ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন। মোক্তার-গণ পুলিশ-গণের সহিত মিলিত হইয়া জমীদার-গণের বিরুদ্ধে রাজ-দরবারে নালিশ রুজু করিয়াছেন।' ইত্যাদি ভাষাসঙ্কর সংবাদ-পত্রে, বিশেষতঃ বিজ্ঞাপনে, প্রচুর চলিতেছে। ভাষার বাহাদুরি এই যে, 'এসেন্স পুষ্পসার,' 'একষ্ট্রাক্ট যমানী,' 'মহিষ-মার্কা ঘৃত,' '১০ নম্বর বৌবাজার কলিকাতা', 'গ্রেষ্ট্রীটস্থ ভবন' 'সডাক মাশুল' ইত্যাদি অদ্ভুত কুশরায় প্রত্যহ গলাধঃ করিতেছে। ব্যাকরণের শক্তি নাই, আজব শহর কলিকাতার হোটেলে প্রাচীন জাতি রক্ষা করে।

১॥৶০ সমাস-নিষ্পন্ন অনেক ইংরেজী ও ফার্সী শব্দও বাঙ্গালায় চলিতেছে। পোষ্ট-কার্ড, ইস্কুল-ইনস্পেক্টর, হাইকোর্টের জজ-সাহেব-বাহাদুর, ট্রাম-কনডাক্টর, ব্লটিং-কাগজ, পেন-কলম, ডায়মন-কাটা বাজু, সোডা-ওয়াটার, বরফ-জল, ইষ্টীল-ট্রাঙ্ক, বদ-খেয়ালি, ইত্যাদি কত আছে, এবং কত জুটিবে, তাহার নির্ণয় করিবে কে?

১৪৮। ইত্যাদি অর্থে শব্দ। (দ্বন্দ্বসমাসে)

/০ কথিত ভাষায় 'ইত্যাদি' শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়। প্রাকৃত ভাষায় 'ইত্যাদি' 'প্রভৃতি' অজ্ঞাত।* কারণ ইত্যাদি বুঝাইতে অসঙ্খ্য শব্দ আছে। তন্মধ্যে (রাঢ়ে) 'আষ্টা' শব্দ প্রধান। 'ঘটীটা আষ্টা', 'কাপড়টা আষ্টা'—ঘটী ইত্যাদি, কাপড় ইত্যাদি। 'আরটা' শব্দ হইতে আষ্টা (পরে ট থাকাতে র স্থানে ষ)। সং 'অপর' হইতে 'আর'। 'ঘটীটা আষ্টা' —ঘটীটা এবং অপরটা। ওড়িয়াতে 'ঘটী হারিকা'—অর্থাৎ ঘটী আর কি টা।†

৵০ 'আষ্টা' ছাড়া প্রত্যেক শব্দের এক একটি দোসর—অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দ আছে। তদ্দ্বারা ইত্যাদি, এবমাদি বুঝায়। এইরূপে যুগল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

৶০ এই সকল শব্দ পাঁচ ভাগ করিতে পারা যায়। বক্তব্যের সুবিধা নিমিত্ত পাঁচ ভাগের পাঁচ (নূতন) নাম করা যাইতেছে। (১) জন-মানব, মানুষ-জন, হাঁড়ী-কুঁড়ী, ঘটী-বাটী, টাকা-কড়ী, আকুলি-বিকুলি, কাকুতি-মিনতি, ইত্যাদি 'সহচর' শব্দ। সহচর শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু একত্র প্রয়োগে অর্থের উপচয় হয়। মানুষ ও জন—দুইটি শব্দের পৃথক্ প্রয়োগ আছে, এবং উভয়ের অর্থও এক। কিন্তু 'ঘরে মানুষ-জন নাই' বলিলে পরিবারের কোন পুরুষ কিংবা প্রতিবেশী কিংবা বেতন-ভোগী কোন অধ্যক্ষ নাই বুঝায়। ঘটীও আছে বাটীও আছে; কিন্তু 'ঘটী-বাটী সামলা' বলিলে কেবল ঘটী ও বাটী নয়, ঘরের সমুদয় তৈজস-পাত্র, এমন কি অন্য মূল্যবান দ্রব্য সাবধানে রাখিতে বলা হয়। সদা ও সর্বদা অর্থে এক; অথচ আমরা সদা-সর্বদা এক সঙ্গে বলিয়া প্রত্যেকের অর্থ-বাহুল্য করিয়া থাকি।

---

* 'ইত্যাদি কর্মে পাকা'—ইহা উহা, এটা ওটা করিতে, ছোট ছোট কাজ করিতে। এই অর্থে 'ইত্যাদি' শব্দ আছে। ওড়িয়াতেও আছে।

† সং 'অপরকিছু' শব্দের বিকার ও অপভ্রংশে হারিকা হেরিকা শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নহে।

(২) কাপড়-চোপড়, বাসন-কোশন, ছেলে-পিলে, অসুখ-বিসুখ, ইত্যাদির দ্বিতীয়টি 'অনুচর' শব্দ। অনুচর শব্দের প্রধানের স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু অনুচরের নাই অথচ অর্থ আছে। অনুচর শব্দের অর্থ প্রায়ই লুক্কায়িত থাকে। প্রধানের সঙ্গে মিলিবার নিমিত্ত সহচর শব্দ কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া অনুচর সৃষ্টি হইয়াছে। উভয়ের একত্র সমাবেশে প্রধানকে লইয়া তৎতুল্য দ্রব্য-গুণ-কর্ম বুঝায়। 'ছেলে' শব্দ সকলেই জানে। 'পিলে' শব্দ এখন বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, কিন্তু ওড়িয়াতে 'পিলা' অর্থে বালক, 'পিলী' বালিকা। পূর্ববঙ্গে 'পোলা', আসামে 'পোয়ালি', তেলুগুতে 'পিল্লা' শব্দে বালক। হিন্দীতে 'পিল্লা' কুকুর-ছানা, মরাঠীতে 'পিলূঁ' 'পিল্লূ' বাচ্চা, এবং বা° ছেলে-পিলে=ম° চিলীঁ-পিলীঁ। এই 'পিলা' শব্দের সংস্কৃত-ব্যুৎপত্তি-বিচার এখানে আবশ্যক নাই। দেখা যাইতেছে, 'পিলা' শব্দের অর্থ আছে বা ছিল। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ সমুদয় অনুচর শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। সে অর্থ প্রধানের অনুরূপ। 'বাসন' সবাই জানে, এবং 'কোশা' (সং কোশ) ও অজ্ঞাত নহে। 'বাসনের' সঙ্গে মিলাইতে গিয়া 'কোশ' শব্দ 'কোশন' হইয়াছে। শব্দকোষে বহু সহচর ও অনুচর শব্দ পাওয়া যাইবে।

(৩) ঠাকুর-ঠুকুর, ফাঁকি-ফুঁকি, দোকান দাকান, চুরি-চারি ইত্যাদি শব্দের দ্বিতীয়টি 'উপচর' শব্দ। উপচর শব্দটি প্রধানের বিকার। উহার স্বাতন্ত্র্য নাই। প্রধানের পরে বসিয়া 'ইত্যাদি' অর্থ প্রকাশ করে।

(৪) তেল-টেল, ঘটী-টটী, জল-টল, দুধ-টুধ ইত্যাদির দ্বিতীয়টি 'প্রচর' শব্দ। প্রধান শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন স্থানে ট ফ ম স বসিয়া প্রচরের উৎপত্তি। 'জল' জানি, 'টল' জানি না। কিন্তু 'জল-টল খাও' বলিলে জল-পান-মাত্র না বুঝাইয়া অন্য খাবার দ্রব্যও বুঝায়। উপচর শব্দে প্রধানের স্বরের বিকার, প্রচরে ব্যঞ্জনের বিকার হইয়া থাকে।

(৫) দিন-রাত, সন্ধ্যা-সকাল, জল-স্থল, ধর্মা-ধর্ম, প্রভৃতি যুগল শব্দের প্রত্যেকের অর্থ আছে, কিন্তু একের অর্থ অন্যের বিপরীত। বিরোধী শব্দদ্বয়ের একত্র সমাবেশে অর্থ-ব্যাপ্তি ঘটিয়া থাকে। দিন-রাত কলহ—দিবসে ও রাত্রিতে নহে, সর্বদা; জল-স্থল ছাইল—সমুদয় স্থান; ধর্মা-ধর্ম জ্ঞান নাই—কোনও জ্ঞান। এই প্রকারের যুগ্ম শব্দকে 'প্রতিচর শব্দ' বলা যাইবে।

।০ বাঙ্গালাভাষায় ইত্যাদি-অর্থ জ্ঞাপনের এই পঞ্চবিধ উপায় আছে। সাহিত্য-রসিক শ্রীরবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাশয় সন ১৩১১ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভাষার ইঙ্গিত' নামক দুইটি প্রবন্ধে জোড়া-শব্দের বহু উদাহরণ দিয়া অর্থ করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন, 'বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অবজ্ঞেয় নাই এবং প্রেমের কাছেও তদ্রূপ।' ঠিক কথা। দুঃখ এই, যুগল শব্দের তালিকা হয় নাই, অভিধানে স্থানে কুলায় নাই। সহচর, সানুচর, ও সোপচর শব্দ এমন যে কাজ সারিয়া অদৃশ্য হয়, কাগজ কলম লইয়া লেখা-জোখা কাজ সারিয়া অদৃশ্য হয়, কাগজ কলম লইয়া লেখা-জোখা করিতে বসিলে দেখা পাওয়া যায়

না। এইরূপ বহুশব্দ অদ্যাপি লোকের মুখে-মুখেই আছে, 'আলালের ঘরে দুলাল'-এও ধরা পড়ে নাই।

।/০ ঠাকুর-মহাশয় ভাষার 'ইঙ্গিত' দেখাইয়াছেন, এখানে 'মিঙ্গিত' দেখা যাউক। 'টাকা ফাকা', ফাঁকি-ফুঁকি'র কথা পরে হইবে। সহচর ও সানুচর শব্দ প্রথমে দেখা যাউক। দেখা যায়, প্রত্যেক যুগল-শব্দের দুইটি গুণ আছে—ধ্বনির মিল ও অর্থের মিল। এই দুইএর সংযোগ সহসা ঘটে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সুখ-শান্তি, আমোদ-আহ্লাদ প্রভৃতি শব্দের অর্থের মিল আছে, কিন্তু ধ্বনির মিল অল্প। 'আমোদ-আহ্লাদ' অপেক্ষা 'আমোদ-প্রমোদ' শব্দে অধিক মিল আছে। কালে এই শব্দটি অধিক প্রচলিত হইবে। রাঁধা-বাড়া—ভাত-ব্যঞ্জন রাঁধা, এবং পরে বাড়া। এখানে অর্থের মিল নাই, কিন্তু কর্মের অন্বয় আছে। উভয় শব্দে স্বরেরও মিল আছে। রাঁধনা—রান্না হইয়াছে, সুতরাং দোসর শব্দটিকেও বাড়না-রূপ ছাড়িয়া বান্না রূপ ধরিতে হইয়াছে। এইরূপে 'বান্না' শব্দটি সহচর না হইয়া অনুচর হইয়া পড়িয়াছে। পাড়া-পড়শী—এখানে 'পড়শী' বুঝি, কিন্তু পড়শীর সঙ্গে পাড়ার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে, সহজে বোঝা যায় না। পাড়া-পড়শী—পাড়া প্রতিবেশীও শোনা যায়। বস্তুতঃ পাট-বাসী ও প্রতি-বাসী (বা প্রতিবেশী)। দুইটি শব্দেই 'বাসী'; প্রথমটির বাসী কাটিয়া 'পাট-প্রতিবাসী'—'পাড়া-পড়শী' হইয়াছে।

অন্ধি-সন্ধি—সন্ধির সহিত ধ্বনিতে ও অর্থে মিল রাখিতে গিয়া রন্ধ্র শব্দের র লোপে অন্ধি হইয়াছে। শব্দের আদ্য র লোপ করায় বিচিত্র কিছু নাই। হাড়-গোড়—হাত ও গোড় (বা পা); 'গোড়' শব্দের সহিত মিলিতে 'হাত' শব্দ 'হাড়' হইয়াছে। এইরূপ আশ-পাশ, দিশ-পাশ, আঁকা-জোঁখা, লেখা-জোখা, অলি-গলি, অশ্লতলা-বেলতলা, ভয়-ডর, কাচ্চা-বাচ্চা, কাঁটা-খোঁচা, ঝড়-ঝাটি, উকি-ঝুকি, তেরি-মেরি, পাজি-পুঁথী, আকুলি-বিকুলি, বোল-চাল, উসি-মুসি, এলো-মেলো, শোধ-বোধ, কচু-ঘেচু, ভাই-ভাগারি, ইত্যাদি শব্দের কোনটা সহচর কোনটা বা সানুচর হইয়াছে।

।৵০ যে যুগল শব্দের ধ্বনির মিল নাই, স্থানভেদে তাহার রূপ ভিন্ন হইয়া থাকে। 'বন জঙ্গল' শব্দের দুইটিতে অনুনাসিক ধ্বনি আছে, কিন্তু এই মিল তত কাজের নয়। এখানে অর্থের মিল শব্দটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তথাপি 'বন-ঝোড়', বনে-বাদাড়ে' শব্দ আছে। 'বাঘ-ভালুকের' পরিবর্তে 'বাঘ-সিংহ' বা 'বাঘ-সিংঘি হইতে পারে না, কারণ বাঘ ও সিংহ শব্দের ধ্বনিতে কিছু মাত্র মিল নাই। সিংহ জন্তুটা বাঙ্গালা দেশের লোকের দর্শনেও আসে না। বাঘ ও ভালুক শব্দের আদ্য বর্ণে আ স্বরের মিল, এবং দুই জন্তুই এক প্রকার ভয়াবহ। শিআল শব্দের মাঝে আ আছে; বাঘের তুল্য ভয়ানক জন্তুর ভাব মনে না আসিলে বাঘ-শিআল শব্দ হইতে পারে। 'বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা'—ঘ এর জন্ত কথাটা এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তা ছাড়া, কোককে (বন্য কুকুর, সং কোক=বাং ঘোঘ) বাঘ ভয় না করুক, কোকের পালকে খুব করে। ধ্বনির মিল এবং অর্থসাদৃশ্য না থাকিলে যুগল-শব্দ স্থায়ী হয় না। এই দুই কারণে

কবিতা, বিশেষতঃ যাহাতে অনুপ্রাস আছে তাহা আমাদের মনে থাকে, এবং ছেলে-ভুলান। ছড়া এত কাল স্থায়ী হইয়াছে। অনেক ছড়ার ভাষা এখন বোঝা কঠিন হইয়াছে, কারণ বহুকাল ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং অর্থ স্পষ্ট না হওয়াতে শব্দও বিকৃত হইয়াছে। সার-গর্ভ ভাব না হউক, প্রত্যেক ছড়ার অর্থ ছিল বা আছে।

।৶০ অর্থ ভুলিলে শব্দের ভুল হয়। ঠাকুর-মহাশয়ের লিখিত উদাহরণে তাহা দেখা যাইতেছে। তাহাঁর কএকটি শব্দ পূর্বে বা এখনও শুনি নাই। যথা, 'জন্তু-জানোয়ার', 'চোতা-পত্র',—জন্তু-জানোয়ার শব্দের অর্থে ভুল হইবার নহে, কিন্তু অধিক প্রচলিত বলিয়া মনে হয় না। কারণ জানোয়ার শব্দটি দীর্ঘ। খাতা-পত্র, চোঁতা খাতা জানি। কিন্তু চোঁতা-খাতা যুগল শব্দ নহে। কএকটি শব্দের বানানে, সুতরাং মনে হয় উচ্চারণের প্রভেদ পাই। ঝাঁকরা-মাকরা (ঝাঁকড়া-মাকড়া ?), মেখে-চুখে (মেখে-চেখে ?), নাচা-কোঁধা (নাচা-কোঁদা ?), বয়ে-ছেয়ে (বেয়ে-চেয়ে ?), ছকড়-নকড়া (নকড়া-ছকড়া ?), দত্যি-দানো (দত্যি-দানা ?), ইত্যাদি। এইরূপ কারণে 'আগডম বাগডম ঘোড়াডম সাজে' ইত্যাদি ছড়ার অর্থ-উদ্ধার দুষ্কর হইয়াছে। দূরবর্তী নানা স্থান হইতে ছড়াটি পাইলে শব্দ-বিকারের প্রভেদ দ্বারা অর্থ করিবার সূত্র পাওয়া যাইবে (কোষ দেখ)।

৸০ দুই শব্দের অর্থে ও ধ্বনিতে মিল হইয়া 'ইত্যাদি' অর্থে সহচর শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এমন যুগল শব্দও আছে, যাহার অর্থে বিরোধ কিন্তু ধ্বনিতে মিল আছে। রাজা-প্রজা, ঠাকুর-কুকুর, মেয়ে-মদ্দ, দুখ-সুখ, উত্তম-অধম, নরম-গরম, আগা-গোড়া, মিছা-সাচা, ঘর-বাহির, সদর-অন্দর, ডাঙ্গা-ডহর, সকাল-বিকাল, সাঁঝ-সকাল, সকাল-সন্ধ্যা, নিশি-দিশি, ইত্যাদি। এই সকল উদাহরণের যুগল-শব্দের অর্থে বিরোধ-ভাব থাকিলেও ব্যাপ্তি-অর্থ আছে। বরং বিরোধ-দ্বারা অর্থ বিস্তার ঘটিয়াছে। সমাজ নীতিতে যাবতীয় মানুষের দুই ভাগ, রাজা ও প্রজা; মানে ঠাকুর এক দিকে কুকুর আর এক দিকে; ভূপৃষ্ঠ ডাঙ্গা ডহর—উচ্চ ও নীচ ভূমি ব্যতীত সমান ভূমি দুর্লভ। দুখ-সুখ, মিছা-সাঁচা, আগা-গোড়া, জোড়া-তাড়া প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দ-যুগলে আদি অন্ত উল্লেখ দ্বারা অন্তঃস্থিত সমস্ত দ্রব্য-গুণ-কর্ম বুঝায়। আশা-ভরসা, আপদ-বিপদ, শাড়া-শব্দ, জীব-জন্তু, ভাই-ভায়াদ, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ধর-পাকড়, মারা-ধরা, হাসি-খুসি, তাড়া-হুড়া ইত্যাদি যুগল শব্দের দুইটি শব্দের অর্থ প্রায় এক। এইরূপ শব্দ দ্বারা এক এক দ্রব্যের গুণের কর্মের সমস্ত অংশ প্রকাশিত হয়। বিরোধী শব্দযুগল দ্বারাও তাহাই হয়। একটিতে সাদৃশ্য অন্যটিতে বৈসাদৃশ্য; কিন্তু উভয়ের মূল অভিপ্রায় এক। বিরুদ্ধার্থ যুগল শব্দ প্রতিচর শব্দ বলা যাইতে পারে।

৷৶০ সমাস-হেতু কোন কোন শব্দ সহচর শব্দের আকার পাইয়াছে। নটের সঙ্গে ঘটনা —নট-ঘট; ভিটা-মাটি উচ্ছন্ন করিলে ভিটার যে মাটি তাহাও দূরে ফেলিয়া দিতে হয়; লোকের নাম ও ধাম জানিতে পারিলে চিনিয়া রাখিবার উপায় হয়; যে চোখে-মুখে কথা কয়—সে চোখ ও মুখ ব্যতীত অন্য উপায়ে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না; যার ধোপা-নাপিত বন্ধ,

সমাজে তার সব বশ; কন্যার পিতা বর দেখে ও ঘর দেখে, এই দুই ছাড়া আর কিছু চায় না।

৷৷৵০ এখন সোপচর ও সপ্রচর শব্দ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে। চুরি-চারি, ঠাকুর-ঠুকুর, ঠার-ঠোর, ঠুক-ঠাক, টিপ-টাপ, তুক-তাক, ধুম-ধাম, ধাক্কা-ধোক্কা, ফুস-ফাস, ভুরি-ভারি, ভোঁ-ভাঁ, মিট-মাট, হুপ-হাপ ইত্যাদির দ্বিতীয় শব্দ উপচর। এরূপ শব্দ অধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা; কারণ শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই। কিন্তু দেখা যায়, যে সকল শব্দের আদ্য অক্ষরে অ আছে, তাহাদের উপচর নাই। প্রধান শব্দের আদ্য অক্ষরে আ এবং ই কিংবা উ থাকিলে উপচর যথাক্রমে ও এবং আ হয়।

৷৷৶০ বোধ হয় এই নিয়ম আছে বলিয়া উপচর বিকার-প্রাপ্ত হয় না। চুরি-চারি, চুরি-চামারি, চুরি-ডাকাতি—তিনটি শব্দ আছে। তিনটির অর্থ এক নহে। চুরি-ডাকাতি সহচর শব্দ; চুরি-চামারি সানুচর শব্দ বোধ হয়। তবে, চামার (চর্মকার) জাতি চোর হইত কি না, তাহা বিচার্য হইতে পারে। চামারে গোরু মারে—এ কথা অনেকে বলে। ঠাকুর-ঠুকুর উক্ত নিয়মে ঠাকুর-ঠোকুর হইবার কথা; ঠো পরে উ থাকাতে ঠুকুর হইয়াছে। ঠাকুর-ঠুকুর ছাড়া ঠাকুর-দেবতা সহচর শব্দও আছে। কিন্তু কোনটিতে ধ্বনি ও অর্থ, দুইএর মিল নাই। এইহেতু বোধ হয় দুইটাই সমান ভাবে চলিত আছে। চুরি-চারি প্রায় শোনা যায় না; কারণ অন্য সহচর ও সানুচর শব্দ আছে। সহচর ও সানুচর শব্দের দিকে ভাষার অধিক টান। অভাবে সোপচর, ইহারও অভাবে সপ্রচর শব্দ প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কোন কোন শব্দ আকারে সোপচর, কিন্তু প্রকৃতিতে সহচর কিংবা সানুচর। ধার-ধোর, ঝাল-ঝোল, এইরূপ।

৸০ ঘটী-টটী সপ্রচর শব্দ। ঘটী-বাটী এবং ঘটী-টটী—এই দুইএর অর্থে প্রভেদ আছে। ঘটী-বাটী—ঘটী, বাটী এবং এইরূপ দ্রব্য। ঘটী-টটী বলিলে ঘটী মাত্র জানা গেল; আর যে কি চাই, তাহা কথার প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে। স্নানের সময় ঘটী গামছা জল ইত্যাদি, রন্ধনের সময় ঘটী বাটী থালা ইত্যাদি, জল রাখিবার সময় ঘটী তুল্য কোন পাত্র। অতএব ঘটী-বাটী এবং ঘটী-টটী—দুইটি শব্দ দ্বারা অনির্দেশের দুই মাত্রা পাই।

৸৵০ ঠাকুর-মহাশয় দেখাইয়াছেন, বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া যে কোন শব্দ হউক, ট সকলের পাশে বসিতে পারে। জল-টল, ভাল-টাল, ভেব্যো-টেব্যো। কখন কখন ট এর স্থানে ফ বসে। কেহ কেহ ট ছাড়িয়া কেবল ফ লইয়া টানা-হেঁচড়া করে। টাকা-ফাকা থাকিবেই; বারাণ্ডা-ফারাণ্ডা, কাগজ-ফাগজ ইত্যাদিও বলে। বোধ হয় অনাদরে ট স্থানে ফ ও ম বসে। কাজ-কর্ম কি কাজ-টাজ ছাড়িয়া যে কাজ-ফাজ বলে, সে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া বলে। হুঁকা-ফুঁকা বলা ধীরতার লক্ষণ নহে। হুঁকা-মুঁকা বলিলে হুঁকার অনাদর বুঝায় না, কিন্তু হুকা-টুকা শব্দে কিছুমাত্র নয়। ম ও স এর অধিকার অল্প; এবং এই দুইএর যোগে যে শব্দ চলিত আছে, তাহা অনেক স্থলে সহচর শব্দ। জড়-সড়, চটিয়া-মটিয়া, সহচর শব্দ ম ও স যোগ-সিদ্ধ শব্দ পাইবা মাত্র প্রচর শব্দ বলিতে পারা যায় না।

৸৵০ কোন কোন যুগল শব্দের দ্বিতীয়টি প্রথমের ঈষৎ পরিবর্তনে আসিয়াছে। আছাড়-কাছাড়—আছাড় হইতে কাছাড় (কোষ দেখ)। ফষ্টি-নষ্টি শব্দের কোনটি প্রধান, তাহা বলা কঠিন। আনাচ-কানাচ শব্দে বোধ হয় কানাচ হইতে আনাচ।

১৪৯। সঙ্খ্যা ও পরিমাণ নির্দ্দেশে।

৴০ খান, খানা, খানি,। বস্তু ও বস্তুর সঙ্খ্যা নির্দ্দেশে খান খানা খানি বসে। কিন্তু প্রয়োগের সাধারণ সূত্র বাহির করা কঠিন।

জমি খানা, ঘর খানা, নৌকা খানা, বই খানা, মাদুর খানা, কাপড় খানা, থালা খানা, বাঁশ খানা, লাঠী খানা, ছড়ী খানা, ইট খানা, পাথর খানা, হীরা খানা, গহনা খানা হয়; কিন্তু পুকুর খানা, গাছ খানা, ঘটী খানা, জাঁতা খানা, দোড়ী খানা, কলম খানা হয় না। অতএব বোধ হয়, যে দ্রব্য বিস্তৃত, যাহার খণ্ড আছে বা হইতে পারে, যাহা কঠিন, যাহা মূল্যবান্, এবং যাহা অ-জীব, তাহার নামের সঙ্গে খানা যোগ হইতে পারে। সং খণ্ড হইতে খানা। ইহাতে বোধ হয়, যে দ্রব্যের খণ্ড কল্পনা করিতে পারি, এবং খণ্ডিত হইলেও যাহা কাজের যোগ্য থাকে, তাহার নামের পাশে খানা বসিতে পারে। খান ও খানা একই; খানা হইতে খানি (হ্রস্বার্থে ঈ হইবার ছিল) আদরে বসে।

দেহ হইতে পৃথক্ কল্পনা করিতে পারি বলিয়া হাত-খানা, পা-খানা হয়। হাত-পা কাটা গেলেও দেহ-খান থাকে। কিন্তু বুক পেট মাথা কাটা গেলে থাকে না। কাজেই বুক-খানা, পেট-খানা, মাথা-খানা বলা চলে না। ছুরী কাঁচী করাত কাটারী খণ্ডিত হইলেও কাজ চলে। কিন্তু বাটালী ভাঙ্গিয়া গেলে কাজ চলে না। বোধ হয় এইহেতু ছুরী কাঁচী করাত—খানা বলা যায়, এবং বাটালী-খানা বলা যায় না। জাঁতী-খানা হয়, কিন্তু জাঁতা-খানা হয় না। কারণ জাঁতীর এক খণ্ডে কাজ হইতে পারে, জাঁতার এক খণ্ডে বড় একটা পারে না। লণ্ঠন-খানা হয় না; কারণ খণ্ড হইলে লণ্ঠন অ-কেজো হয়।

৵০ আদরে বক্তার ইচ্ছা-মত অন্য দ্রব্য-বাচক শব্দের সহিত খানা খানি বসিতে পারে। 'আহা বাছার মুখ-খানি শুকিয়ে গেছে।' কিন্তু যাহাকে দেখিতে পারি না, তাহার 'মুখ-খানি' বলি না। কৃত্তিবাসে, 'কন্যাখানি', 'কন্যা এক-খানি' পর্যন্ত আছে। কেহ কেহ 'কথার ভাব খানা'ও বুঝিতে বলে। ব্যঙ্গোক্তিতে খানি বসে। যথা, চণ্ডীদাসে (১৮০), 'ছুঁইও না ছুঁইও না বন্ধু ঐ খানে থাকে। মুকুর লইয়া চাঁদ-মুখ-খানি দেখ॥'

৶০ সঙ্খ্যা-বাচক শব্দের পরে খান, খানা, খানি বসিলে সঙ্খ্যা নির্দিষ্ট এবং পূর্বে বসিলে অনির্দিষ্ট করে। পূর্বে বসিবার সময় খানা খানি হয় না, হয় খান। যথা, পাঁচ খান, পাঁচ খানা, পাঁচ খানি বই; কিন্তু 'খান পাঁচ বই'। 'খান পাঁচ বই'—প্রায় পাঁচ খান। 'খান কত বই চাই'—কএক খান।

।০ যে দ্রব্য গণিতে পারা যায় না, মাপিয়া বা তৌল করিয়া লইতে হয়, তাহার অনির্দিষ্ট

পরিমাণ বুঝাইতে খানা খানি বসে, কিন্তু দ্রব্য-বাচক শব্দের পূর্বে বসে। এস্থলে খান বসে না। যথা, কত খানি দুধ, এত খানি বেলা, কত খানি সোনা, এত খানি জমি।

।/০ যত তত এত কত না থাকিলে খানিক অনির্দেশে বসে। 'খানিক জল', 'খানিক জায়গা'। আরও অনির্দেশে খানিক-টা। 'খানিকটা জল', 'খানিকটা জায়গা'।

।৵০ টা, টি। অজীব সজীব যাবতীয় পদার্থের নামের পাশে টা বসিয়া বস্তু নির্দেশ করে। ছোট-বড়, সরু-মোটা. দ্রব-কঠিন, কোনও পদার্থের নামের সহিত টা এর বিরোধ নাই ; যথা, মানুষটা, গোরুটা, গাছটা, মাদুরটা, নৌকাটা, থালাটা, লাঠিটা, বোতলটা, দোড়ীটা, কাপড়টা, গামছাটা, পুকুরটা, জমিটা, ইত্যাদি। বিশেষ এই, যে শব্দের পরে খানা বসিতে পারে, নিতান্ত অবজ্ঞা না করিলে টা প্রায়ই বসে না। কাপড়টা-চোপড়টা, জুতাটা-লাঠিটা, ঘরটা-দোরটা, ইটটা-পাথরটা, ছুরীটা-কাঁচীটা, খাতাটা-পত্রটা, শাগটা-মূলাটা, ইত্যাদি যাবতীয় যুগল শব্দের পরে টা বসিতে পারে, কিন্তু অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে ছাড়ে না। বক্তার ইচ্ছায় যখন খানা বসিতে পারে, না বসিতেও পারে, তখন খানা র প্রয়োগ বাঁধা নাই বলিতে পারা যায়। রাঢ়ে 'কাপড় খানা' এবং 'কাপড়টা'—দুইই বলা চলে। ওড়িয়াতে 'খণ্ডিএ বস্ত্র', 'গোটিএ বস্ত্র'—একখানি বস্ত্র, একটা বস্ত্র—বলা চলে।

।৶০ যাহার পাশে টা বসিতে পারে, তাহার প্রতি আদরে টি (হ্রস্বার্থে ঈ হইয়া টী হইবার কথা), এবং তাহা ছোট হইলেও টি বসে।* 'টাকাটা গেল, খাওয়াটা ভাল হ'ল না, জুতা জোড়াটাও হারালাম, কিন্তু যাই বল মানুষটি ভাল'—আদরে টি অনাদরে টা পাইতেছি. 'অভাগা দুটা ভাতও পায় না', 'আমায় চারিটি ভাত চাই'—বিশেষণ শব্দে টা টি যুক্ত হইলে বিশেষ্যের প্রতি অনাদর আদর বুঝায়। টা দ্বারা বৃহত্তের ভাব আসে, যেন বৃহৎ বস্তু আদরের যোগ্য নয়। মাণিকে (৯৭), 'পড়ে আছে বাঘটা সে পর্ব্বত যেমন।' 'দীর্ঘ বড় দাড়িটা দারুণ গোঁপ দুটা।' বাঘটা যে বৃহদাকার এবং দাড়িটা যে কুৎসিৎ ও দীর্ঘ, তাহাতে সন্দেহ নাই। টি যোগে ক্ষুদ্রতা বুঝায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আদর প্রকাশিত হয়। 'তখন সে ছোট', 'তখন সে ছোটটি ছিল'—ছোটটি—ছোট ও আদরের যোগ্য। 'এত বড়টি হয়েছে'!—আদর ত আছেই, বড় হইলেও বেশী বড় হয় নাই। সংস্কৃতেও টি টী আছে। সং বধূটী গ্রামটী শব্দের টী দ্বারা ক্ষুদ্রতা বুঝায়। সং বধূটী বা' বউড়ী বলিলে বৃদ্ধা এমন কি প্রৌঢ়াও বুঝায়। ওড়িয়াতেও টি আদরে টা অনাদ'রে বসে।

---

* কেহ টা, কেহ টি বানান করেন। সংস্কৃতের সাদৃশ্যে টী বানান আসে। কিন্তু সেই সাদৃশ্যে খানী, গুলী, ঈকার দিয়া বানান করিতে হয়। 'সেখানে একটি গাছ আছে'—একটা বলিলেও চলিত। 'সেখানে একটী গাছ আছে. দুটী নাই'—এখানে টী লেখায় সুবিধা আছে। অর্থাৎ বিশেষ নির্দেশে টী সামান্য নির্দেশে টি রাখিলে মন্দ হয় না। অনেকে টা স্থানে টি (বা টী) বলিয়া থেকেন। কিন্তু সে দোষ বা অভ্যাস কেবল টা টি বেলা নয়।

৷৹ টা টি সঙ্খ্যা-বাচক, পরিমাণ-বাচক নহে। কিন্তু যত তত কত এত শব্দের পরে টা বসিয়া অনির্দিষ্ট পরিমাণ জানায়। এখানে টি বসে না। যথা, এতটা দুধ, কতটা জমি। এখানেও অনাদরে টা, আদরে খানা খানি।

৷/০ টুক, টুকু। পরিমাণ অত্যল্প হইলে টুক, টুকু। টুক দ্বারা অল্প পরিমাণ প্রকাশ পায় বলিয়া আদরও বুঝায়। টুকু দ্বারা আদর বৃদ্ধি হয়। 'মুখে জল-টুকু দিবার লোক নাই'; সোনা-টুকু। একটুক, একটুকু—অত্যল্প। ক লোপে একটু। একটা কিংবা একটি শব্দ রূপান্তরে একটু নহে। কারণ একটা একটু সঙ্খ্যা-বাচক, একটু পরিমাণ-বাচক। এই টুকু, টুক এর সহিত সং টুণ্টুক (অল্প) শব্দ তুলনা করা যাইতে পারে।*

৷৶০ গোটা। সঙ্খ্যা-বাচক শব্দের পূর্বে গোটা শব্দ বসিয়া সঙ্খ্যার প্রায়িক অর্থ দেয়। যথা, গোটা দশ টাকা দরকার—অর্থাৎ দশ, নয়, এমন কি আট টাকা পাইলেও চলে। যে বস্তু-বাচক শব্দের সঙ্গে টা বসিতে পারে, তাহারই আসন্ন সঙ্খ্যা বুঝাইতে গোটা বসে। 'ধুতিটা' বলা যায় না, 'গোটা চারি ধুতি' ও বলা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালায় গোটা শব্দ বর্তমান একটা ও টা তুল্য ছিল। যথা, কৃত্তিবাসে, 'না থোব এক গোটা'—একটা; 'শরা গোটা'—একটা; 'ভাই চারি গুটি'—চারিটি। কবিকঙ্কণেও, 'দুই দিগে দুই গোটা কলসী বসায়।' মাণিকেও, 'চারি গোটা চাবুক মারিল বাম হাতে।' আসামীতে গোটা গোট—দুই রূপ আছে। ঘর গোট=ঘর গোটা=ঘরটা। বাং গোটা শব্দের সহিত ওং গোটিএ শব্দ তুলনা করা যাইতে পারে। গোটিএ=এগোটি=একটি। সং একঃ=সং-প্রাকৃতে এগো হইত (তুং সং একাদশ=এগারহ)। অতএব গোটা=একটা। এইহেতু গোটা ধন্যে, গোটা পান বলিলে একটা ধনিয়া একটা পান অর্থাৎ অখণ্ডিত ধনিয়া ও পান বুঝায়। এইরূপ আসামীতে গোট। আসাং গোটেই—সমুদায়। বিদ্যাপতি, 'হৃদয় মুখেতে এক সমতুল কোটিকে গুটিক পাই'—মনে ও মুখে এক, এমন লোক কোটির মধ্যে একটি পাওয়া যায়। গোটা হইতে গোটি—গুটি।† যাহা হউক দেখা যাইতেছে প্রথমে যাহা একটা মাত্র ছিল, পরে তাহার বিকারে অনির্দিষ্ট সঙ্খ্যা অর্থ আসিয়াছে। পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে গোটা শব্দের প্রাচীন অর্থে প্রয়োগ আছে। কিন্তু ট লুপ্ত হইয়া গোআ, গো, গুআ প্রভৃতি অবশিষ্ট রহিয়াছে। তিনটা না বলিয়া তিন-গো কিংবা তিন-গোআ—অর্থাৎ প্রাচীন তিন-গোটা। টা প্রত্যয়ের উৎপত্তি গোটা, ইহা স্বীকার করিলেও প্রথমতঃ গোটা শব্দের উৎপত্তি জানা আবশ্যক। সং গুটী, গুটিকা শব্দের অপভ্রংশে বাং গোটা আসিয়া থাকিলে অর্থের সম্প্রসারণ অঙ্গীকার করিতে

---

* যথা, মেদিনী, টুণ্টুকঃ শোণকাল্পয়োঃ—টুণ্টক অর্থে রক্ত বর্ণ (যেমন লাল টুকটুক), এবং অল্প। কেহ কেহ টুকুন বলে। সং টুণ্টক হইতে টুকুন স্পষ্ট। মা শিশুর কপালে টুকু দেন; সে টুকু বাং টিকা সং তিলক শব্দ হইতে।

† একটি পো—(পুত্র, বালক) নাচিলে ওড়িষাতে গোটি-পো—গটিপো নাচ বলে, যদিও অধুনা একজন নহে প্রায়ই দুই জন বালক নাচে।

হয়। ইহাতে কিন্তু, ও° গোটাএ শব্দ পাই না। গুলা, গুলি যদি এক-সঙ্খ্যাবাচক হইত, তাহা হইলে স° গুটী হইতে বা° গোটা অনুমান দৃঢ় হইতে পারিত।

॥৶০ এক। এক শব্দের দুই অর্থ আছে, সঙ্খ্যা এক, এবং কোন্। 'এক যে ছিল রাজা'—এখানে এক-সঙ্খ্যক বলা অভিপ্রায় নহে। এইরূপ, 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল'—এখানে দুই তিন হইতে প্রভেদ করিবার অভিপ্রায়ে এক শব্দ বসে নাই। সংস্কৃতেও এক শব্দের এইরূপ অর্থ ছিল। একো ব্যাঘ্রঃ—বাঙ্গালা এক বাঘ। সংস্কৃত এক শব্দের বহুবচনও হইত (একাঃ)। তখন অর্থ হইত কেহ কেহ, কতকগুলা, কএকজন ইত্যাদি। বাঙ্গালাতে এক শব্দের অনির্দিষ্ট অর্থ আছে বলিয়া এক-সঙ্খ্যা বুঝাইতে হইলে একটা, একটি, একটী বলিতে হয়। অন্য সঙ্খ্যাবাচক শব্দের উত্তর এক বসিলে সে সঙ্খ্যা দ্বারা আসন্নমান প্রকাশিত হয়। যথা, দিন পাঁচেক পরে যাব,—ঠিক পাঁচ দিন পরে নহে। শের দশেক মাছ, টাকা পঁচিশেক মাহিনা, কাহন তিনেক আম, ইত্যাদি। ইকারান্ত সঙ্খ্যা-বাচক শব্দের উত্তর বসিলে এক শব্দের এ লুপ্ত হয়। এইরূপে, টাকা কুড়িক। ষাটি শব্দ প্রায় ষাট উচ্চারিত হয়। এইহেতু 'টাকা ষাটিক', 'টাকা ষাটেক' দুইই হয়। 'শতেক'—প্রায় এক শত। এইরূপ, 'হাজারেক', 'সহস্রেক'। কিন্তু 'লাখেক' হয় না; বলা যায় 'লক্ষেক', প্রায়ই লাখটাক বা লাখখানেক (টাক ও খানেক পরে দেখ)। কবিকঙ্কণে, 'নিমিষেকে গেল সাধু যোজনেক বাট।' এক নিমিষে (প্রায়) এক যোজন পথ। 'শতেক গাঁয়ের শতেক কথা'—ইহা হইতে, 'শতকে এক জন পায় কি না পায়'। হয়ত শতেকে অর্থাৎ শতেক+এ (প্রতি অর্থে অধিকরণ কারকের এ) শব্দ শুদ্ধ করিতে গিয়া শতকে (শত জনে, শত দ্রব্যে) লিখিতেছি। 'দিনে দিনে', 'দিনকে দিন', 'দিনেকে দিন', আরও কত দেখিব!—তিনপ্রকারই শোনা যায়। ওড়িয়াতে 'দিনকু দিন'। অতএব বোধ হয় প্রতি অর্থে কে এবং প্রতি অর্থে এ—দুইই বলিতে হইবে।

'সেখানে দু-এক জন লোক ছিল', সেখানে জন দু-এক লোক ছিল'—প্রথম উদাহরণে দুই কিংবা এক নহে, (তু° তিন চারি, নয় দশ); দ্বিতীয় উদাহরণে প্রায় দুই। এইরূপ, সঙ্খ্যাবাচক শব্দে এক যুক্ত হইয়া দ্রব্য বা পরিমাণবাচক শব্দের পরে বসিলে প্রায়িক অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ, হাত পাঁচ, বছর দশ, দিন দশ, শের ছয়—ইত্যাদি উদাহরণে এক যুক্ত না হইয়াও পরিমাণবাচক শব্দের পরে সঙ্খ্যা বলিয়া আসন্নমানতা বুঝাইতেছে। এক শব্দ যোগ করিলে আসন্নমানতা স্পষ্ট হয়। 'দিন দশেক' 'শের ছয়েক,' ইত্যাদি। আসন্ন-মানতা প্রকাশের আরও এক উপায় আছে। যথা, দিন দশ-বার, শের পাঁচ-ছয়। অর্থাৎ নিকটবর্তী দুইটি সঙ্খ্যা বলিয়া উদ্দিষ্ট সঙ্খ্যার সীমা জানানা হয়। এইরূপ প্রয়োগে সঙ্খ্যাদ্বয় পরিমাণবাচক শব্দের পূর্বে কিংবা পরে—দুই স্থানেই বসিতে পারে। যথা, নয়-দশ শের মাছ, শের নয়-দশ মাছ; পাঁচ-ছয় খান ধুতি, খান পাঁচ-ছয় ধুতি; ইত্যাদির একই অর্থ।

৸০ অন্য শব্দের উত্তরও এক হয়। বারেক দেখা করিবে—ঠিক একবার নয়। এই-

রূপ, আধেক, অর্ধেক। জনেক, বারেক, ক্ষণেক, তিলেক প্রভৃতি শব্দ ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইতেছে।

৮/০ কত+এক=কতেক, অর্থাৎ প্রায় কত, বা কিছু। কতেক হইতে কএক, কয়েক (ত লুপ্ত)। কতেকটি—কএকটি, কয়েকটি (তু° কত=কয়—ক)। কতেক হইতে, কতক। এতেক, যতেক পদ্যে পাওয়া যায়। ততেক শব্দ শোনা যায় না। স° কতি, যতি, ততি শব্দের উত্তর স্বার্থে ক বসাইয়া কতিক, যতিক ততিক এবং এই সকল শব্দ হইতে বা° কতেক যতেক ততেক মনে করা যাইতে পারে। তখন যতেক ততেক শব্দের প্রায়িক অর্থ থাকে না।

৮৵০ খান কতক, গোটা কতক শব্দের প্রয়োগের সময় খান ও টা এর প্রয়োগ রক্ষা করিতে হয়। 'খান-কতক লুচী', গোটা-কতক ভাত, খান-আষ্টেক ধুতি, গোটা-পঁচিশেক টাকা ইত্যাদি। গোটা-চারি-এক=গোটা-চারেক (রাঢ়ে গ্রা° গোটাচেরেক, আসামীতে গোটাচেরেক)—অর্থে কিছু।

৮।৹ খানেক, টাএক। টা বস্তুর সঙ্খ্যা নির্দেশ করে, টাএক আন্দাজি সারে। এক-যোগে টা দ্বারা নির্দিষ্ট সঙ্খ্যা অনির্দিষ্ট হয়। টাএক এর সংক্ষেপ টাক, টাক। 'দাম টাকা-টাক হবে', 'মণ-টাক চাল', 'বিঘা-টাক জমি', 'ঘটী-টাক জলে', 'কাঁদি-টাক কলা', 'শ-টাক আম'। টাএক এর অধিকার অব্যাহত। 'ঘটীটাক জল', নৌকাটাক ধান', জোড়া-টাক শাড়ী', সবই বলা যায়। খানির অধিকারের বাহিরে খানেকও যায়। 'ঘটীখানেক জল', 'শেরখানেক তেল', 'বিঘাখানেক জমি', ক্রোশখানেক পথ', 'দণ্ডখানেক বেলা'। খানিক শব্দ হয়ত খানেক হইতে আসিয়াছে। কিন্তু শব্দের পূর্বে খানিক, পরে খানেক বসে। প্রয়োগ ও অর্থেও খানিক খানেক এক নহে।

৯৲ খানা, টা এবং অপর কএক বিশেষ শব্দ সঙ্খ্যা-নির্দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, দুই-জন পুরুষ, এক-জন স্ত্রী, দুই-জন বালক, এক-গাছি চুল, এক-গাছা ছড়ী, এক-ছড়া হার, এক-জোড়া জুতা, ইত্যাদি (সমূহ অর্থে শব্দ দেখ।)

১৫০। সমূহ অর্থে।

।০ পদার্থের সমূহ দল বা সমুচ্চয় বুঝাইতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা মানুষের দল, গোরুর পাল, পাখী ও মাছের ঝাঁক, ধানের রাশি, খড়ের ও কাপড়ের গাদা, মালার ছড়া, ধান ও বাঁশ গাছের ঝাড়, কাপড়ের গ্রন্থ বা সুট, ইত্যাদি।

৵০ দেখা যায়, মনুষ্য-বাচক শব্দে দল, চতুষ্পদ জন্তু-বাচক শব্দে পাল, পক্ষী-মৎস্য পতঙ্গ-বাচক শব্দে ঝাঁক, তৃণাদি যে সকল গাছের ঝাড় হয় তত্তৎ-বাচক শব্দে ঝাড়, ধান্য কলায়াদি ক্ষুদ্র শস্য-বাচক শব্দে রাশি, বিস্তৃত করিতে পারা যায় এমন বস্তুর সমূহ বুঝাইতে গাদা, শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

৶৹ এইরূপ, বাজনার বা বাজনদারের খুলী (যেমন বিবাহে দশখুলী বাজনা—দশ দল বাজন-দার), যাত্রা-আলার সম্প্রদায়, বেহারার খাট (যত জন এক এক পালকী—খাট—বহে), ধানের গোছা, ফুলের তোড়া, সূতার মোড়া (এক মোড়াতে অনেক ফের থাকে), গহনার স্যুট,* প্রভৃতি নানা শব্দ আছে। যে অবস্থায়, যে আধারে, বা যে করণ দ্বারা যে যে দ্রব্য দেখা যায় বা নির্মিত হয়, তদনুসারে সে সে দ্রব্যের সমূহ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। দশ-মরাই ধান, পাঁচ-কলশী তেল, দশ-জোড়া জুতা, দুই-জোড়া কাপড় (ধুতি চাদর এক সঙ্গে বোনা হইলে); এক-খুলী মুড়ি, এক-কাঁদি কলা, দুই-ঝাইল কপাট, দুই-সাজ পোষাক, ইত্যাদি।

।৹ নদী পুষ্করিণীর জলের গভীরতা বুঝাইতে আঙ্গুল হাত বাঁশ ব্যতীত হাঁটু, জাং, কোমর বুক, গলা, মানুষ, শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এক-গলা জল—এত গভীর যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। 'নদীতে ডুবন-জল'—এত গভীর যে মানুষ দাঁড়াইলে মাথা ডুবিয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১৫১। অব্যয়।

যে সকল শব্দের উত্তর বিভক্তি বসে না, পুং-স্ত্রী-ক্লীবলিঙ্গে আকার এক থাকে, সংস্কৃত ব্যাকরণে তৎসমুদয় অব্যয়। এই সংজ্ঞা বাঙ্গালায় ঠিক চলে না। কারণ বাঙ্গালাতে বিশেষণ শব্দের লিঙ্গ বচন কারক বিভক্তি নাই। সুতরাং সংস্কৃত-ব্যাকরণের মতে বাঙ্গালা বিশেষণ শব্দ অব্যয় হইয়া পড়ে। ছেলেটি ভাল; মেয়েটি ভাল; ভাল করিয়া বলিবে; ভাল, তার পর কি দেখিলে; ইত্যাদি উদাহরণে 'ভাল' শব্দের পরিবর্তন দেখি না। অতএব বাঙ্গালা ভাষার শব্দ অবিভক্তিক সবিভক্তিক এই দুই ভাগে ভাগ, এবং নাম সর্বনাম বিশেষণ ক্রিয়া-পদ অব্যয় এই পাঁচ ভাগে ভাগ সমান ব্যাপক নহে। প্রথম ভাগ ন্যায়-সঙ্গত, দ্বিতীয় ভাগ ন্যায়-সঙ্গত নহে। নাম সর্বনাম বিশেষণ ক্রিয়াপদ,—শব্দের অর্থগত ভাগ; অব্যয় বিভক্তি-গত ভাগ।† এখানে নামাদি চতুর্বিধ পদ ব্যতীত অন্য পদকে অব্যয় বলা গেল।

অর্থ ধরিলে অব্যয় শব্দ চারিভাগে বিভক্ত। কতকগুলি বিশেষণ ও ক্রিয়াকে বিশেষিত

---

* স্যুট শব্দটি ইংরেজী সেট, সিউট (set, suite) শব্দ হইতে আসিয়াছে কি না, তাহা বলা কঠিন। এক-ছোট্ দো-ছোট্ শব্দের ছোট্ শব্দের রূপান্তরে কাপড়ের স্যুট নয়, বলিতে পারা যায় না। গ্রাম্য লোকেও স্যুট-শব্দ প্রয়োগ করে। সং প্রস্থ শব্দের অর্থ বত্রিশ-পল-পরিমিত দ্রবদ্রব্যের পাত্র। ইহাই আদিম অর্থ। পরে দীর্ঘে প্রস্থে (সং)—দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে—প্রস্থ শব্দের অর্থ, বিস্তার বা অসার (উচ্চারণ দোষে 'ওসার') হইয়াছে। কিন্তু দুই প্রস্থ হিসাব—একই হিসাব দুই বার লেখা বুঝায়। মরাঠীতে 'প্রতি' শব্দ দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরেজী 'কাপি' (যেমন পাঁচ-কাপি বই) শব্দ স্থানীয়।

† আমরা যে অর্থে বাঙ্গালায় সর্বনাম শব্দ প্রয়োগ করি, তাহাও বা কি পাণিনির ব্যাকরণের অনুরূপ নহে। ইংরেজীতে Pronoun সংজ্ঞাও বা কি দোষ-বর্জিত নহে। এইরূপ, বাঙ্গালা ব্যাকরণে কৃৎ-প্রত্যয়, ণিজন্ত ধাতু

করে, কতকগুলি কারক নির্দেশ করে, বাক্য ও পদ সংযোজনা ও বিযোজনা করে, কতকগুলি মনের হঠাৎ আবেগ প্রকাশ করে।* চারি শ্রেণীর নাম করিতে হইলে প্রথম ভাগ বিশেষক-অব্যয়, দ্বিতীয়ভাগ কারক-অব্যয়, তৃতীয় ভাগ সংযোজক-অব্যয়, চতুর্থ ভাগ কেবল-অব্যয়। অ আ অনা না স্থ কু প্রভৃতি কএকটি অব্যয় শব্দের পূর্বে যুক্ত হইয়া অর্থান্তর ঘটায়। এসকল অব্যয় বিশেষক অব্যয়ের অন্তর্গত। পৃথক নাম করিতে হইলে উপসর্গ-অব্যয় বলা যাইতে পারে।

১৫২। বিশেষক-অব্যয়।

/০ বিশেষণ কিংবা ক্রিয়াপদকে বিশেষ করিতে যে সকল শব্দ আছে, সে সকলকে বিশেষক-অব্যয় বলা যাইতেছে। অতি, অতীব, যৎপরোনাস্তি, অতিশয়, বড় (যথা, বড় দুষ্ট), মস্ত (যথা, মস্তবড়), খুব প্রভৃতি শব্দ বিশেষণ-বিশেষক। হঠাৎ, পুনরায়, আবার, প্রায়, প্রায়ই, কদাচ, কবে ইত্যাদি ক্রিয়া-বিশেষক। এখানে ক্রিয়া-বিশেষক অব্যয়-সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা যাইতেছে।

৵০ অনেক অব্যয় সংস্কৃত-আকারে বাঙ্গালায় চলিতেছে। যথা, স্বতঃ, পরতঃ, বস্তুতঃ, ফলতঃ, কার্যতঃ, ধর্মতঃ, যথা, তথা, অন্যথা, ইতি, কদাপি, তথাপি, সদা, সর্বদা, প্রায়শঃ, সহসা, অধুনা, সর্বত্র, একত্র, অকস্মাৎ, পশ্চাৎ, অর্থাৎ, অগ্রে, দূরে, আদৌ, সুতরাং, উপরি, বিনা, সহ, সহিত, অদ্য, সদ্যঃ, পুনঃ ইত্যাদি। কেহ কেহ বস্তুতঃ ফলতঃ প্রভৃতি শব্দের ঃ লিখনে লোপ করেন। কিন্তু উচ্চারণে যখন বিসর্গ (ঃ) শুনি, তখন বানানে লোপ করা ঠিক নহে। সংস্কৃত-আকার রাখিলে ক্ষতি কি আছে?

ইত্যাদি নামও ঠিক নহে। ইংরেজী 'গ্রামারের' আদর্শ ধরিলেও বাঙ্গালায় চলে না। ইংরেজীতে preposition আছে, এবং ইং to অর্থে কে প্রতি ইত্যাদি শেখানা হয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালাতে preposition এর ভাব নাই। সংস্কৃত-ব্যাকরণের সংজ্ঞা রাখিলে বিশেষণকে অব্যয় মধ্যে ধরা কর্তব্য। ক্রিয়ার বিশেষণ, বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ—এই তিন ভাগ আনিলেও শব্দ-বিভাজন ঠিক হয় না। 'যেমন কর্ম তেমন ফল'; যেমন বিশেষ্যের বিশেষণ; 'যেমন দয়ালু তেমন সৎ' যেমন বিশেষণের বিশেষণ; 'তুমি যেমন এলে তেমনই বৃষ্টি হইল'—যেমন ক্রিয়ার বিশেষণ। একই শব্দ তিন প্রকার হইল। অতএব এইরূপ ভাগ বিজ্ঞান-সম্মত হইল না। সংস্কৃত-ব্যাকরণ ভাষার শব্দকে ব্যাকৃত করে, শব্দের ব্যুৎপত্তি বলে। সংস্কৃত-ব্যাকরণে প্রকৃতি (ধাতু ও প্রাতিপদিক) লইয়া আরম্ভ। এইহেতু আমরা বাঙ্গালা-ব্যাকরণে সংস্কৃত-ব্যাকরণের সব সংজ্ঞা লইতে পারি না। শ্যামাচরণ লিখিয়াছেন, 'অব্যয় তাহার নাম যাহার রূপ হয় না', লোহারাম শর্মা লিখিয়াছেন, 'শব্দ রূপের নিয়মানুসারে যাহাতে কোন বিভক্তি যোগ হয় না, তাহাকে অব্যয় কহে'। পণ্ডিত নকুলেশ্বর লিখিয়াছেন, 'বিভক্তি যোগেও যে পদের রূপের পরিবর্তন হয় না, তাহার নাম অব্যয়।' পরে লিখিয়াছেন, 'অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়।' বিভক্তির যোগ না হইতে হইতে লোপ করিয়া লাভ কি?

* বলা বাহুল্য, এই চারি ভাগ ইংরেজী 'গ্রামার' হইতে গৃহীত হইল।

৵০ সং ত্র প্রত্যয়ান্ত অব্যয় শব্দের কএকটি আ প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে। যথা, সং কুত্র—কুথা—কোথা; অত্র—অথা—হথা—হেথা; যত্র—যথা; তত্র—তথা, সেথা; অমুত্র—অথা—হথা—হোথা। কেহ কেহ এই সকল শব্দের পরে (অধিকরণের) য় যোগ করেন। যথা, কোথায়। সং দেবত্র শব্দ (উং দেবত্ত্র—) দেবত্তর হইয়াছে। ইহাকে শুদ্ধ করিয়া কেহ কেহ দেবোত্তর করিতেছেন।

।০ বিশেষ্য ও বিশেষণে এ বিভক্তি যোগ করিলে অব্যয় হয়। যথা, আগে, পরে, সাবধানে, নিঃসন্দেহে, প্রথমে, ধীরে, সুখে, সহজে, ভালয়, ইত্যাদি।

।৴০ বিশেষ্য ও বিশেষ্যের বিশেষণ শব্দও ক্রিয়ার বিশেষণ হইতে পারে। যথা, একদিন থাক; কি মারি মারিয়াছে; ভাল বলিতেছে; বেশ করিতেছে।

।৶০ মন, খন, ত, বে প্রত্যয়ান্ত পদ অব্যয়। যথা, এমন, এখন, এত, এবে।

।৷০ ইয়া, ইতে, ইলে প্রত্যয়ান্ত পদও অব্যয়। যথা, ভাল করিয়া বলিবে, গাইতে গাইতে চল, সে গাইলে তুমি গাইবে। করাতে, হওয়াতে, করায়, হওয়ায়, করিবাতে, হইবাতে প্রভৃতি আতে আয় ইবাতে প্রত্যয়ান্ত পদও অব্যয় মনে করা যাইতে পারে।

॥০ পৌনঃপুন্য বুঝাইতে অব্যয় দ্বিরুক্ত হয়। যথা, বারম্বার, দিন দিন, পয় পয়, কখন কখন। প্রকর্ষ অর্থেও হয়। যথা, তাড়া-তাড়ি, ধীরে-ধীরে। সহচর ও প্রতিচর শব্দেও পৌনঃপুন্য ও বীপ্‌সা বুঝায়। যথা, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন, সদা-সর্বদা, ঘরে-বাহিরে।

ক্রিয়া-বিশেষক অব্যয় স্থান কাল পরিমাণ প্রভৃতি অর্থানুসারে বিভক্ত হইতে পারে। যথা, স্থান-বাচী,—আগে, পেছু, উপরে, হেথা, নিকটে, দূরে, মধ্যে, ভিতরে, ইত্যাদি। কাল-বাচী,—আজ, কাল, এখন, পূর্বে, পরে, মধ্যে, পরশু, পুনঃ পুনঃ, বার বার ইত্যাদি। পরিমাণ-বাচী,—কত, একটু, বহুত, অল্প, বেশী, কম, ইত্যাদি। প্রকার-বাচী,—এমন, এইরূপ, যথার্থ, আচানক, আচম্বিতে, অবশ্য, নিদান, অন্ততঃ, কেবল, ই, ও, ইত্যাদি। সম্মতি-বাচী,—হাঁ, বটে, নিশ্চয়। অসম্মতি বা নিষেধ-বাচী,—না, নাই, উঁহুঁ। প্রশ্ন-বাচী,—কবে, কখন, কোথা, কোন্‌খানে, কি, কী, কেমন। সন্দেহ-বাচী,—কদাচিৎ, কদিচ। অনুকার-বাচী—পেঁক্‌-পেঁক, ঝন্‌-ঝন, ইত্যাদি।

১৫৩। কারক-অব্যয়।

বাক্যে নাম কিংবা সর্বনাম পদের সহিত অন্য পদের সম্বন্ধ বুঝাইতে যে সকল অব্যয় বসে, তৎসমুদয়কে কারক-অব্যয় বলা গেল। যথা,—দ্বারা, করিয়া, হইতে, থেকে, চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা, ঠাঁই, ঠিঁএ, নিকটে, বিনা, পর্যন্ত, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই সকল অব্যয় মূলে বিশেষ্য ক্রিয়া ও বিশেষণ।

কিসে করিয়া, তাহাতে করিয়া, যাহাতে করিয়া ইত্যাদি উদাহরণে করিয়া অনাবশ্যক। 'তাঁর নিকটে, কাছে টাকা আন, লও', ইত্যাদি স্থলে নিকটে, কাছে—অর্থে নিকট হইতে,

কাছ হইতে। তাঁর নিকটে, কাছে, টাকা চাও—যেন তাঁহাকে প্রার্থনা না করিয়া তাঁহার সত্তাকে প্রার্থনা করা হইতেছে।

১৫৪। সংযোজক-অব্যয়।

যে শব্দ দুই বাক্যের যোগ করে, তাহাকে সংযোজক-অব্যয় বলা গেল। অর্থানুসারে এই সকল অব্যয় সমুচ্চয়-বাচক; যথা,—এবং ও আর আরও; বিকল্প-বাচক; যথা,—বা কিংবা অথবা; বিরোধ-বাচক; যথা,—পরন্তু কিন্তু; সন্দেহ-বাচক; যথা,—যদি যদ্যপি যদিস্যাৎ যদিও তবু তথাপি হয়ত নয়; কারণ-বাচক; যথা,—যেহেতু কেননা কারণ; নিষ্পত্তি-বাচক; যথা,—অতএব বাস্তবিক বস্তুতঃ ফলতঃ সুতরাং কাজে কাজে অর্থাৎ ত।

১৫৫। কেবল-অব্যয়।

পদ কিংবা বাক্যের সহিত কেবল-অব্যয়ের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সম্বোধনে, পাদপূরণে, মনের হঠাৎ ভাবের আবেগে যে সকল স্বর কিংবা ব্যঞ্জন-সংযুক্ত স্বর উচ্চারিত হয়, তৎসমুদয় কেবল-অব্যয়। দেবতা মনুষ্য ব্যতীত পালিত পশুপক্ষ্যাদির আহ্বানেও কেবল-অব্যয় শব্দ লাগে।

সম্বোধনের অব্যয়, যেমন,—হে অহে এ গো ইত্যাদির প্রয়োগ পূর্বে বলা গিয়াছে (২০৫ পৃঃ)। মনের হঠাৎ ভাব-প্রকাশক শব্দকে রস-বোধক অব্যয় বলা যাইতে পারে। কাব্যশাস্ত্রে শান্ত রৌদ্র বীভৎস ভয়ানক হাস্য অদ্ভুত করুণ বীর শৃঙ্গার, এই নয় রস বর্ণিত হইয়াছে। শান্তরস-বোধক অব্যয় নাই বলিলে চলে। কারণ শান্ত-ভাবে মনের বিকার অসম্ভব, এবং মনের বিকারেই মুখ দিয়া নানাবিধ ধ্বনি বহির্গত হয়। স্থলবিশেষে আ, হাঁ শান্তরস-বোধক হইয়া থাকে।

ক্রোধজনক রস রৌদ্র। যথা, উঁ, হুঁ, কী, অরেরে, হেঁরে।

ঘৃণাজনক রস বীভৎস। যথা, ছিঃ ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ থুঃ, থুঃ, ধুৎ, দূর, ধিক্, ধিক্ ধিক, রাম, রাম রাম, মহাভারত।

ভয়জনক রস ভয়ানক। যথা, ইস্, ওঃ, ওমা, ও বাবা।

হাস্যরস। যথা, হা-হা, হি-হি, হো-হো।

বিস্ময়জনক রস অদ্ভুত। যথা, আ, আ মরি, এ কি, কী, অহো, বাঃ বাঃ, বাহবা, বলিহারি, ধন্য ধন্য। ইহাদের মধ্যে প্রশংসাবাচকও আছে।

শোকজনক রস করুণ। যথা, আহা, আহা মরি আমার, আহা মরি যাই, হায়, হায় হায়, মা গো, বাবা গো।

যুদ্ধা দিতে উৎসাহজনক রস বীর। যথা, সাবাস, হাঁ-হাঁ, রে রে, রৈ রৈ।

নায়ক-নায়িকার অনুরাগজনক রস শৃঙ্গার। যথা, উ-হু।

১৫৬। অনুকার-শব্দ।

পশু-পক্ষ্যাদির অব্যক্ত ধ্বনির অনুকরণে অনুকার-শব্দের উৎপত্তি। অনুকার শব্দ দ্বিরুক্ত হয়। যথা, ক-ক্, কক্-কক, কা-কা, কুঁ-কুঁ, কুঁই-কুঁই, কেঁ-কেঁ, কেঁউ-কেঁউ, কোঁ-কোঁ, খা-খা, খাঁ-খাঁ, খেঁক্-খেঁক, গাঁ-গাঁ, গাঁক্-গাঁক, গোঁ-গোঁ, গোঁত্-গোঁত্, ঘোঁত্-ঘোঁত্, চিঁচিঁ, চেঁ-চেঁ, চোঁ-চোঁ, ঝিঁ-ঝিঁ, টে-টে, পিঁ-পিঁ, পেঁ-পেঁ, পেঁক্-পেঁক, ভন্-ভন, ভেঁ-ভেঁ, ভোঁ ভোঁ, মিউ-মিউ, মেক্-মেক, ইত্যাদি। দেখা যায়, এরূপ শব্দ প্রায়ই সানুনাসিক হইয়া থাকে। (কোন কোন শব্দের শেষের ক্, ত্ নিমিত্ত ১৩৮ দেখ।)

কিন্তু পশু-পক্ষ্যাদি ডাকিতে হইলে শব্দ সানুনাসিক করা হয় না। যথা, কুর্-কুর, চৈ-চৈ, তি-তি, তু-তু, পুস্-পুস, ইত্যাদি। কুকুর-ছাকে ডাকা হয় কুর্-কুর অর্থাৎ কুর্কুর—কুকুর নামে; ভেক ডাকে মেক্-মেক অর্থাৎ ভেঁক-ভেঁক (তু° মেঢ়া—ভেঁড়া); পিক ডাকে পেঁক্-পেঁক; কোকিল ডাকে কু-কু। এই সকল অনুকার শব্দ স্মরণ করিলে বোধ হয় ধ্বনি শুনিয়া অনেক পশু-পক্ষ্যাদির নাম হইয়াছে।

অনুকার ধ্বনি হইতে কোন-কোন বাদ্য-যন্ত্রেরও নাম হইয়াছে। ঝাঁঝর—ঝাঁ-ঝাঁ করে; ঢাক—ডেং-ডেং করে বলিয়া এক নাম ডঙ্কা হইয়াছে; ঝুম্-ঝুম করে বলিয়া ঝুম্-ঝুমি, ঝুম্‌কা। ধ্বনির অনুকরণে তালের বোল হইয়াছে। যথা, তা-ধিন্-তা ধিন্-ধিন্-তা, তা-তিন্-তা তা-তিন্-তা।

নানাবিধ দ্বিরুক্ত মূল-শব্দ অনুকার শব্দের তুল্য হইয়াছে। যথা, কড়্-কড়, খড়্-খড়, গড়্-গড়, ঘড়্-ঘড়, চড়্-চড়, তড়্-তড়, দড়্-দড়, ধড়্-ধড়, নড়্-নড়, পড়্-পড়, বড়্-বড়, ভড়্-ভড়, মড়্-মড়, লড়্-লড়, সড়্-সড়, হড়্-হড়; কন্-কন, খন্-খন, গন্-গন, ঘন্-ঘন, ছন্-ছন, ঝন্-ঝন, টন্-টন, ঠন্-ঠন, ঢন্-ঢন, ধন্-ধন, ফন্-ফন, বন্-বন, শন্-শন, হন্-হন; কর্-কর, খর্-খর, গর্-গর, ঘর্-ঘর, চর্-চর, ছর্-ছর, ঝর্-ঝর, তর্-তর, থর্-থর, দর্-দর, ফর্-ফর, সর্-সর; ইত্যাদি। কোষে এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাইবে। দেখা যাইবে, অনুকার-শব্দ বলা গেলেও এসবের ধাত্বর্থ আছে (৭৯)।

১৫৭। না অর্থে উপসর্গ-অব্যয়।

অ। সং অগণিত—বাং অগণতি, সং অভাগ্য—বাং অভাগা। এইরূপ, অ-চেনা, অ-জানা, অ-পয়া, অ-ফুরন্ত, অ-বুঝ, ইত্যাদি। 'অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি।' (মধুসূদন)। দেখা যায়, এ সকল শব্দ বিশেষণ। গ্রাম্য প্রয়োগে অ স্বার্থেও বসে। যথা, মন্দ—অ-মন্দ, ঘোর—অ-ঘোর।

আ। সংস্কৃতের অভাব বা বিরুদ্ধ বোধক অ বাঙ্গালাতে আ হইয়াছে। যথা, আ-কাচা, আ-কাট, আ-চোট, আ-ধোআ, আ-বাছা, আ-লোনা, আ-সাঁতোলা, ইত্যাদি। সং

অ-কাল হি° ও°-তে অকাল, বা° আসা° আকাল। অকাল শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে আ আছে বলিয়া প্রথম বর্ণ অ স্থানে আ হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষা আকারের প্রতি অনুরক্ত। কোথায় অ কোথায় আ বসে, তাহা স্থির করা কঠিন। বোধ হয় অ দেওয়াই ভাষার নিয়ম, আ দেওয়া গ্রাম্যতা। আ দ্বারা ঈষৎ অর্থও প্রকাশিত হয়। যথা, আ-লোনা, আ-পাকা, আ-ভাজা, আ-কাটা, আ-খোলা, ইত্যাদি। ইহাতে বোধ হয়, অভাব বা নিষেধ অর্থে অ। অ-করা, অ-জানা, অ-চাখা, অ-মাখা, অ-শোনা, অ-পড়া, অ-স্নাত্ত (অ-স্নাত), অ-খাওয়া, অ-বস্তি, অ-ঘর, অ-কাজুয়া, ইত্যাদি। 'অন-আস্হষ্টি' হইতে অনাস্হষ্টি ; তু° অন-আবৃষ্টি।

কদাচার অর্থে বা° অনাচার। এইরূপ, অনাদায় শব্দে অন উপসর্গ-অব্যয় আছে। হিন্দীতে অন-গঢ়া (বা° আনকরা), অন-গণিত (বা° অগণতি), অন-ছীলা (বা° আ-ছেলা), অন-দেখা (বা° অ-দেখা), অন-কারণ (বা° অকারণ) প্রভৃতি অনেক শব্দে অন আছে। ঈষৎ-অর্থ হইতে সাদৃশ্য-অর্থ আসিয়াছে। আথম্ব জোআন—থম্ব—স্তম্ভ-সদৃশ ; আ-কাঠ মূর্খ—কাষ্ঠ-সদৃশ নিরাট মূর্খ (কোষ দেখ)।

না। স° ন হইতে বা° না। যেমন, স° নাস্তিক, ন-পুংসক। বা° না-পাজ্জি, অ পাজ্জি—দুইই শোনা যায়। না-টক না-মিষ্টি। স° চার অর্থে গতি ; না-চার—অগতি, ফা° লা-চার। ফার্সী না আর্বী লা, অর্থে বা° না। যেমন, না-পসন্দ, না-হক, না-মঞ্জুর, না-বালগ ; লা-খেরাজ, লা-দাবী। এই লা কেহ কেহ না করে। বা° না হইতে নি হইয়া নি-খাঅস্তি।

বি, বে। স° বি ফা° বে দ্বারা নিষেধ, বৈপরীত্য বুঝায়। যথা, বি-জোড়, বি-জুত, বি-চ্ছিরি (বি-শ্রী), বি-আরাম, বে-মালুম, বে-বন্দবস্ত, বে-আবরু, বে-হায়া, বে-আড়া, বে-চারা, বে-চাল, বে-রসিক, বে-টাইম (গ্রা° বে-টাইন), বে-হেড। ইত্যাদি। বি হইতে বে, এবং বে হইতে বি অল্পেই আসে।

নির। নির্জ্জলা (দুধ) অর্থাৎ জলা নহে। এইরূপ, নির্ভুল, নির্গাই।

বর। ফা° বর অর্থে দূরীভূত। যেমন, বর-তরফ, বর-খাস্ত।

গর। ফা° গৈর—অর্থে বা° না। যথা, গর-হাজির, গর- আদায়।

১৫৮। অল্পার্থে।

দর। স° অর্ধ হইতে স°-প্রা°-তে দর। বা° দর-পাকা, দর-কাঁচা। দর শব্দ বিশেষণের পূর্বে বসে।

কম। ফা° কম—নূন। যথা, কম-জোর, কম-বক্তা (অল্প-ভাগ্য)।

আ। স° আ ঈষদর্থে। যেমন আ-পাকা, আ-পোড়া, আ-ভাজা, ইত্যাদি (১৫৭)।

১৫৯। প্রধান অর্থে।

সর। ফা° সর (স° শির—মাথা) অর্থে প্রধান। যেমন, সর-কার, সর-হদ্দ, সর-দার

হেড। ই° হেড (অর্থ মাথা) অর্থে প্রধান। যেমন, হেড-কেরাণী, হেড-মুহুরী, হেড-কনষ্টবল।

১৬০। নিন্দিত অর্থে।

কু। স° কু প্রায়ই স° শব্দের সঙ্গে চলে। যথা, কু-কথা, কু-কাজ, কু-অভিপ্রায়, কু-অভিসন্ধি। কু-নজর...(স° কু+ফা° নজর)।

বদ্। ফা° বদ্ বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত হইয়াছে। বদ্ কথা, বদ্ লোক, বদভ্যাস (বদ্ অভ্যাস), বদ্-মেজাজ, বদ্ মাইশ, বদ্ হজম, বদ্ জাত=বজ্জাত, বদ্ খেয়াল। বদ্ শব্দ বিশেষণও বলা যাইতে পারে।

১৬১। উত্তম অর্থে।

সু। স° সু ফার্সী শব্দের সঙ্গেও চলিতেছে। যেমন, সু-খবর, সু-নজর, সু-বন্দবস্ত। কু এর বি-পরীত সু। 'সই, জানি কু-দিন সু-দিন ভেল' (চণ্ডী:)।

স। স° সু অব্যয় হইতে বা° স। যেমন, সু অবকাশ—সাবকাশ (বিশেষ্য), সুক্ষম—সক্ষম, সুটান—সটান, সুঠিক—সঠিক। অ কু বি না এর বিপরীত সু। অচল অক্ষম—সচল, সক্ষম। না-বালগ—সাবালগ। সুকাল—সকাল বি-কাল (স°)। এইহেতু, সকাল-সকাল কাজ সারা—সু-যোগ্য-কালে। 'সচরাচর দেখা যায় না'—সচরাচর জগতে, অতএব কোথাও।

১৬২। অধীন অর্থে।

দর। ফা° দর স° অন্তর্। যেমন, দর-কার—কাজের মধ্যে সুতরাং প্রয়োজন, দর-মাহা—মাহা-মাসের নিমিত্ত প্রাপ্য (বেতন), দর-দালান—দালানের অন্তর্গত, দর-পত্তনী—পত্তনীর অন্তর্গত।

সব। ই° সব অধীন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, সব-জজ, সব-ডিপুটী, সব-ইনস্পেক্টর, সব-রেজিষ্টার।

১৬৩। প্রতি অর্থে।

প্রতি। স° প্রতি বা° শব্দের পূর্বে সংস্কৃত শব্দের ন্যায় বসে। দিনে দিনে—প্রতিদিন, মাসে-মাসে প্রতিমাস বা প্রতিমাসে। এইরূপ, ঘরে ঘরে—প্রতিঘরে, গাঁএ গাঁএ—প্রতি-গাঁএ, হাটে হাটে—প্রতিহাটে। এই অর্থে প্রত্যেক শব্দও বসে। বঙ্গের স্থানে স্থানে এই বীপ্সার্থক প্রতি শব্দের পরিবর্তে 'প্রায়' শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা, প্রায় বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। স° প্রায় অর্থে বাহুল্য আছে। প্রায় বাড়ীতে—বহু বাড়ীতে।

হর। ফার্সী হর অর্থে প্রত্যেক। যেমন, হর-রোজ (প্রতিদিন), হর-দম (প্রতি নিশ্বাসে), হর-এক—হরেক (প্রত্যেক), হর-বোলা—প্রত্যেক বুলি জানে যে।

১৬৪। আর, আবার।

সং অপর—অঅর—বাং আর; অপর—অৱর—অওর—হিং ঔর; অপর—ওং আবর বা আহুরি; আসাং আরু। সং অন্য হইতে মংতে আণি। বাংতে অপর অর্থে আর বসে। যথা, আর কি বলিব—অপর; আর কে যাবে—অপর। ইতঃপর, অতঃপর অর্থেও আর হয়। যথা, আর কেন সই ভাসাগে যমুনা-জলে (চণ্ডীদাস)।

আর বার (অর্থাৎ পুনর্বার) সংক্ষেপে আবার। সে আবার গেল—একবার গিয়াছিল, পুনর্বার গেল। আবার শব্দ অন্য এক অর্থে কথিত ভাষায় চলে; যেমন, তাকে জানা আছে; সে আবার করিবে। অর্থাৎ আর বা অপর কেহ করিলেও করিত কিন্তু তাহার করা সন্দেহ। বোধ হয়, পুনর্বার অর্থ হইতে এই প্রয়োগ, কিংবা আর স্থানে আবার। 'অপর কথা' অর্থে, এবং বাক্যারম্ভে ইংরেজী-শিক্ষিত কোন কোন আধুনিক লেখক আবার শব্দ প্রয়োগ করেন। এই প্রয়োগ ইংরেজীর অনুকরণে আসিয়াছে।* এখনও বাঙ্গালাভাষার সামিল হয় নাই।

১৬৫। ই।

সং হি হইতে বাং আসাং ই, ওং হেঁ, হিং হী। সংস্কৃতে হি, নিশ্চয় বিশেষ হেতু অসূয়া ও অন্য কএক অর্থ প্রকাশ করিত। বাংতে ই দ্বারা সেই সেই অর্থ পাওয়া যায়। যথা, নিশ্চয়ে, আমি যাবই—আমার যাওয়া নিশ্চিত। বিশেষে, আমিই যাব—আর কেহ যাক না যাক। হেতু, তিনি বলিলেই আমি যাব—আমার যাবার কারণ তিনি বা তাঁহার বলা। অসূয়া, কেই বা জানে কেই বা মানে।

আর কএকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তিনিই বলুন না—এখানে গুপ্ত অভিমান বা ক্রোধ আছে। যেমনই শোনা অমনই আসা—এখানে যেমন অমন অর্থে যেক্ষণ সেক্ষণ; ই ক্ষণ অবধারণ করিতেছে। তোমার একই কথা—ই নিশ্চয়ে। তেমনই লোক বটে!—ই বিশেষ করিতেছে।

অসাবধানে কেহ কেহ ই এর প্রায়ই অপ-প্রয়োগ করিয়া থাকে। যথা, তেমনই লোকই বটে! সেই লোকেই বটে—এখানে লোকই না হইয়া লোক হইবে। কোনই কাজে লাগে না—কোন্ কাজেই লাগে না, বলা উদ্দেশ্য। মানুষ সর্বদাই অসুখী—ই অনাবশ্যক; ই থাকিলে অতিশয়োক্তি হয়, এবং অতিশয়োক্তি কদাচিৎ আবশ্যক। তেমন+ই=তেমনি, তোমার+ই=তোমারি, সন্ধি হইয়াছে। কিন্তু সন্ধি করাতে ই এর নিশ্চয় অর্থ হ্রাস পাইয়াছে। তেমনই—ন অকারান্ত উচ্চারণে ই এর অর্থ দৃঢ় হয়। কেহ কেহ তেম্নি লিখিয়া বসে। কিন্তু এই বানান সমর্থন করিতে পারা যায় না। কারণ তে-ম্নি, এবং তেম-নি উচ্চারণে এক নহে, এবং আমরা তে-ম্নি বলি না।†

---

* ই' again শব্দের অনুবাদে।

† প্রাচীন কবিতায় হি পাওয়া যায়। এই হি নানা অর্থে বসিত। যথা, কবি জয়কৃষ্ণদাসের 'রসকল্পলতা'য়

১৬৬। ও।

সং অপি শব্দ দ্বারা সমুচ্চয়, সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা বুঝায়। বাং আসাং এবং ওং-তে ও দ্বারাও সে সে অর্থ প্রকাশিত হয়। স্থল-বিশেষে সং চ অপি শব্দদ্বয়ের অর্থও আসে। যথা, রাম ও শ্যাম আসিবে; অর্থাৎ রাম আসিবে, শ্যামও আসিবে। যদিও রাম আসে, শ্যাম আসিবে না; বৃষ্টি হইলেও রাম আসিবে; বৃষ্টি হইলেও হইতে পারে। আরও দেখ, রামের বয়সই বা কত! কেমন সুন্দর মূর্তি আঁকিয়াছে, যদিও সে আদর্শ দেখে নাই। তাও কি হয়, তুমি যাবে? তোমারও যেমন বিবেচনা, শ্যামকে শোনাইলে কেন? কেও আসিয়া ছিল; চোরও হইতে পারে। কোথাও কিছু নাই; একটুও নাই, এক তিলও নাই। কোনও কারণে বলা হয় নাই। ইত্যাদি। দেখা যাইবে, এই সকল উদাহরণে ও শব্দের এক অর্থ আছে। সে অর্থ সং অপি, চ, অপিচ তুল্য। অর্থাৎ পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত, অধিক। বস্তুতঃ সং অপি হইতে বাং আসাং ওং ও আসিয়াছে। অপি শব্দের পি লোপে কিংবা অপি হইতে অই ওই এবং ই লোপে থাকে ও। অ হইতে প্রাচীন বাং হ, এবং বর্তমান বাং ও। সংস্কৃতে অপি শব্দের অ লুপ্ত হইতে পারে। তখন পি থাকে। এই পি, হইতে ওং বি, হিং ভী, মং হী। ভারতচন্দ্রে, 'কারেহ না বাসা দিব'—কারেঅ—কারেও। চৈতন্যচরিতামৃতে, 'বুঝিতেহ আমা সবার নাহি অধিকার'—বুঝিতেও। বিদ্যাপতিতে, হুঁ; যথা, সুপুরুখ কবহু না তাজয়ে নেহ—সুজন কখনও না ত্যজে স্নেহ। অদ্যাপি যদ্যপি কদাপি প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালাতে চলিত আছে; অপি পরিবর্তে ও লইয়াও আছে; যথা, আজিও যদিও কভু। কেহ—কে অপি। সুতরাং 'কেহও' হইতে পারে না। কেহ—কেঅ, কেও, কেউ। অ হইতে ও, এবং ও হইতে উ সহজে আসে। 'কেহই' পদও হইতে পারে না। কারণ সম্ভাবনায় হ বসাইয়া, ই দ্বারা তাহা অবধারিত হইতে পারে না। কোন +ও=কোনো। সুতরাং 'কোনোও' পদ ব্যাকরণে অশুদ্ধ। বাস্তবিক, শব্দের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হইয়া 'কোনোও কোনোও' লোক ভাবের আবেগ ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া কতকগুলা ও ই লাগাইয়া ফেলে, যেন শিশু ঐ ঐ, কিংবা ভাষানভিজ্ঞ জাল্ম 'ইহা ইহা' (ইয়ে ইয়ে) বলিতেছে। 'কোনোও লোকই যাইতে পারিল না'—ইত্যাকার ভাষা শুদ্ধ বলিতে পারা যায় না। 'তোমা দ্বারা কোনই কাজ হবে না'—কোনও কাজ, বলা উদ্দেশ্য। কখনও, কক্ষণও; এখনই এক্ষণই;—কথিত ভাষায় দুই দুই রূপ আছে। ক্ষণও ক্ষণই রূপে সং অপি হি অর্থ সুস্পষ্ট আছে (ই দেখ)।

সং এবং শব্দের অর্থ এবম্-প্রকার, এবম্বিধ। চন্দ্রসূর্য এবং জলস্থল তাহার রচিত,—চন্দ্র

(১৬০৭ শকে), 'দূরহি তেজল'—দূর হইতে ত্যজিল; 'গোকুল চাদহি মোহে পাঠায়ল—হি নিশ্চয়ে কিংবা পাদ-পূরণে; 'তোহারি নামগুণ সদত রটতহি'—রটতই; 'অরুণহি লোচন করুণ চাহনি লোরহি কত শত ধার'—লোচন অরুণ বর্ণ, চাহনি করুণ, লোর— অশ্রু র—কত-শত ধারা (১৩১৪ সালের সাঃ পঃ পঃ)।

সূর্য তাঁহার রচিত, এইরূপ জলস্থল। কথা-বার্তার ভাষায় এবং ও সংযোজক-অব্যয় শুনিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয়, ইংরেজী রীতির অনুকরণে আধুনিক লিখিত ভাষায় এবং ও অব্যয়ের বাহুল্য ঘটিয়াছে। রাম শ্যাম যদু হরি আসিবে—এবং ও সংযোজক-অব্যয় আবশ্যক হইল না। সাদৃশ্য-ভাব স্পষ্ট করিতে হইলে এবং আবশ্যক হয়, নতুবা হয় না। অর্থাৎ, এই-প্রকার এই-রূপ বলা যেখানে আবশ্যক, সেখানে এবং চাই। আধিক্য, আতিশয্য ভাব স্পষ্ট করিতে হইলে ও আবশ্যক, নতুবা নহে।

১৬৭। কভু, তবু।

সং কদাপি তদাপি শব্দের অপভ্রংশে কভু, তবু। প্রাচীন কভু শব্দ অধুনা পদ্যে পাওয়া যায়। বাং কভু, ওং কেবেহেঁ, হিং কভী, মং কধী। সং কদা হইতে বাং কবে, ওং কেবে, হিং কব। সং অপি স্থানে হি হইয়া ওং কেবেহেঁ, হিং কব্+হী=কভী, মং কদা+হীঁ=কধীঁ। বাং কবেও অর্থাৎ সং কদাপি হইতে কবু—কভু। এইরূপ তদাপি—তবেও হইতে তবু। সুতরাং কভুও, তবুও ব্যাকরণে অশুদ্ধ। (মেঘনাদবধে,—তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে)। সং তদাপি অর্থে তখনও। কিন্তু, বাং তবু অর্থে সং তথাপি হইয়াছে। বাং তবে (তখন) সং তদা। ওং তেবে, হিং তব, মং তেব্হাঁ। 'তবহুঁ পূরব মন সাধে', 'যবে তুমি আসিবে তবে শুনিবে'—এরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া যাইতেছে। 'যবে' 'তবে' স্থানে 'যখন' 'তখন' বসিতেছে।

১৬৮। কি। কী।

সংস্কৃত কিম্ কিঞ্চ কিমু কিংবা প্রভৃতি স্থানে বাংতে কি বসে। যথা, প্রশ্নে, তুমি যাবে কি? বিতর্কে, 'দেব কি দানব, নাগ কি মানব।' সমুচ্চয়ে, 'কি ইতর কি ভদ্র, সকলের জ্ঞান আবশ্যক'—এখানে দ্রষ্টব্য, ইতর ও ভদ্রে ভেদ করিয়া সমুচ্চয় অর্থ আসিয়াছে। বাক্যের আরম্ভ, 'কি ভাই বহুদিনের পর দেখা!' ক্রোধে ক্ষোভে কী,—কী এত আস্পর্ধা!'

কি সর্বনাম শব্দও আছে। যথা, সে বলে কি তার মতন দুঃখী এজগতে কেহ নাই; চণ্ডীদাসে, 'রাধা বিনোদিনী তোমারে বলিতে কি',—প্রথম উদাহরণের কি—অর্থ জ্ঞাপনে বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় উদাহরণে, 'বলিতে কি'—বলিতে বাধা কি আছে।

কি ও না একত্র হইয়া কিনা। যথা, চণ্ডীদাসে, 'ননদী বোলয়ে হেঁ লো কি না তোর হৈল—তোর হইল কি—প্রশ্নে। 'দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় সঙ্গদোষে কি না হয়, রাহুমুখে শশী মসিলাভ'—কি না হয়—সব হয়। 'তবে কি না সৎসঙ্গ দুর্লভ'—কি না—জ্ঞাপনে। 'গজেন্দ্রঃ কিনা গজানাং ইন্দ্রঃ'—কিনা ব্যাখ্যানে। নাকি প্রশ্নে, বিস্ময়ে, 'বেলি অবসান কালে গিয়াছিলি না কি জলে।' তুমি যাবে কি না, তাই এত বৃষ্টি—বৃষ্টির কারণ তোমার গমন।

ভাগ্যে তুমি এলে, লোক পাঠিয়েছিলাম আর কি'—আর কি মনে কর। 'খাবার বেলা হয় আর কি'—আর অধিক কিছু বলিবার নাই। 'তা বই কি'—তাহা ব্যতীত আর কি। 'যাবে বই কি।'—নিশ্চয়ই যাবে। 'যাবে বই কি?'—যাওয়া অসম্ভব। দ্রষ্টব্য, এই দুই উদাহরণে 'যাবে' পদের মাত্রা সমান নহে।

১৬৯। খালি।

খালি শব্দ আর্বী, অর্থ,—শূন্য। বাংতেও শূন্য, এবং শূন্য হইতে বৃথা অকারণ অর্থ। যথা, খালি হাতে যাবে?—শূন্য হস্তে; হাত খালি কর—শূন্য। সে খালি বকে—বৃথা, অকারণে। বিজ্ঞাপনে 'কর্মখালি'—সংস্কৃত শব্দের সহিত আর্বী শব্দের সমাস।

১৭০। ত।

সং তু হইতে বাং ত বলা যাইতে পারে। তু নানা অর্থে বসিত, তও নানা অর্থে বসে। যথা, অবধারণে,—তুমি ব'লেছিলে ত, তা হ'লেই হ'ল; চণ্ডীদাসে 'মথুরা নগরে ছিলেত ভাল।' প্রশ্নে,—বাড়ীর সব ভাল ত? পক্ষান্তরে,—তোমার ত সেই কথা, অন্যের যাহা হউক। সংস্কৃতে তু সমুচ্চয়, সম্পর্ক প্রভৃতি অর্থে বসিত, বাঙ্গালায় ত দ্বারা সে সব অর্থ আসে না। সংস্কৃতে তু পাদ-পূরণে প্রচুর পাওয়া যায়, বাঙ্গালাতেও পাদ-পূরণে ত আছে। কোন কোন বাং প্রাচীন পদ্যে যেখানে-সেখানে বহুস্থলে, পাদপূরণে ত বসিত। যথা, শূন্য-পুরাণে, 'কেবা তুহ্মার মাতা পিতা কহত না উত্তর।' 'সংসার তরিবাত জদি বাইহ্ম হেন ভেলা।' শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ত এর প্রাচুর্য আছে। এইরূপ, এক এক ব্যক্তি প্রায় প্রত্যেক কথার শেষে একটা করিয়া ত বসাইয়া যান। প্রশ্নে পদ-বিশেষের উপর বল দিতে হয়, নতুবা প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। তুমি তাকে বোলেছিলে—এই বাক্যের এক এক পদে বল দিলে এক এক অর্থ হয়। তুমি তাকে বোলেছিলে—তুমি ত তাকে বোলেছিলে অর্থাৎ আর কেহ বলুক না বলুক। তুমি তাকে বোলেছিলে—তুমি তাকে ত বোলেছিলে—অর্থাৎ নির্দিষ্ট লোককে। তুমি তাকে বোলেছিলে—বোলেছিলে ত—অর্থাৎ ভুলিয়া যাও নি ত? এই ত সং তু এর মতন পদের প্রভেদ করিতেছে। কবিকঙ্কণে, 'আমি ত বৎসর সাত মৃগ মারি খাই ভাত, এমন ত কভু নাহি দেখি'—এখানে ত অবধারণে। কবিকঙ্কণে, 'যে হোক সে হোক নারীর স্বামী ত ভূষণ।'—ত নিশ্চয়ে, প্রশংসায়। বলা বাহুল্য সকল স্থলে ত এর অর্থ প্রভেদ করা কঠিন।

১৭১। না।

৴০ না নিষেধার্থ প্রকাশ করে। যথা, তিনি করেন না। সামান্য নিষেধে না ক্রিয়াপদের পরে বসে।

৵০ না পরে স্বার্থে ক বসিয়া নিষেধার্থ দৃঢ় করে। যথা, সে যাবে নাক। এই ক ক্রিয়া-পদের পরেও বসিতে পারে। যথা, সে যাবেক না। কিন্তু, এই ক ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইতেছে। নাক শব্দও শিষ্ট-সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে।

৵০ অনুজ্ঞা-ক্রিয়া-পদের পরে না বসিলে তদ্দ্বারা অনুরোধ, আদেশ প্রকাশ করে (১২৬ পৃঃ)। যথা, তুমি কর না, খাও না। এস্থলে দ্রষ্টব্য, বাক্য উচ্চারণের সময় ক্রিয়াপদে মাত্রা অধিক, না-তে অত্যল্প। অনুজ্ঞা ক্রিয়াপদে নিষেধ বুঝাইতে হইলে পরে সম্মতিসূচক অন্য এক বাক্য আবশ্যক হয়। যথা, তুমি করিও না, সে করিবে; তুমি খেও না, সে খাবে। এখানে না-তে মাত্রা বাড়াইতে হয়। তুমি কর না কেন—দ্ব্যর্থ; (১) তুমি কেন (কি হেতু) না কর; (২) তুমি কর, কেননা (যেহেতু) তোমার শক্তি আছে, কিন্তু...।

।০ প্রশ্নে বিকল্প বা পক্ষান্তর বুঝাইতে দুই বাক্যের কিংবা দুই পদের মাঝে না বসে। যথা, তুমি যাবে, না সে যাবে? সংবাদ ভাল, না মন্দ? আম চাই, না কাঁঠাল চাই? —(সংক্ষেপে) আম না কাঁঠাল চাই?

।৴০ ক্রিয়াপদের পূর্বে না বসিলে সন্দেহ, বিকল্প, বিতর্ক প্রকাশ করে। যথা, তুমি না যাও, সে যাবে; যাওয়া না হয়, না হবে; যদি না যাও, না যাবে। চণ্ডীদাসে 'বিহরা-কাতরা বিনোদিনী রাই পরাণে বাঁচে না বাঁচে', 'আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া, কত না যাতনা দিনু'—এস্থলে, কত যাতনা না দিনু, বলাও চলিত। তুমি না বোলেছিলে?—প্রশ্নেও না ক্রিয়াপদের পূর্বে বসিয়া সন্দেহ প্রকাশ করে। কেহ কেহ যে-না, সে-না বলে। যথা, তুমি যে-না বোলেছিলে? তুমি সে-না বোলেছিলে?—বিতর্কে। প্রশ্ন না হইলে, যে-না সে-না দ্বারা নিশ্চয় প্রকাশ করে। তুমি যে-না বোলেছিলে, তাই কোরেছে;—তুমি না বলিলে সে করিত না। তুমি সে-না গেছিলে, তাই দেখা পেলে—তুমি না গেলে দেখা পাইতে না। অপভ্রংশে যে-না স্থানে যিন্‌, সে-না স্থানে সিন্‌ হয়। এই সেনা ওড়িয়াতেও আছে।

।৵০ বাক্যের কিংবা পদের পরে না বসিলে ব্যাখ্যান বা অর্থ বিকাশ করে। যথা, কোথায় তুমি যাবে, না সে গেল। গজেন্দ্রবদনং—না গজের মধ্যে বৃহৎ যে ঐরাবত তাহার বদনযুক্ত। ব্যাখ্যানে কিনা ও বসে। কেন না—কেন কি কারণে কি হেতু, না—এই কারণে; অতএব কেননা যে হেতু। এখানে না ব্যাখ্যানে।

।৶০ সংশয় বিতর্ক দূর হইয়া নিশ্চয় আসিলে নাঃ বলা যায়। যথা, নাঃ যাওয়া যাক্; 'জীবন-টা কিছু নাঃ'। এখানে দ্রষ্টব্য না-তে বিসর্গ দিয়া বুদ্ধ সংশয় দূরীকৃত হয়।

নাই, নি, এবং নহ ধাতু সম্বন্ধে পূর্বে বলা গিয়াছে (১২৬ পৃঃ)।

১৭২। বা।

সং বা হইতে বাং বা। বিকল্প;—রাম বা শ্যাম কেহ যাক; সমুচ্চয়;—রাম বা শ্যাম বা যদু, কারও কর্ম নয়; বিতর্ক;—সে গেল বা; গেলই বা—না গেলে ভাল হইত, কিন্তু, গেলে ক্ষতিও নাই; অন্যার্থ;—কাঞ্চন বা সোনা পীতবর্ণ (এই অর্থে বা স্থানে অর্থাৎ বলা ভাল, কারণ বা দ্বারা বিকল্পও বুঝাইতে পারে)।

কি কে যে প্রভৃতির সঙ্গে বা বসিয়া বিতর্ক অর্থ প্রকাশ করে। যথা, ভারতচন্দ্রে, 'কিবা রূপ কিবা গুণ'; চণ্ডীদাসে, 'সই কিবা সে শ্যামের রূপ', 'এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাযে', 'সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো', 'সখিরে মনের বেদনা কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত'। যে বা, কেহবা, সে বা, তুমি বা, রাম বা ইত্যাদি সকল স্থলে বিতর্ক। যদি বা (সং)—পক্ষান্তর।

১৭৩। বরং বরঞ্চ।

সংস্কৃতে বরম্ অর্থে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বাংতেও সেই অর্থ। 'রাম বরং ভাল', তুমি বরং যাও—না যাওয়া অপেক্ষা যাওয়া শ্রেয়ঃ। বরং ও বরঞ্চ শব্দের প্রয়োগ এক। আরও ভাল—এই অর্থে বরঞ্চ বলা যাইতে পারে।

১৭৪। বুঝি।

বুঝি (বোধ করি, অনুমান করি) যদিও ক্রিয়াপদ, অর্থে ও প্রয়োগে অব্যয়-সরূপ। চণ্ডীদাসে, 'করিয়া চাতুরী যাবে বুঝি হরি, রাধারে করিতে সুখী'। পারা-(সং প্রায়) শব্দও রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে বুঝি অর্থে প্রায় শোনা যায়। ওংতে পরা (পারা) বহু প্রচলিত।

১৭৫। মাত্র।

সংস্কৃতে মাত্র অর্থে অবধারণ, সাকল্য। বাংতেও তাই। যথা, এই মাত্র শুনিলাম—ইহা ভিন্ন আর কিছু শুনি নাই। (এই মাত্র এই ক্ষণ অর্থেও প্রয়োগ আছে।) মুল্য ৪৲ টাকা মাত্র—সাকল্যে চারি টাকা। কেহ কেহ কেবল সঙ্গে মাত্র শব্দ যোগ করে। যেমন, কেবল মাত্র ইহা বক্তব্য—এরূপ প্রয়োগ ভুল বলিতে হইবে। কারণ কেবল ও মাত্রের অর্থ এক।

১৭৬। মধ্যে ভিতরে।

সং মধ্যে বহু না থাকিলে বসে না। যথা, পণ্ডিতের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। গ্রামের মধ্যে তিনি ধনবান্—এখানে গ্রামের যাবতীয় মানুষ তুলিত হইতেছে। মধ্যে অর্থে মধ্যস্থলে আছে। যথা, ঘরের মধ্যে (মধ্যস্থলে) বিছানা। সং অভ্যন্তর হইতে বাং ভিতর; সুতরাং ভিতরে অর্থে অন্তর্গত। যথা, ঘরের ভিতরে রাখ, অর্থাৎ বাহিরে নয়। সুতরাং, লোকের ভিতরে তিনি শ্রেষ্ঠ—বলা গ্রাম্যতা।

১৭৭। যে।

সং যৎ—যেহেতু—অর্থে যে। যথা, সে যে সুজন নয়, তুমি যাবে যে। 'চণ্ডীদাস কয় ভুবনে না হয়, এমন রূপ যে আর'। কেন যে যাবে—কেন, কিহেতু; সুতরাং 'কেন যাবে' বলিলেও চলে।

সং যতস্, যথা-পরিমাণ অর্থে যে। যথা, তুমি যে ভাল, তা জানা আছে; চণ্ডীদাসে,

'ভঙ্গিম রঙ্গিম ঘন যে চাহনি, গলে যে মোতিম হারি',—যে ভঙ্গিমা-যুক্ত ও রাঙ্গা চোখের ঘন চাহনি, গলায় যে মোতির হার। সাদৃশ্য অর্থেও বলা চলে। যথা, 'অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে, পড়িছে উছলি জোর'—আঙ্গুলের আগায় চাঁদ যেন ঝলকে। সত্য অর্থে। যথা, এক যে ছিল রাজা, তার দুই রাণী (ও°তেও জনে যে রজা থিলা)—গল্প হইলেও সত্যের আভাষ দেওয়া উদ্দেশ্য। স° যত্র হইতে যে—যেখানে। যথা, তোমায় কোথায় যে পাব, তা জানি না—যে স্থানে পাব তাহা কোথায়। স° যদ্—যাহা যে অবশ্য সর্বনাম। যথা, সে বলিল যে তাহার বাড়ীতে অনেক কুটুম্ব আসিয়াছে; তুমি যে ব'লেছিলে সে যায় নাই।

বিদ্যাপতিতে যে—যেহেতু—স্থানে য়ে। যথা, 'ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান'—ইঙ্গিত বুঝি না যে, মান জানি না যে। এইরূপ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি এ কি শব্দ স্থানে (কিএ—) কি য়ে প্রয়োগ করিয়াছেন। (তু° এগোটা (একটা)—ও° গোটাএ।) যথা, বিদ্যাপতি, কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়না'—শশিবদনা আমার দৃষ্টিতে এ কি পড়িল। 'দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর। কাল হোই কিয়ে উপজল মোর॥'—দারুণ বাঁকা অল্প দৃষ্টি আমার এ কি কাল হইয়া উপস্থিত হইল! 'ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ। কি য়ে শশিমণ্ডল বিশ খণ্ড সন্বেশ॥'—কাল কাল কুটিল কেশ; তাহাতে চন্দ্র-মণ্ডল ও ময়ুর-পুচ্ছের এ কি সন্নিবেশ। এ কি দ্বারা বিস্ময় বুঝায়। য়ে বানান স্থলে ভারতচন্দ্রে এ। যথা, কি এ নিরুপম শোভা মনোরম, হরগৌরী এক শরীরে। (১৩৮ পৃঃ টীঃ দেখ)

১৭৮। শুধু।

স° শুদ্ধ হইতে বা° শুধু। শুদ্ধ অর্থে অমিশ্রিত, কেবল। যেমন, শুধু ভাত পায় না, ডাইল চায়! শুধু হাতে যাইতে নাই, শুধু রাম যাক।

১৭৯। সুদ্ধ।

রাম সুদ্ধ যাবে। অর্থাৎ রামও যাবে। বোধ হয় এই সুদ্ধ শব্দ স° সহিত সার্ধম্ কিংবা সধ্রাচ্ শব্দের অপভ্রংশ। স° সধ্রাচ্ শব্দের অর্থ সঙ্গী, সহায়। সধ্রাচ্ হইতে সধ্রা—সদ্ধ আসা অসম্ভব নয়। রাম সুদ্ধ যাবে—রাম সঙ্গী হইয়া বা রাম (শ্যামের) সহিত যাবে। ও°-তে সুদ্ধা এই অর্থে আছে। ও°তে মধ্য শব্দও সুদ্ধা পরিবর্তে বসে। যথা, সে মধ্য যিবে—বা° সেও (কিংবা সে সহিত) যাবে। বোধ হয়, স স্থানে ম আসিয়া ও° মধ্য হইয়াছে।

১৮০। হাঁ।

স° হ নানা অর্থে বসিত। এক অর্থ নিয়োগ ছিল। সেই হ বা°তে হাঁ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের স্থান বিশেষে হ আছে। আমি করিব? হ বা হাঁ। নিয়োগ হইতে সম্মতি। 'সে যাবে? হাঁ।' হাঁ শব্দ রাঢ়ে গ্রাম্য হেঁ হইয়াছে।

বিনা কারণে কাহাকে মারিতে গেলে উপস্থিত লোকে বলে, 'হাঁ হাঁ কর কি? এই হাঁ

কুৎসার্থ সং হ কিংবা হা হইতে। দুঃখার্ত-বোধক সং হা হইতে বাং এই হাঁ হাঁ মনে করা যুক্তিযুক্ত। সং হা হইতে বাং হায়। সং অহহ হইতে আহা।

সং হুম্, হুম্ স্মৃতি, সম্মতি, বিতর্ক প্রভৃতি অর্থে বসিত। বাংতে হুঁ, হুঁ দ্বারা সে সব অর্থ আসে। হুম্ প্রশ্নে বাং উঁ; হুম্ নিষেধে বাং উঁহুঁ।

সং হে সম্বোধন, আহ্বান অসূয়াদি অর্থে। বাং হেঁ,—হেঁ সে আর করিবে?—অসূয়া অর্থ। সম্বোধনে বাং হে।

এই অধ্যায়ে বাঙ্গালাভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ লিখিতে অভিপ্রায় করি নাই। সম্পূর্ণ করিতে হইলে অধ্যায়টি দ্বিগুণ বাড়াইতে হইত। অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালাভাষায় চলিত আছে, বাঙ্গালা ব্যাকরণে সে সকলও আলোচ্য। এখানে সে সকল শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত-সম শব্দের ব্যাকরণ সংস্কৃত-ব্যাকরণ। সংস্কৃত-ভব শব্দের ব্যাকরণ মুখ্যতঃ সংস্কৃত-ব্যাকরণ হইলেও নানা বিষয়ে সে ব্যাকরণ অনুরূপ হইয়াছে। এখানে এই ব্যাকরণের একটা অংশ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাল-বোধ কি পণ্ডিত-বোধ, ভাষা-বোধ কি ভাষা-ব্যাকরণ-বোধ, জানি না। বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে চেষ্টার প্রয়োজন বোঝা যাইবে। বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ কি বৃহৎ ব্যাপার, বাঙ্গালাভাষার কি সামর্থ্য তাহার ক্ষীণ আভাস এই কএক পৃষ্ঠা হইতে পাওয়া যাইতে পারিবে।

বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও বাঙ্গালা শব্দ একত্র করিলে মোট শব্দ ত্রিশ-সহস্রের ন্যূন হইবে না। সুতরাং বাঙ্গালাভাষা বলিলে শব্দের এক বৃহৎ অরণ্য বুঝায়। যিনি ইহার ব্যাকরণ লিখিবেন, তিনি এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শব্দের রচন দেখিয়া শ্রেণী-বিভাগ করিবেন। কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলে শ্রেণী-বিভাগে ভুল হইবে, এবং প্রচুর জ্ঞানের অভাব হইলে সংজ্ঞা-নির্দেশে ভুল হইবে। এই দুই কারণে এই ব্যাকরণে ভুল অনেক দেখা যাইবে। একে লেখকের ভুল, তার উপর মুদ্রাকরের অবশ্যম্ভাবী ভুল,—এই দুই ভুল মিশিয়া পাঠকের ধৈর্য পুনঃপুনঃ পীড়ন করিবে। কোন্ কোন্ শব্দের নূতন বানান এবং কোন্ কোন্ নূতন অক্ষরও পাঠকের বিরাগ-বৃদ্ধি করিবে।

এই সব জানিয়া-শুনিয়াও যে সাহিত্য-পরিষদের মহামন্ত্রী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর-ত্রিবেদী-মহাশয় এই গ্রন্থ-প্রকাশে উদ্‌যোগী হইয়াছেন, তাহাতে আমিই আশ্চর্য হইয়াছি। বাঙ্গালাভাষার প্রতি অনুরাগ প্রগাঢ় না হইলে তিনি এ কার্যে উৎসাহী হইতেন না। বঙ্গদেশে কত কত জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ নমস্য পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের পদরেণুও পাইবার যোগ্য এজনা নহে, তাঁহারা ভ্রম সংশোধন করিয়া মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা-সম্পাদনে অবশ্য যত্নশীল হইবেন। যদি ধৃষ্টতা না হইত, তাহা হইলে বলিতাম এই লেখক পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কেবল ভ্রমপ্রদর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন। কারণ তাহাতেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আশা।
